BL College Journal Vol-2, Issue-2, December 2020 Subscription : BDT 300/- [$ 5 Outside Bangladesh]

Published by
Government Brajalal College, Daulatpur, Khulna, Bangladesh

BL College Journal Volume-2, Issue-2, December 2020 ISSN 2664-228X

Volume-2, Issue-2, December 2020

ISSN 2664-228X

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

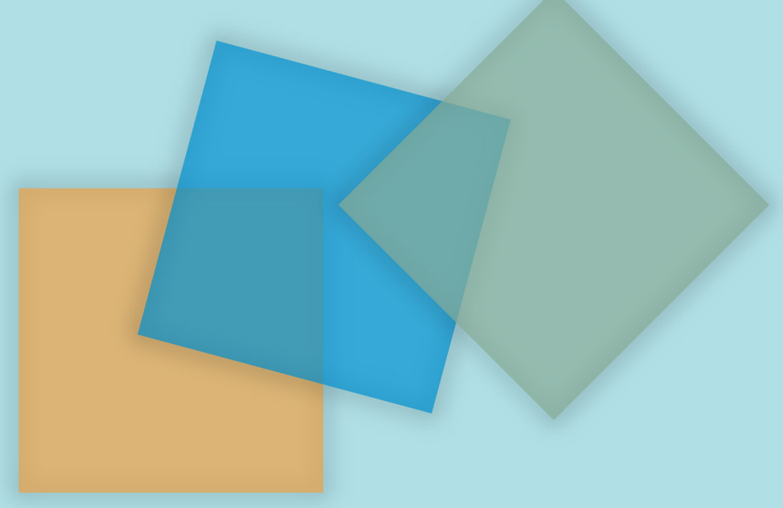

Government Brajalal College
Khulna, Bangladesh

ISSN 2664-228X

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

Volume -2, Issue-2, December 2020

Government Brajalal College
Khulna, Bangladesh

ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-2, December 2020

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

A Bi-lingual (Bangla-English) Research Journal

Half Yearly Publication of Government Brajalal College

Chief Patron

Professor K M Alamgir Hossain Principal, Government Brajalal College

Editor

Professor Sharif Atiquzzaman Vice Principal, Government Brajalal College

Review Committee

Professor Dr. Khandakar Hamidul Islam	Head, Department of Islamic Histroy & Culture
Professor Dr. Khandakar Ahsanul Kabir	Head, Department of Physics
Dr. Md. Mizanur Rahman	Head, Associate Professor, Department of Social Work
Dr. Hosne Ara	Associate Professor, Department of Zoology
Shankar Kumar Mallick	Associate Professor, Department of Bangla
Roxana Khanam	Associate Professor, Department of English
Dr. Emanul Haque	Associate Professor, Department of Bangla Goenka College of Commerce & Business Administration, Kolkata, India
Amal Kumar Gain	Assistant Professor, Department of History
Rami Chakraborty	Assistant Professor, Department of Bangla Assam University, India
Dr. Md. Sarwar Hossain	Lecturer, Department of Mathematics

Mailing Address

Government Brajalal College, Daulatpur, Khulna-9200, Bangladesh

Phone : 0088-041-762944, 0088-041-2852708 email : infoblcollege@gmail.com

Website : www.blcollege.edu.bd

Printed by : Rabi Printing Press

27, Samsur Rahman Road, Khulna-9100, Bangladesh

© **Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh**

ISSN : 2664-228X

ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-2, December 2020

Contents

বাংলা অংশ

- মুক্তিযুদ্ধের বিস্মৃত স্মারক : কালীপদ কুণ্ডুর *স্বাধীন বাংলা ভাদু সঙ্গীত*
  ড. মাসুদ রহমান ৭-১৭
- ত্রিপুরার বাংলা উপন্যাস : ইতিহাস ও অস্তিত্বের অনুসন্ধান
  সৌম্যদীপ দেব ১৮-২৩
- বরেন্দ্র অঞ্চলের লোকসঙ্গীত : আলকাপ গান
  প্রফেসর ড. মাযহারুল ইসলাম তরু ২৪-৪১
- নীললোহিতের দিকশূন্যপুর : একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা
  বৈশালী ঘোষ চৌধুরী ৪২-৪৯
- আন্তিগোনে : তিন প্রজন্মের অভিশাপ কিংবা একক নারীর স্পর্ধা
  সুরজিৎ বেহারা ৫০-৫৬
- মনসামঙ্গলকাব্যে প্রতিফলিত পৌরাণিক সমাজ ও দ্বিজবংশী দাসের মৌলিকতা
  মিজানুর মণ্ডল ৫৭-৬৬
- পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় জন-জ্ঞান বা এলাকাবাসীর ঐতিহ্যিক ধারণা গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের নিম্নাংশ-বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকাবাসীর প্রথাগত ধারণা ও চর্চা
  গৌরাঙ্গ নন্দী ৬৭-৮২

English Section

- Understanding Philosophy as a Rational World Outlook
  Haroon Rashid 85-100
- A Sociological Study on Violence against Married Women in Bangladesh Society
  Dr. Selina Ahmed 101-112
- A Numerical Simulation of the Nested Logistic Population Model for the Classified Population of Bangladesh
  Md S Hossain & L S Andallah 113-121
- Reflections of the City of Kabul: Pre and Post-Taliban in Khaled Hosseini's *A Thousand Splendid Suns*
  Dr. Sabreen Ahmed 122-129
- Effect of Music on Human Mind and Emotion
  Dr. Sudarshana Baruah 130-141
- The Collision of Human Emotions and Money-Logic in The Merchant of Venice
  Oindrila Ghosh, PhD 142-148

ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-2, December 2020

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

A Bi-lingual (Bangla-English) Research Journal
Half Yearly Publication of Government Brajalal College
December 2020

Published by

Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh

Disclaimer

The opinions expressed in the articles published in this journal are the opinions of the authors. The members of the review committee, the editor or the publisher of the *BL College Journal* are in no way responsible for the opinions expressed by the authors or the conclusions deduced by them.

ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-2, December 2020

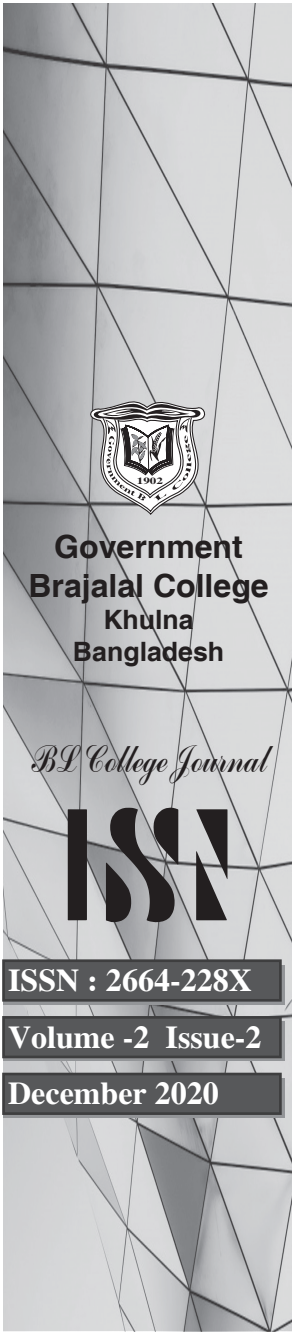

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

বাংলা অংশ

Contents

- মুক্তিযুদ্ধের বিস্মৃত স্মারক : কালীপদ কুণ্ডুর *স্বাধীন বাংলা ভাদু সঙ্গীত*
  ড. মাসুদ রহমান ৭-১৭
- ত্রিপুরার বাংলা উপন্যাস : ইতিহাস ও অস্তিত্বের অনুসন্ধান
  সৌম্যদীপ দেব ১৮-২৩
- বরেন্দ্র অঞ্চলের লোকসঙ্গীত : আলকাপ গান
  প্রফেসর ড. মাযহারুল ইসলাম তরু ২৪-৪১
- নীললোহিতের দিকশূন্যপুর : একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা
  বৈশালী ঘোষ চৌধুরী ৪২-৪৯
- আন্তিগোনে : তিন প্রজন্মের অভিশাপ কিংবা একক নারীর স্পর্ধা
  সুরজিৎ বেহারা ৫০-৫৬
- মনসামঙ্গলকাব্যে প্রতিফলিত পৌরাণিক সমাজ ও দ্বিজবংশী দাসের মৌলিকতা
  মিজানুর মণ্ডল ৫৭-৬৬
- পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় জন-জ্ঞান বা এলাকাবাসীর ঐতিহ্যিক ধারণা গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের নিম্নাংশ-বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকাবাসীর প্রথাগত ধারণা ও চর্চা
  গৌরাঙ্গ নন্দী ৬৭-৮২

Volume -2, Issue-2, December 2020

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-2, December 2020
pp. 7-17

মুক্তিযুদ্ধের বিস্মৃত স্মারক : কালীপদ কুণ্ডুর *স্বাধীন বাংলা ভাদু সঙ্গীত*

ড. মাসুদ রহমান

ড. মাসুদ রহমান
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী
বাংলাদেশ
e-mail : masud.kush.bd@gmail.com

সারসংক্ষেপ

ভাদু এক বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি যা রাঢ়ের অধিকাংশ এলাকা হয়ে ঝাড়খণ্ড ও বিহারের কিছু অংশ ছড়িয়ে আছে। কাহিনি-কিংবদন্তি বিচারে এর সূত্রপাত পুরুলিয়ায় আর এর অন্যতম অনুষঙ্গ সংগীতের সমৃদ্ধি বাঁকুড়ায়। একান্ত লোকধর্ম হতে উদ্ভূত বিধায় ভাদু গান সময়ান্তরে সমসাময়িক বিষয়বস্তুকে প্রসঙ্গ করতে পেরেছে, লোক-অভিব্যক্তির শৈল্পিক বাহন হয়েছে উঠেছে, আরও হয়েছে গণসচেতনতা গঠনের মাধ্যম। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে প্রতিবেশী দেশ ভারত বিশেষ করে সীমান্তবর্তী প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গের যুক্ততা ছিল অঙ্গাঙ্গি ও বহুমাত্রিক। সীমান্ত হতে কিছু অভ্যন্তরে বাঁকুড়া জেলাতেও ঘটেছিল তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। তারই সাক্ষ্য মিলেছে ভাদু গানের এক দুষ্প্রাপ্য সংকলনে। শিল্পস্মারকটি উদ্ধার ও উপস্থাপনের পাশাপাশি এটিকে শৈল্পিক ও সামাজিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ক্ষেত্র অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে গানগুলোর রচয়িতা বিস্মৃতপ্রায় কবি-শিল্পী কালীপদ কুণ্ডুর পরিচয় প্রদান করা হয়েছে বর্তমান গবেষণায়। এসবের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকালের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে মূর্ত হয়েছে যুদ্ধের তাণ্ডবে বাংলাদেশের মানুষের দুর্বিষহ জীবন, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মানুষের সহৃদয়তা-সংবেদনশীলতা। পাশাপাশি বিবর্তনের মধ্য দিয়ে জীবন্ত লোকসাহিত্যের ধারণক্ষমতা ও কার্যকারিতাও আরেকবার প্রমাণিত হয়েছে।

মূলশব্দ

মুক্তিযুদ্ধ, জয়বাংলা, শরণার্থী, ভাদু গান, বাঁকুড়া, কালীপদ কুণ্ডু

গবেষণার উদ্দেশ্য

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়কেন্দ্রিক লোকধর্মাচার ভাদু পরবের অনুষঙ্গ ভাদু গানের এমন একটি সংকলন আমাদের হাতে এসেছে যেখানে ভূমিকা থেকে শুরু করে গোটাতিনেক গানের মূল বিষয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলি। গ্রামগঞ্জের হাটে-বাজারে ভাদু পরবের পূর্বে বিক্রীত-প্রচারিত হওয়া পুস্তিকাটি প্রায় অর্ধশত বছরের পুরনো অর্থাৎ একেবারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এর রচয়িতা কালীপদ কুণ্ডুর জনপ্রিয়তা জনশ্রুতিতে সীমাবদ্ধ–তাঁর জীবন ও কর্ম অনেকটাই অজানা-অলিখিত। বর্তমান গবেষণায় দুষ্প্রাপ্য,

একরকম হারিয়ে যাওয়া এবং এ যাবৎকালে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত কোনো ধরনের আলোচনায় অব্যবহৃত পুস্তিকাটির প্রাসঙ্গিক অংশ উপস্থাপন, বিস্মৃতপ্রায় অথচ একসময়ের জনপ্রিয় লোকশিল্পী কালীপদ কুণ্ডুর জীবনরেখ অঙ্কন এবং সংশ্লিষ্ট রচনাকর্মটি মূল্যায়ন করা হবে।

পূর্ববর্তী চর্চা ও বর্তমান গবেষণার মাধ্যম

ভাদু পশ্চিমবঙ্গের লোক-ধর্মাচার। পুরুলিয়াকেন্দ্রিক এই লোকসংস্কৃতি রাঢ় অঞ্চল ছাড়িয়ে উত্তর-পশ্চিমে বিহার ও ঝাড়খণ্ডে কিছুটা দেখা যায়। যে কারণে বাংলাদেশে তার পরিচিতি ও চর্চা প্রায় নেই বললেই চলে। সাধারণ কোষগ্রন্থে কিছু প্রাথমিক পরিচয় মেলে মাত্র। পশ্চিমবঙ্গে ভাদু নিয়ে বেশকিছু কাজ চোখে পড়ে। এ বিষয়ে অগ্রণী আশুতোষ ভট্টাচার্য–তাঁর ছয় খণ্ডে প্রকাশিত *বাংলার লোকসাহিত্য* গ্রন্থের ১ম (১৯৫৪) ও ৩য় খণ্ডে (১৯৫৪) ভাদু গান নিয়ে মূল্যবান আলোচনা আছে, সেই সাথে কিছু গানও সংকলিত হয়েছে। আরও কিছু ভাদু গান পাওয়া যায় তাঁর *বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর* ৪র্থ খণ্ডে (১৯৬৭)। সুধীরকুমার করণের *সীমান্তবাঙলার লোকযান* (১৩৭১ব.) গ্রন্থে ভাদু নিয়েও কিছু মূল্যবান আলোচনা ও গান স্থান পেয়েছে। পরবর্তীকালে প্রধান ও একমাত্র প্রসঙ্গ করে রচিত ভাদু বিষয়ক আলোচনা ও সংকলনের বই পাওয়া গেল। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যুধিষ্ঠির মাঝির *ভাদুগীতির ইতিকথা* (১৯৮৫), রামশঙ্কর চৌধুরীর *ভাদু ও টুসু* (১৯৭৭), দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ভাদু ও টুসু: তুলনা ও বিশ্লেষণ* (২০১২) ইত্যাদি। আমরা এসব গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। ভাদু ও রাঢ় অঞ্চলের লোকসাহিত্য-সংগীত নিয়ে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পন্ন বেশ কয়েকটি বিদ্যায়তনিক গবেষণা আমরা দেখেছি।

সাম্প্রতিক কালের গ্রন্থগুলোতে আমাদের সংগৃহীত সংকলনের রচয়িতা কালীপদ কুণ্ডুর কথা আছে, তবে কেউ তাঁর জীবনকর্ম বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করেননি। আমাদের সংগৃহীত সংকলনটির কথাও কেউ উল্লেখ করেননি। এজন্যে আমাদের ক্ষেত্র-অনুসন্ধানের প্রয়োজন পড়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মিলন সৎপথীর পরিচালনায় এ-কাজে সক্রিয় ও আন্তরিকভাবে অংশ নিয়েছিলেন পুরুলিয়ার স্কুলশিক্ষক সৌমেন আঠা। কালীপদ কুণ্ডুর পরিবার ও শিষ্য ছাড়াও শালবনী এলাকার মানুষের সাথে কথা বলে তাঁরা এককালের জনপ্রিয় কীর্তনগায়ক ও ভাদু সংগীত রচয়িতার জীবনকর্মের প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য উদ্ধার করেছেন। এছাড়া বর্তমান গবেষক কালীপদ কুণ্ডুর নাতি বাঁকুড়ানিবাসী হেমন্ত পাল ও নাতনি পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক নন্দিতা পালের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন।

ভূমিকা

বাংলার বিপুল লোকসংগীত সম্ভারের এক বিশিষ্ট সম্পদ ভাদু গান। আঞ্চলিকতায় সীমিত হলেও এর রয়েছে বহুমাত্রিক স্বকীয়তা ও শৈল্পিক সমৃদ্ধি। মানভূম-রাঢ়ের এই সংগীত মূলত ভাদু পরব বা পূজার অনুষঙ্গ। আর দশটি পূজার মতো এর কেন্দ্রে নেই কোনো দেবদেবী বা অবতার। তারই কারণে নেই পুরোহিত এবং শাস্ত্রীয় বা নির্দিষ্ট মন্ত্র। বলা যায় গানই এর মন্ত্র। এই গান আবার মন্ত্র হওয়ার মাহাত্ম্য ছাড়িয়ে লোকমনের ভাব প্রকাশের বাহন হয়ে উঠেছে। বর্তমানে ভাদু পরবের আগের আড়ম্বর আর নেই, উৎসবকেন্দ্রিক অনেক সামাজিক-বাণিজ্যিক অনুষঙ্গ এখন সীমিত হয়ে এসেছে, ভাদু গান রচন-গায়নও অনেকটাই কমে এসেছে। তারপরও এখনও সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের কাছে এতোটাই আবেদন ধরে রেখেছে যে, এই করোনা-বিপর্যয় কালেও সচেতনতা সৃষ্টির জন্যে গান বাঁধা হয়েছে: "ভাদুর আমার কী হল, মাস্ক পরে বেরুতে হল।"[১] আমাদের বর্তমান

আলোচ্যের পরিপ্রেক্ষিত জানতে এই লোকধর্মের সংগীতাংশের এইরূপ বিস্তৃতি পাওয়ার কারণ ও বিবর্তনের ইতিহাস সংক্ষেপে হলেও স্মরণযোগ্য।

অন্যান্য লোকধর্মের উদ্ভবের মতো ভাদু পুজোর উদ্ভব প্রসঙ্গেও ইতিহাস ও কিংবদন্তি মিলেমিশে গিয়েছে। এর সর্বপ্রাচীন সূত্র ত্রয়োদশ শতাব্দীতে খুঁজে পেয়েছেন সুকুমার সেন। ঐ শতকে হলায়ুধ মিশ্র রচিত *সেকশুভোদয়ার* ঊনবিংশ পরিচ্ছেদের একটি গান উদ্ধৃত করে বলেন : "গানটিকে ভাদু গানের সবচেয়ে পুরোনো নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যায়।"[২] প্রাচীন ওই গ্রন্থে গানটি পরিবেশিত হয়েছে শেখ জালালউদ্দিন তাবরেজির বিরুদ্ধাচরণকারী দুই ডাকিনীর দ্বারা, যারা গঙ্গানদীতে মালসা-সরা নিয়ে ভাজো ব্রতে নিয়োজিত পতিব্রতা নারীদের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল । ওই 'ভাজো' ব্রতই যদি ভাদু হবে তাহলে তার ধারাবাহিকতা পাওয়া গেল না কেন–সে প্রশ্ন ওঠে। আমরা যে ভাদু পূজার কথা বলছি, যা এই নামে রাঢ়-বিহার-ঝাড়খণ্ডে প্রচলিত তার অনুষঙ্গ-সূত্র অতো প্রাচীনকালের সাথে সম্পর্কিত বলে প্রমাণ মেলেনি।

তবে এই ভাদুর উৎপত্তি নাতিদূর অতীতের কথা হলেও এর কাহিনিও একাধিক। অবশ্য সব কাহিনির উৎসক্ষেত্র পুরুলিয়া, ব্যক্তিকেন্দ্রে আছেন পুরুলিয়ার পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহ দেওয়ের কন্যা ভদ্রাবতী বা ভদ্রেশ্বরী। নীলমণি সিং উনিশ শতকের মানুষ। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁর ছিল ব্রিটিশবিরোধী সাহসী ভূমিকা। সুন্দরী, সদাচারণের জন্যে সবার প্রিয় ভদ্রার বিবাহের সব আয়োজন সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের দিন কন্যাপক্ষের বাড়ি আসার পথে ডাকাতের হাতে বর নিহত হন। দুঃখে আত্মঘাতিনী হন হতভাগিনী ভদ্রা। রাজা তখন প্রজাদের আদেশ করেন ভাদুকে কেন্দ্র করে পুজা-আচার পালনের। প্রজারা সর্বান্তকরণে সে আদেশ মেনে নেয়। কোনো কোনো বর্ণনায় রাজার আদেশের প্রয়োজন পড়েনি, প্রজাবৎসল রাজার দুঃখে কিংবা ভদ্রাবতীর অকাল প্রয়াণে প্রজারাও ব্যথিত হয়েছিল এবং তার মঙ্গলার্থে যে ধর্মীয় আচারাদি পালন করে সেটিই রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় পুজোপরবের রূপ নেয়। একজন গবেষকের মন্তব্য : "রাজার আদেশ না পেলেও প্রজাবৃন্দ বাঁচিয়ে রাখতো ভাদুরাণীকে। বর্ধিষ্ণু প্রজার দল রাজার নির্দেশকে গ্রহণ করলো আন্তরিক ভাবে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো গান রচনার পালা। টুসু গানের অনুকরণে জন্ম নিল ভাদু গান।"[৩]

কোনো কোনো কিংবদন্তিতে দেখা যাচ্ছে, ভদ্রাবতী আত্মঘাতিনী হননি, কিন্তু আর বিবাহ করেননি। সেজন্যে ভাদু কেন বিয়ে করছে না–এই প্রশ্ন নিয়েও গান রচিত হয়েছে। কোনো কাহিনিতে বলা হচ্ছে, কারাবন্দি প্রেমিক অঞ্জনের খোঁজে গান গেয়ে ঢুঁড়ে বেড়াতেন ভদ্রা বা ভাদু–সেই থেকে ভাদু গানের উৎপত্তি।[৪] এরই সমান্তরালে অবিবাহিতা সাধ্বী নারী হিসেবেও ভাদুকে পূজা করা শুরু করে লোকেরা, এমনটিও কেউ কেউ মনে করেন। 'ভাদু'-গবেষক সুব্রত চক্রবর্তী আরেকটি 'স্বল্পশ্রুত কিংবদন্তি'র কথা জানিয়েছেন:

> ...ভাদু ছিলেন বিবাহিত ও অতি ভক্তিমতী, কিন্তু স্বামীর ঘর করতেন না, দেব-দেউলে রাত্রি যাপন করতেন। মীরাবাঈ-এর আদলে এ ঘটনা রাজপরিবারের পক্ষে শালীন ছিল না। হয়ত সেই কারণেই রাজকর্মচারীদের সন্দেহের অবসান ঘটে ভাদুর অকালমৃত্যুতে। সেটা আত্মহত্যাও হতে পারে, হতে পারে চক্রান্তও।[৫]

ওদিকে আরেকজন গবেষক জানিয়েছেন, "... কাশীপুর রাজপরিবারের ইতিহাস কিন্তু বলে নীলমণি সিংহের কোন কন্যা সন্তান ছিল না।"[৬] এমন কাহিনিও শোনা যায় যে, ভাদু রাজা নীলমণির মেয়েই নন। জন্ম নিয়েছিল নিম্নবর্ণে। রাজা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা

করতেন। ভাদু তৃণমূলে আরাধ্য বলে কেউ কেউ এই ধারণাকে সমর্থন করেন। সনৎকুমার মিত্র স্পষ্টতই বলেছেন : "ভাদু রাঢ়ের এক লোকদেবী।"[৭]

এরকম সমাজতাত্ত্বিক মতও রয়েছে যে ভাদু আসলে কোনো নারীই নয়, ভাদ্র মাস থেকে শব্দটির উৎপত্তি। এ সময় কৃষকের ঘরে ফসল উঠতো, সেই সচ্ছলতা-স্বাচ্ছন্দ্যের আনন্দেই এই পূজা বা নারী দেবীর কল্পনা। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত এরকমই; তিনি বলেন :

> ভাদ্র মাস ব্যাপিয়া এই সঙ্গীত গীত হয় বলিয়াই ইহার নাম ভাদু গান। ক্রমে ইহার সহিত মানভূমের অন্তর্গত কাশীপুর রাজের একটি পারিবারিক কাহিনী মিশ্রিত হইয়া ইহাকে স্মৃতিপূজার রূপ দিয়াছে; কিন্তু এই কাহিনী ইহার সঙ্গে যুক্ত হইবার পূর্ব হইতেই এই সঙ্গীত এই অঞ্চলে ব্যাপক প্রচলিত ছিল; নতুবা একটি মাত্র পারিবারিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইহা মানভূম, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং সুদূর বীরভূম পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিতে পারিত না।[৮]

তবে অন্যত্র তিনি স্বীকার করেছেন যে, কাশীপুরের রাজা নীলমণি দেবশর্মার কন্যার অনূঢ়া অবস্থায় জীবনাবসান ঘটেছিল, রাজার নির্দেশে 'সানন্দে' প্রজারা মেয়েটির স্মরণার্থে পূজা শুরু করে এবং "কাশীপুর রাজপরিবারের এই বিবরণটি ঐতিহাসিক সত্য।"[৯] আমাদের বক্তব্য, বিস্তার তো শেষ পর্যন্ত সীমিতই থেকে গেছে। এমনকি উপর্যুক্ত ধারণার ধারাবাহিকতায় এই মতেরও সৃষ্টি হয়েছে যে, ভাদু দুর্গাদেবীরই নামান্তর। সেজন্যে দুর্গাপূজার ন্যায় ভাদুর পিতৃগৃহ ত্যাগ তথা নদীতে বিসর্জন দেওয়ার প্রথাও চালু হয় একসময়। কিন্তু তারপরও ভাদুসংস্কৃতি একটি সংলগ্ন ও নানাভাবে একাত্ম অঞ্চলেই রয়ে গেছে এবং সেখানেই ক্ষয়ে গেছে। উল্লেখ্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য সবসময় ভাদু গানকে আঞ্চলিক গান বিভাগেই রেখেছেন।

তবে উৎস যাইহোক এটাই সারমর্ম যে, ভাদু ও তৎকেন্দ্রিক পার্বণ একান্তই জনমানুষের সৃষ্টি। ফসল ওঠার আনন্দ ছিল, দেবী বা রাজকন্যাকে আপন ঘরের মেয়ে হিসেবে পূজার নামে বাঙালির বাৎসল্য রসের উৎসারণ ছিল, মেলাকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক কার্যক্রম ছিল, মূর্তি তৈরি-মণ্ডপ সাজানো সর্বোপরি গান রচনার মধ্য দিয়ে বাঙালির শিল্পসত্তার বিকাশের ক্ষেত্রও হয়েছিল ভাদু।

গানরূপ মন্ত্র আর সেই গান গেয়ে থাকেন পুরোহিতের বদলে মেয়েরা। ভাদ্রের শুরুতে গৃহে ভাদু বিগ্রহের প্রতিষ্ঠার পর পুরো মাসজুড়ে প্রতি রাতে মেয়েরা গান গেয়ে ব্রত পালন করেন। আর শাস্ত্রবচন বা মন্ত্রতন্ত্র যেহেতু নয়, তাই গানের কথায় পরিবর্তন আসতে থাকে। প্রথমদিকে ভাদুরই নানা বিষয় নিয়ে গান রচিত হতে থাকে। তারপর অন্য দেবদেবীর বন্দনা, বিশেষ করে বৈষ্ণব রসেরও সৃষ্টি দেখা যায়। লোকমুখে রচিত হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই বাণীভেদ সৃষ্টি হয়। আর ভাদু উৎসব যখন ওই অঞ্চলের অন্যতম বার্ষিক উৎসবে পরিণত হয়েছিল, তখন তো আরও কিছু যোগ হলো। তখন অনেক লোককবি গান রচনায় অংশ নিলেন এবং ছোটো-ছোটো গানের সংকলন বের হতে থাকে। গানের আয়তন স্বাভাবিকই ছিল; অর্থাৎ তিন-চার-পাঁচ মিনিটে গীত হতে পারে এমন ছোট ছোট গান। মফস্বলের ছাপাখানায় মুদ্রিত ওইসব অতিক্ষুদ্রাকৃতি পুস্তিকা 'হেটো বই' নামেও পরিচিত। হাটে-বাজারে বিক্রয় হতো বলে এরকম নামকরণ। এইসব বইয়ে আমরা দেখলাম ধর্মীয় প্রসঙ্গের বাইরে সমকালীন বিষয়-আশয় যুক্ত হলো। কবির সচেতনতা ও রাতভর গেয় গানে বিষয়ের বৈচিত্র্য আনার প্রয়োজনে ব্যাপারটি ঘটলো। শুধু বইয়ের গীতসম্ভারে বৈচিত্র্য আনয়নের জন্যেই নয়, সারা মাস ধরে বাড়িতে যে গান চলবে তাতেও তো ভাব-

রসের বৈচিত্র্য দরকার পড়েছিল। তদুপরি ভাদু হয়ে গিয়েছিল ঘরের মেয়ে। এমনকী ভাব প্রকাশের জন্যে ছেলে ভাদুর কল্পনাও দেখা গিয়েছে। কাজেই সমাজে সমকালে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বা বহুল আলোচিত বিষয়ও গানে ঢুকতে লাগলো। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা পেয়েছি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম প্রসঙ্গের কয়েকটি গান। জনপ্রিয়তার কারণে এসব গান ভাদু পূজার রাতের গৃহস্থ মণ্ডপ ছাড়িয়ে হাটে-বাজারে, বারোয়ারিতলায়ও চলে এসেছিল। সম্ভবত সে কারণেই, দেশ-বিদেশের সমকালীন বিষয়ও এতে স্থান লাভ করতে পারলো। এর একটি সূত্র শনাক্ত করেছেন সুধীরকুমার করণ–তিনি বলেছেন: "এ উৎসবে প্রার্থনা নেই, আবেদন নিবেদন নেই। গানের ভিতর দিয়ে পরিবেশ প্রতিবেশের কথা ব্যক্ত করেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয় মাত্র।"[১০]

আর এখন তো ভাদু গানের আধুনিক ব্যবহার চলছে। সরকার, বিভিন্ন গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল এ গান সচেতনতা-প্রচারণার জন্যে কাজে লাগায়। করোনার স্বাস্থ্যবিধি প্রচারের কথা আগেই বলেছি, স্বাক্ষরতা, নারীশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে ভাদুর আবেদন কাজে লাগানো হয়। আধুনিক শিল্পসাহিত্যেও গান ও ভাদু সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় ব্যবহৃত হতে দেখা যাচ্ছে। যেমন, *ভূমিকন্যা* (২০০৬) নামে উপন্যাস লিখেছেন নীলকণ্ঠ ঘোষাল, *ভাদ্রজা* (প্রথম মঞ্চায়ন: ৩ মে ২০১৮) নামে নাটক রচনা করেছেন সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়–এরকম উদাহরণ আরো অনেক দেয়া যেতে পারে।

প্রমাণ-পরিচিতি ও পাঠ-সম্পাদনা

ভাদুসংস্কৃতি প্রথমত আঞ্চলিকতায় সীমিত ও দ্বিতীয়ত ক্ষয়িষ্ণু বিধায় আমাদের ভূমিকা কিছু দীর্ঘ করতে হয়েছে। তেমনি আমাদের উদ্ধারকৃত সংকলনটি একরকম হারিয়ে গিয়েছিল বলে প্রামাণিকতার প্রয়োজনে এর পূর্ণ পরিচিতি ও সংশ্লিষ্ট অংশের পাঠ সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করেছি। বস্তুত ওই অঞ্চলে হেটো বই বলে পরিচিত এসব সংকলনের প্রকাশ এখন একেবারে কমে এসেছে। যেটুকু প্রকাশিত হয় সেখানেও লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। অর্ধশতাব্দী পূর্বের আলোচ্য বইটি সেই সময়ের বস্তুগত নিদর্শনও বটে। হস্তচালিত মুদ্রণ যন্ত্রের পেষণকৃত ছাপা, সাবেকি অক্ষরবিন্যাস, এমনকী বিজ্ঞাপন ও তার মধ্যে উৎকীর্ণ তিন অঙ্কের টেলিফোন নম্বরটিও বেশ কৌতূহল জাগায়।

পুস্তিকাটির প্রচ্ছদ পৃষ্ঠার উপরে লেখা ছিল "শ্রীশ্রীহরি"। নিচে এক লাইনে লেখা "স্বাধীন বাংলা" তার নিচে অপর লাইনে "ভাদু সঙ্গীত"। যথারীতি গ্রন্থনাম মোটা হরফে লিখিত। এই পুস্তিকা শিরোনামটির মাঝখানে রয়েছে নৃত্যরতা মানুষের ছবি। ছবির নিচে যুক্ত হয়েছে নিম্নরূপ গ্রন্থতথ্য :

> স্বাধীন বাংলা ভাদুর গান
> সবাই পড়রে ভাই দিয়ে মন প্রাণ।
> বাংলা দেশ স্বাধীন হবে হবেরে ভাই পুণ্যধাম
> তাই গাওরে ভাই সবাই মিলে স্বাধীন বাংলা ভাদুর গান!
> মূল্য মাত্র লাগবেরে ভাই বার নয়া দাম
> এ-বছরে হোলরে ভাই স্বাধীন বাংলা ভাদুর গান।

উপর্যুক্ত পরিচিতিমূলক পদ্যের নিচে লেখক ও প্রকাশকের পরিচয় দেওয়া হয়েছে নিম্নোক্তভাবে :

> প্রণেতা–**শ্রীকালীপদ কুণ্ডু**–কীর্ত্তনগায়ক
> শালবনী, বাঁকুড়া।
> প্রকাশক–**শ্রীনিমাইচন্দ্র রক্ষিত**।
> সাং–বাঁকুড়া।

ছবি, দেব-প্রশস্তি, ভূমিকা-কবিতিকা ও লেখক-প্রকাশক তথ্যাবলির চারপাশে মাছের নকশা দিয়ে সীমারেখ অঙ্কন করা হয়েছে। তার নিচে মুদ্রাকর তথ্য

হিসেবে লিখিত হয়েছে: "সরস্বতী প্রেস, নুনগোলা রোড, বাঁকুড়া।" এরপর ২ থেকে ১১ নম্বর পৃষ্ঠাব্যাপী সংখ্যানির্দেশ ও শিরোনামাঙ্কিত করে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মোট ১৭টি গান; সেগুলো নিম্নরূপ:

১। গৌরচন্দ্রিকা
২। কৃষ্ণবিরহিণী রাধিকা (মাধবীতলায়)
৩। রাধার বিরহ
৪। রাধার অন্তঃবাহ্য দশা
৫। ভাবোল্লাসে মিলন
৬। ভাদুর মাহাত্ম্য
৭। কাশীপূরে [কাশীপুরে] ভাদুপূজা
৮। ভাদুর আরতি (কীর্ত্তনসুর)
৯। ভাদুর বাসর দেখে
১০। বিদায়
১১। শরণার্থী
১২। [রোম। ১লা ডিসেম্বর] ১৯৭০ ইউবন আই ; ডি পি এ
১৩। দেশের হাওয়া
১৪। বাসে চেপে মানুষের দুর্গতি
১৫। শালবনীতে প্রধানমন্ত্রী
১৬। জয়বাংলা
১৭। ইতিহাস
১৮। বাজারের এখন সেরা লাল নিশান বিড়ি

শেষের পুরো পৃষ্ঠাজুড়ে ছিল সুবিধাদির বিশদ বর্ণনা সহযোগে বাঁকুড়ার 'সুধা লজ' নামের আবাসিক ভোজনালয়ের বিজ্ঞাপন।

প্রচ্ছদের ভূমিকাবিশেষ ও ১১, ১৬ ও ১৭ গান তিনটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক। পরিসর স্বল্পতার কারণে আমরা শুধু এই অংশগুলোর পাঠ-সম্পাদনা পেশ করলাম:

১১। শরণার্থী

পূর্ব্ব বাংলা হতে।
দলে দলে আসছে মানুষ ভারতে ॥
ঘর দুয়ারে সব ছেড়ে দিয়ে গো, আসছে প্রাণের ভয়েতে।
সেই ইয়াহিয়া জঙ্গী শাহীর, ভীষণ অত্যাচারেতে ॥
কেহ পুত্রহারা, কেহ স্বামী হারা গো, কেঁদে কেঁদে রাস্তাতে।
কেহ ধন সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ॥
কিবা হিন্দু, কিবা খৃশ্চানগো, কিবা মুসলমানেতে।
লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার, আসছে বলি দিন রাতে ॥
কেঁদে কেঁদে বলছে সবাই গো, যমুনা [যামু না] পাকিস্থানেতে।
তবে স্বাধীন বাংলা হলে পরে ফিরে যাব দেশেতে ॥

১৬ । জয়বাংলা

পশ্চিম বাংলাতে।
জয়বাংলা হচ্ছে সবার চোখেতে ॥
জয়বাংলা বলছে মুখে গো, হচ্ছে অমনি চোখেতে।
কিবা কট্ কটানী, খচ্ খচানী হচ্ছে চোখ লাল বোমেতে ॥
সহরে সহরে বলি গো, প্রতি গ্রামে গ্রামেতে।
কেওত [কেউ তো] বাকী, রইলনারে প্রতি ঘরে ঘরেতে ॥
এমনি দয়াল জয়বাংলা গো জাতের বিচার নাই তাতে।
কিবা ব্রাহ্মণ, কিবা শুদ্র, কিবা হাড়ী, চণ্ডালেতে ॥
যার কপাল মন্দ বলিগো, পড়ে রইল ভবেতে।
এই জয় বাংলা, দেখনারে, কত কষ্ট চোখেতে ॥

কানা, কানি [কানাকানি] যাচ্ছে শুনা গো, এই যে পশ্চিম বাংলাতে।
জয় বাংলা, হোল না যার, পাচ'শ [পাঁচশ'] টাকা পুরস্কারেতে॥

১৭। ইতিহাস

ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে।
লেখা থাকবে যুগ যুগান্তরে॥
ইয়াহিয়ার বর্বরতা গো বাংলাদেশের উপরে।
নরহত্যা, নারী ধর্ষণ করছে গো সব অকাতরে॥
ঘরে ঘরে ঢুকে বলিগো, গুলি করে হত্যা করে।
ধন সম্পত্তি লুটপাট করে, আগুন লাগায় চারিধারে॥
বড় বড় সহরগুলাকগো, মেশিনগান আর মর্টারে।
বোমা ফেলে ঘর বাড়ী সব দিচ্ছে ধূলীস্মাৎ করে॥

বিশ্লেষণ

ভাদু বিষয়ক একজন গবেষক যথার্থই বলেছেন : "সমসাময়িক ঘটনা বা সে বৎসরের উল্লেখযোগ্য কোনো বিষয় সহজেই লোককবির মন আকর্ষণ করে। তাৎক্ষণিকভাবে রচিত হয় গান। ভাদুর ক্ষেত্রে এরূপ উদাহরণ কিছু কম নেই।"[১১] এই উদাহরণাদির একটি আমাদের প্রাপ্ত সংকলন। সচেতনতা বা সমকাললগ্নতা–যেভাবেই বলি, সেটা গীতিকার কালীপদ কুণ্ডুর মধ্যে যথেষ্ট ছিল। তাই তাঁর গানের কাটতি ছিল; তিনি জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন বলা যায়। সুব্রত চক্রবর্তী তাঁর ভাদু বিষয়ক গবেষণায় ৪৫ বছর ধরে যে সমস্ত গীতিকারের হেটো বই সংগ্রহ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে গীতিকার হিসেবে সর্বাগ্রে নাম করেছেন কালীপদ কুণ্ডর। জনপ্রিয়তাহেতু অন্য গীতিকারগণও গান রচনা করে কালীপদ কুণ্ডুর নামে ছাপিয়েছিলেন বলে শ্রীচক্রবর্তীর সঙ্গত ধারণা। কারণ এমন সমসাময়িক বিষয়াবলি নিয়ে তাঁর নামে গান পাওয়া যাচ্ছে, যেসব ঘটনা ঘটার পূর্বেই কালীপদ মৃত্যুবরণ করেছেন। তবে চক্রবর্তী মহাশয় কালীপদ কুণ্ডু বিষয়ে তথ্য প্রদান করতে গিয়ে শুধু 'বর্তমানে প্রয়াত' বলে উল্লেখ করেছেন এবং ১৯৮৮ সালে রচিত গ্রন্থে তাঁর "নামের পাশে বিন্দু যুক্ত" এবং "কীর্তন গায়ক" বিশেষণটি দেখেছেন।[১২] আমরা ইতোমধ্যে দেখিয়েছি যে, আমাদের সংগৃহীত বইতে "কীর্ত্তন গায়ক" পরিচিতির পাশাপাশি "শালবনী, বাঁকুড়া" ঠিকানাও যুক্ত হয়েছিল।

আমাদের ক্ষেত্র-অনুসন্ধানের প্রধান অঞ্চল ছিল বাঁকুড়ার শালবনী ও সন্নিহিত এলাকা। কালীপদ কুণ্ডুর পরিবারের দেয়া তথ্যমতে গীতিকারের জন্ম ১৮৯৮ ও মৃত্যু মার্চ ১৯৮৭। বাঁকুড়া জেলা স্কুলে তিনি পড়াশুনা করেছিলেন বর্তমান অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। ধনী-পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও শিল্পঅন্তপ্রাণ কালীপদ পৈতৃক সম্পত্তি ধরে রাখতে পারেননি। মূলত কৃষিকর্মের ওপর জীবিকা নির্বাহ করতেন। কালীপদ কুণ্ডুর সহধর্মিণীর নাম ছিল যামিনী (যুগল) কুণ্ডু। এই দম্পতির ছিল চার কন্যা, এক পুত্র; ছেলেটি অল্পবয়সেই মারা যান। কবি কালীপদ ছিলেন রাজনীতি সচেতন মানুষ; যুক্ত ছিলেন সমাজতান্ত্রিক দলের সাথে। সংগীতে তিনি বিষ্ণুপুর ঘরানার বিশিষ্ট গাইয়ে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কিছুদিন তালিম নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। ভাদু গান রচনার পাশাপাশি ভাগবত, চৈতন্যপ্রভু বিষয়ে গান গাইতেন কালীপদ। এসব বিষয়ে গান কিংবা কীর্তন নিজেও লিখেছেন বলে ধারণা করা গেলেও তার কোনো নমুনা পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে কালীপদ কুণ্ডুর গায়ন-বাদনের কথা এখনো সে এলাকার সংশ্লিষ্টরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে থাকেন। প্রবীণারা জানিয়েছেন যে, তাঁরা ভাদ্রের রাতগুলোতে কালীপদ কুণ্ডুর হেটো বই থেকে

গান গেয়েছেন ভাদু মূর্তির সামনে। বয়সী লোকগায়ক বংশীপদ কুণ্ডু জানিয়েছেন, তাঁর শিল্পচর্চার হাতেখড়ি কালীপদ কুণ্ডুর কাছে। পরিবারের লোকজন আজও স্মরণ করেন সেই সব দিনের কথা, ভাদু পরবের সেই আড়ম্বরের কালে ভাদ্র মাসে বাড়ি থেকে একদিকে কালীপদ কুণ্ডুর ভাদু গানের হেটো বই ভক্তরা নিয়ে যাচ্ছেন আর দিয়ে যাচ্ছেন মিঠাই-মণ্ডা। গানের সাথে সাথে মিঠাই-জিলাপি প্রভৃতি মিষ্টান্ন আর গ্রামীণ খাদ্যও ছিল ভাদু উৎসবের অনিবার্য উপাদান।

প্রাপ্ত পুস্তকে মুদ্রণকাল কোথাও উল্লিখিত হয়নি। তবে প্রথম পৃষ্ঠার কবিতিকায় রয়েছে : "বাংলা দেশ স্বাধীন হবে হবেরে ভাই পুণ্যধাম।" এ থেকে অনুমান করা যায় যে, যুদ্ধকালীন সময়ে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা আরো ধারণা করতে পারি যে, এসব বই যেহেতু ভাদু পরবকে সামনে রেখে বের হতো, তাই ১৯৭১ সালের মধ্য আগস্টের কিছু আগে প্রকাশিত হয়েছে। এসময় বাংলাদেশ 'স্বাধীন হবে' এবং পুণ্যধামে পরিণত হবে, এইরূপ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে কবি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতেই হয়। এ প্রত্যাশা যে ওই জনপদের সাধারণ মানুষেরও ছিল, সেটিও নিশ্চিত করে বলা যায়।

সে সময়ের আলোচ্য বা আগ্রহের বিষয় মাথায় রেখে গান রচনার পাশাপাশি নামকরণ করা হয়েছিল *স্বাধীন বাংলা ভাদু সঙ্গীত*, যদিও মোট ১৮টি গানের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গান ছিল তিনটি। প্রথম পাঁচটি গান বৈষ্ণব প্রসঙ্গে; ১ নম্বর গান 'গৌরচন্দ্রিকা'ও বস্তুত কৃষ্ণবন্দনা। উল্লেখ্য, কালীপদ কীর্তন গায়ক ছিলেন বলেই যে এতোগুলো বৈষ্ণব প্রাসঙ্গিক গান যুক্ত করেছেন এটিই একমাত্র কারণ নয়; ভাদু ভাবধারার যে বিবর্তন হয়েছে, দুর্গা হিসেবে তাকে কল্পনা করা হয়েছে, তেমনি বৈষ্ণব মতের সাথেও তার মেলবন্ধন ঘটেছিল। বিষ্ণুর কোলে ভাদু এমন বর্ণনায়ও গান পাওয়া যায়। ৬ থেকে ১০ নম্বর অর্থাৎ পরবর্তী পাঁচটি গান সরাসরি ভাদু প্রসঙ্গে। ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৮ নম্বর গানের প্রসঙ্গ সমকালীন স্থানীয় ঘটনাবলি। ১২ নম্বর গানের প্রসঙ্গ আন্তর্জাতিক; ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে খবর বেরিয়েছিল যে কিউবায় ক্রুশবিদ্ধ যিশুমূর্তি থেকে রক্ত ফিনকি দিয়ে পড়ছে, ঘটনাটি জনমনে আলোড়ন তুলেছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রাসঙ্গিক ১১ নম্বর গানের শিরোনাম "শরণার্থী"। একাত্তরে প্রায় এক কোটি মানুষ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই বেশির ভাগ মানুষের অভিমুখ ছিল পশ্চিমবঙ্গ। এ রাজ্যের নদীয়া, বসিরহাট, বনগাঁ, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদা ইত্যাদি সীমান্তবর্তী এলাকাসহ রাজধানী কলকাতায় বিপুল সংখ্যক মানুষ অবস্থান নিয়েছিল। এ সব অঞ্চলে মূল অধিবাসীর তুলনায় অনেক সময় শরণার্থীর সংখ্যাই অধিক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ করে আসা এই বিরাট সংখ্যক মানুষকে আশ্রয় দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে হিমসিম খেতে হয়। অনাহার-অসুস্থতা পরিস্থিতিকে বেশ কঠিন করে তোলে। এজন্যে অন্য রাজ্যের দূরবর্তী স্থানে শরণার্থী স্থানান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তবে বিশেষত অবাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে শরণার্থীরা যেতে অনিচ্ছুক ছিল বলে তথ্য পাওয়া যায়। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের আরো কিছু জেলায় শরণার্থীরা ছড়িয়ে পড়ে–রাজ্যের সীমান্ত জেলা পুরুলিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায় অনেকে। এসব জায়গাতেও শরণার্থী শিবির খোলা হয় সরকারিভাবে, স্থানীয়দের সহযোগিতাতেও আশ্রয় পায় অনেকে। এরই ধারাবাহিকতায় বাঁকুড়া জেলাতেও শরণার্থী প্রবেশ করে। বিশেষ করে সোনামুখি, জয়পুর এলাকায় বেশি সংখ্যক মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। বাঁকুড়া বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী না

হলেও বাংলাদেশের অনেক মানুষের আদিপুরুষের বসবাস ছিল বাঁকুড়াতে। প্রকৃতিগতভাবে এ অঞ্চলের মানুষ অতিথিপরায়ণ, মানবদরদি; তাছাড়া বাঁকুড়া পশ্চিমবঙ্গের কম জনঘনত্ববিশিষ্ট জেলার অন্যতম। তাই সীমান্তবর্তী এলাকার মতো সেখানকার পরিস্থিতি হয়তো ততোটা দুর্বিষহ হয়নি, তবে বাস্তুহারা মানুষের দুঃখ-কষ্ট ঠিকই এলাকার মানুষের অন্তর স্পর্শ করেছে। তারই সাক্ষ্য মেলে এই গানটিতে। ইয়াহিয়াকে সঠিকভাবেই 'জঙ্গী শাহী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নিদারুণ অত্যাচারে স্বজনহারা মানুষের নিজ আবাস-ধনসম্পত্তি ছেড়ে দলে দলে ভারত গমনের বিষয়টি দরদের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। সচেতন কবি আরো জানিয়েছেন, বাংলাদেশে শুধু হিন্দু বা খ্রিষ্টান নয়, মুসলমানও অর্থাৎ সব ধর্মমতের মানুষের প্রতি অত্যাচার করা হচ্ছে। কাজেই বিজাতীয় সামরিক সরকারের আসল চরিত্র বা বাংলাদেশে ঘটমান নৃশংস পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছেন গ্রামীণ কবি।

১৬ নম্বর গানের শিরোনাম "জয়বাংলা"। তবে এখানে ঠিক মুক্তিযুদ্ধের প্রধান স্লোগান হিসেবে যে "জয় বাংলা"কে জানি, সে অর্থে প্রযুক্ত হয়নি। এটা ঠিক "জয় বাংলা" স্লোগান তখন পঞ্চান্নহাজার বর্গমাইল ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতে যেহেতু প্রচুর শরণার্থী পৌঁছেছিল, তাই "জয় বাংলা" স্লোগানটির সেখানে বহু বিষয়ে নানা মাত্রায় প্রয়োগ দেখা গিয়েছিল। এর অন্যতম ছিল চোখের অসুখের নামকরণ। এটি বস্তুত ভাইরাস আক্রমণের প্রতিক্রিয়ামূলক অসুস্থতা conjunctivitis. জ্বর ও মাথাব্যথার পাশাপাশি বিশেষ যেটা বিড়ম্বনা দিতো তা হলো চোখ লাল হয়ে ফুলে যাওয়া। বাংলাদেশে এটি জনসাধারণের মধ্যে 'চোখ ওঠা' বলে পরিচিত। সম্ভবত সেবারই প্রথম পশ্চিমবঙ্গসহ সারা দেশেই এটা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে–অবান্তর আতঙ্ক ও ভিত্তিহীন গুজবও তৈরি হয়েছিল এ নিয়ে। সাম্প্রতিক ঘটনার সাথে মিলিয়ে লোকমুখে এর নামকরণ হয়ে গিয়েছিল 'জয়বাংলা'। পত্রপত্রিকাতেও এই নাম ব্যবহৃত হয়। সরকারিভাবেও শব্দটি ব্যবহারের উদাহরণ আছে। এমনকী D D Pramanik নামে একজন ডাক্তার *Joy Bangla, An epidemic of conjunctivitis in India* শিরোনামে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গবেষণা প্রবন্ধও লিখে ফেলেন।[১৩] এখনও বাঁকুড়াসহ পশ্চিমবঙ্গে রোগটির লোকনাম হিসেবে 'জয়বাংলা' ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রাণঘাতি নয়, এমন একটি সংক্রামক রোগে যখন সর্বসাধারণ আক্রান্ত হয় এবং যার বাহ্যিক উপসর্গ হলো চক্ষুদ্বয় অগ্নি কিংবা রক্ত বর্ণ হওয়া, তা নিয়ে কিছুটা রঙ্গরসিকতা হতেই পারে। সেসময় সেরকম হতো বটে। কালীপদ কুণ্ডুও করেছেন, যেমন বলছেন : "জয়বাংলা বলছে মুখে গো, হচ্ছে অমনি চোখেতে।" পশ্চিমবাংলায় যে ব্যক্তি এই রোগ থেকে মুক্ত থাকবে, তাকে পাঁচশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে মর্মে 'কানাকানি' চলার রসিকতা দিয়ে গানটি হয়েছে। তবে এই রসিকতার সূত্রেই লোককবির সুগভীর ব্যঞ্জনাময় প্রৌঢ়ক্তি প্রকাশ পেয়েছে। যথা:

> এমনি দয়াল জয়বাংলা গো জাতের বিচার নাই তাতে।
> কিবা ব্রাহ্মণ, কিবা শুদ্র, কিবা হাড়ী, চণ্ডালেতে ॥

১৭ সংখ্যক গানটির শিরোনাম "ইতিহাস"। পূর্বে বলেছি, গানগুলো মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি পর্যায়ে লেখা। তাই এই গানে বাংলাদেশে সংঘটিত নারকীয় পরিস্থিতির বর্ণনা আছে। এসব ঘটনার কিছু কবি শরণার্থীদের কাছে শুনে থাকবেন, সেসবই হৃদয়স্পর্শী ভাষায় আবেগাত্মক "গো" শব্দযোগে বর্ণনা করেছেন:

ইয়াহিয়ার বর্বরতা গো বাংলাদেশের উপরে।
নরহত্যা, নারী ধর্ষণ করছে গো সব অকাতরে॥
ঘরে ঘরে ঢুকে বলিগো, গুলি করে হত্যা করে।

রচয়িতা গানটিতে মানুষের ধন-সম্পত্তি লুট, নগর-শহর ধূলিস্যাৎ করার কথা উল্লেখ করেছেন। যুদ্ধের প্রথম তিন-চার মাসে প্রতিরোধ সাংগঠনিকভাবে বাংলাদেশ জুড়ে শুরু হয়নি বা তখন পর্যন্ত চমকপ্রদ ধারাবাহিত সাফল্যও আসতে শুরু করেনি, তাই সামরিক-অগণতান্ত্রিক শাসকের ধ্বংসযজ্ঞের কথাই শুধু এসেছে। তবু গানের শুরুতে রয়েছে:

ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে।
লেখা থাকবে যুগ যুগান্তরে॥

যুদ্ধ যা অমানিশার সাথে তুলনীয়, তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়ার কথা নয়। তবে আমরা ধারণা করতেই পারি, বহুদর্শী কবি সেদিনই এই বিশ্বাস লালন করেছেন যে, করেছেন এই ত্যাগ-তিতিক্ষা আর সংগ্রামের ধারায় বাঙালি অচিরেই স্বাধীন বাংলা গঠন করবে। সেই ঘটনাই ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। বইয়ের মুখবন্ধে তো তারই ব্যঞ্জনা ছিল। কালীপদ কুণ্ডুর নাতনী নন্দিতা পাল–যিনি বার্ধক্যজনিত রোগে শয্যাশায়ী কবিশিল্পীকে শেষজীবনে সেবা-শুশ্রূষা করেছেন, গান-কবিতার লিপিকরের দায়িত্বও পালন করেছেন–তিনি স্মরণ করতে পারেন, কালীপদ কুণ্ডু তাঁর ঘরের দেওয়ালে বিভিন্ন মনীষীর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবিও টাঙিয়ে রেখেছিলেন। সুধীরকরণ ভাদু বিষয়ক আলোচনায় বলেছিলেন : "এই ধরনের অসংখ্য লোকসংগীতের মাধ্যমে লোক-মনের চিন্তার ধারাকে ছড়িয়ে দেওয়া সহজ ভাষায়, সহজ সুরে। কোন কৃত্রিমতার ছাপে এ সংগীতগুলি লোক-ধর্মকে বর্জন করে না।"[১৪] এ কথা কালীপদ কুণ্ডুর গানগুলির ক্ষেত্রেও সত্য।

উপসংহার

আমরা বিস্মৃতির অন্তরালে থাকা একজন লোকগীতিকারের জীবনকর্মের অতিসংক্ষিপ্ত রূপরেখা তৈরি করলাম বটে, তবে উদাহৃত হলো আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের তাৎপর্যময় কিছু তথ্য। প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সীমান্তসংলগ্ন এলাকা বা রাজধানী কলকাতা ছাড়িয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষও যে সীমান্তপারের স্বজাতিকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেছিল তা অনুভব করা গেল। গ্রামীণ গীতরচয়িতার শিল্পসত্তায় আলোড়ন তুলেছিল এপারের বাঙালির দুঃখদীর্ণ ও সংগ্রামী জীবন। পরদেশের মানুষের শোকতাপে নিজেও সন্তপ্ত হয়েছেন, তাদের করুণতম রাত্রির শেষে যে স্বাধীনতার গৌরবোজ্জ্বল দিবস সমাসন্ন, সেটিও দেখতে পেরেছিলেন। অন্তত বলা চলে, সমকালীন লোকমানসের প্রত্যাশাটি উচ্চারণ করেছিলেন। হয়তো নির্দিষ্ট লোকরীতির বাধ্যবাধকতায় কিংবা লোককবির স্বল্পজ্ঞানের কারণে এসব সংগীতকে খুব বেশি উচ্চাঙ্গের বলতে কেউ কেউ আপত্তি করবেন, কিন্তু আন্তরিকতা ও অকৃত্রিমতায় যে সেগুলো মহিমান্বিত, তা বলতেই হবে। এ জাতীয় সংগীতের প্রধান সাফল্য জনচিত্ত আকর্ষণ, সেটি সম্যকভাবেই অর্জিত হয়েছিল। আরও স্বীকার করতে হবে গানগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য। এসবের মধ্য দিয়ে আবারও প্রমাণিত হয়েছে, লোকসাহিত্যের সমকাললগ্নতা ও আত্মস্থকরণের অনিঃশেষ ক্ষমতা।

তথ্যনির্দেশ

১. https://zeenews.india.com/bengali/state/corona-also-included-in-indian-folk-bhadu_339426.html (Accessed 08 October 2020)

২. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম

খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, (ষষ্ঠ সং) ১৯৭৮, পৃ. ৮৪

৩. সুধীরকুমার করণ, *সীমান্তবাঙলার লোকযাত্রা*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কো প্রা লি, কলকাতা, ১৯৭১ব. পৃ. ১৪৬

৪. https://www.shobdonir.com/laxman/150350 (Accessed 08 October 2020)

৫. সুব্রত চক্রবর্তী, ভাদু, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, (পু মু) ২০১৭, পৃ. ৯

৬. দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, *টুসু ও ভাদু : তুলনা ও বিশ্লেষণ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৩০

৭. "ভাদু", *বাঙলার লোকসঙ্গীত*, অমর পাল, দুলাল চৌধুরী সম্পাদিত, আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ১১৪

৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোক-সাহিত্য*, ৩য় খণ্ড, প্রদ্যোৎ কুটির, কলকাতা, ১৯৫৪, পৃ. ৭৬

৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোক-সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস (পরিবর্ধিত তৃতীয় সং), কলকাতা, পৃ. ২৪১-৩

১০. সুধীরকুমার করণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

১১. দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

১২. সুব্রত চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

১৩. https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/51907 (Accessed 08 October 2020)

১৪. সুধীরকুমার করণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-2, December 2020
pp· 18-23

ত্রিপুরার বাংলা উপন্যাস : ইতিহাস ও অস্তিত্বের অনুসন্ধান

সৌম্যদীপ দেব

সৌম্যদীপ দেব
স্নাতকোত্তর
বাংলা বিভাগ
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়
আগরতলা, ৭৯৯০০৫
ত্রিপুরা, ভারত
e-mail : saumyadeepdeb628@gmail.com

সারসংক্ষেপ

উপেক্ষা ও অবহেলা, সাথে প্রতিষ্ঠার এক নীরব আত্মপ্রক্ষেপ রাজ দরবার থেকে সাধারণের হাতে গড়ে ওঠা নিজস্বতার বহু বর্ণিল সন্ধান কাব্য, প্রবন্ধ হয়ে কথাসাহিত্যে দুর্বার গতি ধ্বনিত হয়েছে। ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানা অসামঞ্জস্যতার মধ্যেও কথাসাহিত্য ত্রিপুরায় তার স্বতন্ত্র পরিচিতি স্থাপন করেছে, যে উপন্যাস যাত্রা শুরু করেছিলো 'রবি' পত্রিকার হাত ধরে, আজ সেই পথের একশো বছর সমাসন্ন। লেখকদের প্রয়াস কতোটা সফল তা মূল্যায়নের সময় হয়েছে। সকলেই যে মাতৃভূমি থেকে উপাদান বা বিষয় নির্বাচন করে উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছেন তা নয়-কিন্তু যে কয়েকজন ঔপন্যাসিক তাঁদের উপন্যাস শিল্পের মধ্য দিয়ে নিজ অস্তিত্বের অনুসন্ধান করেছেন তাঁদের হাতে ত্রিপুরার উপন্যাস এক বিশেষ মাইলফলক হয়ে উঠেছে। সুদূর অতীতে তা আরো প্রসারিত হয়ে নিজস্বতার অনুভবকেই ব্যক্ত করবে।

মূলশব্দ

উপন্যাস, ত্রিপুরা, উত্তর-পূর্ব, ইতিহাস, অস্তিত্ব

গবেষণার উদ্দেশ্য

একই ভূ-খণ্ড হয়েও ভৌগোলিক অবস্থান কতোটা বৈচিত্র্য স্থাপন করে, বাংলা সাহিত্যের এক প্রত্যন্ত চর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠা ত্রিপুরার কথাসাহিত্য প্রাণোচ্ছল অতীতে প্রবহমান থেকে বিষয়ের জ্ঞানগর্ভতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে তা প্রমাণ করেছে। ত্রিপুরার বাংলা উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আজ দিকসূচক হয়ে উঠেছে। কাদের হাতে এখানকার উপন্যাসের ইতিহাস গড়ে উঠেছে? কাদের লেখনী অস্তিত্বের অনুসন্ধানী মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হয়েছে? এই জিজ্ঞাসাগুলো সামনে রেখেই এই গবেষণাকে এগিয়ে নেয়া হয়েছে।

বিশ্লেষণ

'উপনয়' বা 'উপন্যস্ত' শব্দ থেকে 'উপন্যাস' শব্দের উৎপত্তি, যা ইংরেজি 'Novel' শব্দের পরিভাষা রূপে গৃহিত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন হল উপন্যাস। পৃথিবীর প্রথম উপন্যাস হিসাবে ধরা হয় জাপানি লেখক মোরাসাকি সিকিবোর 'The Tale of Gengi'কে। পরবর্তীতে আরো এক-

দুটো উপন্যাসের উল্লেখ পাওয়া যায় ১৬০৫ থেকে ১৬১৫-র আশেপাশের সময়কালে। তবে বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাসের জয়যাত্রা সূচিত হয় ১৮৫২ সালে হানা ক্যাথেরিন মুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'-এর মধ্য দিয়ে। উপন্যাস রচনায় ব্যক্তিচেতনা ও সমাজচেতনা অপরিহার্য। একটি সার্থক উপন্যাসে কাহিনি, ঘটনা, চরিত্র, বর্ণনাভঙ্গি, রীতি ও প্রকরণ কৌশল, রস, সংলাপ, ভাষা ও বাস্তবনিষ্ঠ রূপায়ণের অমোঘ সমন্বয় ঘটে। ১৮৫৮ তে প্রকাশিত 'আলালের ঘরের দুলাল' কে অনেকেই সর্বাংশে সার্থক বলে বিশ্লেষণের পক্ষপাতি নয়। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা উপন্যাস তার নিজস্ব পাটাতন লাভ করেছিলো। ফলত 'দুর্গেশনন্দিনী'কে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস বলা হয়। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের পথ অনুসরণ করে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, দামোদর মুখোপাধ্যায়, প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট জনেরা উপন্যাস রচনা করেছেন। মূলত উপন্যাসে বিপ্লব আসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে।

আলোচনার সুবিধার্থে শুধু উওর-পূর্ব ভারতের প্রান্তিক অঞ্চলে (ত্রিপুরা) বাংলা উপন্যাসের অবস্থানকে এই আলোচনায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। উওর-পূর্ব ভারতের বঙ্গভাষার ভূখণ্ড সর্বকালেই প্রচলিত বঙ্গভূখণ্ড থেকে ব্রাত্য থেকেছে, যার জন্য বাংলা সাহিত্যের বিদগ্ধ অধ্যাপক ড. তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন,–

"'আমরা' এবং 'ওরা'র বিভাজন এমনভাবে মান্যতা পেয়ে গেছে যে পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বলের চেয়েও ঢের বেশি অন্তেবাসী ও অপাঙক্তেয় হয়ে রয়েছে উওর- পূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিত।"[১]

পঞ্চদশ শতাব্দীতে কাব্য ও প্রবন্ধ সাহিত্যের হাত ধরে ত্রিপুরায় বাংলা সাহিত্যের সূচনা হয়। রাজবাড়িতে বাংলা ভাষার চর্চা ও চর্যা হতো। এমনকি রাজ্য প্রশাসনের কাজেও বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হতো। কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত 'রাজমালা' বা 'ত্রিপুরার ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা থেকে তা আরো স্পষ্টতা পায়,–

"ত্রিপুরা ভারতবর্ষের মধ্যে একটি অতি প্রাচীন রাজ্য। সুবিখ্যাত গুপ্ত সম্রাটদিগের শিলালিপি পর্যালোচনা দ্বারা অনুমিত হইতেছে যে, মিবারও ইহার ন্যায় প্রাচীন নহে। ত্রিপুরার রাজভাষা বাঙ্গালা, ইহার অধিকাংশ তাম্রশাসন বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত। এই রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস "রাজমালা" প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের রত্নমালা স্বরূপ। সুতরাং ত্রিপুরার গৌরবে বাঙ্গালি ও বাঙ্গালা ভাষা গৌরবান্বিত।"[২]

ত্রিপুরা কোনো বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড নয়, কিন্তু অঞ্চলটি প্রত্যন্ত। ত্রিপুরার কথাকারেরাই নিজেদের সামগ্রিক স্বরূপ তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে তুলে ধরার চেষ্টা করে চলেছেন। সামাজিক, অবস্থানগত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্যেও ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্য তার মূল লক্ষ থেকে ভ্রষ্ট হয়নি। কথাকার শেখর দাস তাঁর ত্রিপুরার গল্প 'ভুবনে দাঙ্গা ও সন্ত্রাসবাদের প্রতিক্রিয়া' প্রবন্ধে লিখেছেন,–

"ত্রিপুরার কাব্য চর্চার ইতিহাস যতটা সুপ্রাচীন, কথাসাহিত্য-বিশেষত গল্প রচনার ইতিহাস ততটা প্রাচীন নয়। মাত্র সত্তর-আশি বছরের। রাজন্য যুগে আগরতলা থেকে যে দু-একটি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হত সেগুলোতে বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে দু-একটি গল্পের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সে'সব গল্পে শহুরে জীবনের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন দেখা যায়, তেমনি ত্রিপুরার গ্রামীণ উপজাতি জীবনের নানা সমস্যারও সন্ধান পাওয়া যায়। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে দেশের স্বাধীনতা লাভের পর-পাঁচের দশক থেকে। দেশের স্বাধীনতা লাভের পর রাজন্য

ত্রিপুরার ভারতভুক্তি ও বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে সারা রাজ্যের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক নানা পরিবর্তন ও টানাপোড়েন জনমনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে প্রধানত সেই আলোড়নই রাজ্যের আধুনিক গল্প রচনার পথ প্রশস্ত করে।"[৩]

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস ত্রিপুরার পাঠকদের মুগ্ধ করলেও সেগুলির অনুপ্রেরণায় উপন্যাস লেখার মতো প্রতিভা তখন ছিল বিরল। ত্রিপুরায় উপন্যাস লেখার প্রথম প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় 'রবি' পত্রিকা (১৯২৪) প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে প্রকাশিত পরিমল কুমার ঘোষ -এর 'খাঁচার পাখি' নামক একটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। পর পর চারটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে এই উপন্যাস প্রকাশিত হলেও, তা অসম্পূর্ণ। ত্রিপুরায় প্রথম দিকে যাঁরা উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ঔপন্যাসিক প্রদীপ আচার্য্য আদি পুরুষ। মাত্র নয় বছর বয়সেই তিনি লেখালেখি শুরু করেন। ১৯৭২ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পথের প্রদীপ' প্রকাশিত হয়। বইটির মূল্য ছিলো চার টাকা। ১৯৭১ -এর ঘটনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'পথের প্রদীপ'। পরবর্তীকালে তিনি আরো বেশ কিছু উপন্যাস লিখেছিলেন- 'গোমতীর স্বপ্ন', 'দুই অধ্যায়', 'জীবন যে রকম', 'হোয়াইট লিকার' প্রভৃতি। সমকালীন সময়েই বীরেন দত্ত 'গ্রামের মেয়ে' (১৯৭৮) উপন্যাসের মধ্য দিয়ে এক নজির সৃষ্টি করলেন। ফলত বলা যায় বিশ শতকের আশির দশক থেকেই উপন্যাসের সলতে পাকানো শুরু হয়। তখন কার্তিক লাহিড়ী, বিমল সিংহ, সুধাংশু বিকাশ সাহা, দীপক দেব প্রমুখের হাতে ত্রিপুরার উপন্যাস সমৃদ্ধ হতে দেখা যায়।

ত্রিপুরার রাজদরবারে এবং রাজ অন্তঃপুরে গল্প, উপন্যাস, গীতিকবিতা, আধুনিক সঙ্গীত এবং চিত্রকলার চর্চা খুব একটা প্রাধান্য না পেলেও বিশ শতকের গোড়ার দিকে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছিলো। এই রাজকীয় অন্দর ও শাসনের নানা চিত্রও বেশ কিছু উপন্যাসে নানা অনুষঙ্গে ধরা পরেছে। যেমন-প্রদীপ আচার্য্যের 'ত্রিপুরেশ্বরী ও ধন্যমাণিক্য', 'অমর মাণিক্য' প্রভৃতি।

"ঔপন্যাসিকের বিষয়জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে তার সময় জ্ঞান, সমাজ জ্ঞান, ইতিহাস জ্ঞান এবং ব্যক্তি মানসের জ্ঞান এই সমস্তের সারাৎসার। উপন্যাসেই একমাত্র মানুষের সহস্র সম্পর্কের সূত্রগুলিকে উন্মোচিত করে দেখানো সম্ভব।"[৪]

বিষয় নির্বাচন ও নিজস্বতার বয়ানে কথাসাহিত্যিক বিমল সিংহ তাঁর 'লংতরাই', 'তিতাস থেকে ত্রিপুরা', 'তখা পাড়ার ইতিকথা', 'করাচি থেকে লংতরাই' উপন্যাসগুলোতে এক শ্যামলী-শান্ত প্রকৃতির আবেষ্টনে বনাঞ্চল ঘেরা ত্রিপুরার নিজস্ব চিত্র-ই পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। সুধন্য দেববর্মার 'হাচুক খুরিঅ'-র অনুবাদ 'পাহাড়ের কোলে' বা ভীষ্মদেব ভট্টাচার্যের 'অগরুগন্ধা' উপন্যাস প্রকাশের সাথে সাথেই ত্রিপুরায় সার্থক উপন্যাসের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল।

ভৌগোলিক অবস্থান, উদ্বাস্তু সমস্যা, বেশ কিছু জনগোষ্ঠীর একত্রে বসবাস ও বিচিত্র জীবনশৈলী, লোককথার সম্ভার- প্রভৃতি বিষয়কে সমন্বিত করেই এখানকার কথাসাহিত্য তার নিজস্বতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। আর তখনই এক ঝাঁক ঔপন্যাসিকের হাতে ত্রিপুরার উপন্যাস বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। লেখক সুবিমল রায় তাঁর একের পর এক উপন্যাসে বুনতে লাগলেন আত্মসুর। 'আলোকশিখা', 'ছিন্নমূল', 'যেতে যেতে একলা পথে' প্রভৃতি তাঁর সফল উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম। খোয়াই থেকে মার্কসবাদী ভাবাদর্শে বিশ্বাসী সংগঠক ও সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব প্রদীপ সরকার' 'তবুও মানুষ', 'অন্যপুরুষ', ও 'জন জীবন যুদ্ধ' লিখে এক ভিন্নমাত্রিক আবহের সঞ্চার করলেন।

প্রায় সমকালেই মাধুরী লোধ কথাসাহিত্যে তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জানান দিলেন গল্প ও উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে। তাঁর 'মেঘলায় চাঁদ', 'মুহুরী চরের মানদা', 'শান্তবালা হাসে', 'অভিমন্যুর তূণ', 'ঝিঁঝিঁ গায় পল্লীগীতি' প্রভৃতি উপন্যাস লক্ষণীয়। সেই সময়েই সুনন্দা ভট্টাচার্য (বাহাদুর শাহের ফরমান, সুবল পুরের রূপকথা, ঝাপসা বিহান, অববাহিকা), কল্যাণী ভট্টাচার্য, টগর ভট্টাচার্য, মঞ্জুরাণী বিশ্বাসসহ কয়েকজন মহিলা ঔপন্যাসিক ত্রিপুরার বাংলা উপন্যাসে এক নতুন চেতনার সফল কেতন উড়িয়ে দিলেন।

সাধারণ ঘরের মেয়ে জয়া গোয়ালা নিজ দক্ষতার বলে হয়ে উঠেন এক অসামান্য লেখিকা। উপন্যাসে তাঁর পারদর্শীতা গগনচুম্বী। 'এই সীমান্তে', 'অন্য মানুষ ভিন্ন রঙ', 'তবুও মাদল বাজে', 'মুর্গা ঝুটির লাল ধুল', 'দেয়াল তাঁর বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতার ফসল।'

কথাসাহিত্যিক শ্যামল ভট্টাচার্য, শঙ্খশুভ্র দেববর্মণ ও শ্যামল বৈদ্য -এর উপন্যাস ত্রিপুরার সাহিত্যাকাশে সমান্তরাল গতিতেই বহমান। এই তিনজন লেখক একই সঙ্গে ত্রিপুরার বাংলা উপন্যাসকে এক আন্তর্জাতিক পরিচিতি দান করেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না -এটা সচেতন পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। শ্যামল ভট্টাচার্যের 'বুখারী', 'লোদ্রভার কাছাকাছি', 'খুবানীর ফলন', 'মহাসত্যের বিপরীত' ত্রিপুরার উপন্যাস হয়েও বাহ্যিক আবহ সঞ্চারের মধ্য দিয়ে লেখক পাশ্চাত্যের কথাও বলতে চেয়েছেন। ঠিক তেমনি কথাকার ও কবি শঙ্খশুভ্র দেববর্মণের উপন্যাস সমাজের ব্রাত্য-নিপীড়িত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জ্বলজ্যান্ত পটচিত্র হয়ে উঠেছে। তাঁর 'রুদী জলার সারিগান', 'জতু গৃহের পাখি', 'ত্যুই', মেঘবতী', 'মিস প্রদুনোভা ত্রিপুরা' সাধারণ জনজীবনের অতলে গভীর সত্যের অনুসন্ধানকেই উদ্ভাসিত করে। ঔপন্যাসিক শ্যামল বৈদ্যের হাতে উপন্যাস হয়ে উঠেছে এক গবেষণালব্ধ ফসল। 'বুনো গাঙের চর', 'উজান ভাটি', 'জন্মবদল', 'চাকমা দুহিতা' প্রভৃতি পাঠককে বিষয় ও বাস্তবতার অনুসঙ্গে এক গভীরতায় নিক্ষিপ্ত করে।

অনেক লেখক আত্মপরিচয়ের সন্ধান যেমন করেছেন তেমনি অনেকেই আবার ফলিত সূর্যের প্রতি আহ্লাদও দেখিয়েছেন। ত্রিপুরার কথাকে পরবর্তীতে সোচ্চারে যে দুটি উপন্যাস ঘোষণা করেছে তা হল দুলাল ঘোষের 'অগ্নিসূত্র' এবং অনুপ ভট্টাচার্যের 'প্রিয়ভূমি'। ত্রিপুরায় জীবনীমূলক উপন্যাস রচনায় পথ প্রদর্শক ব্যক্তিত্ব হলেন কথাকার অরুণোদয় সাহা। তাঁর 'নিদ নাহি আঁখিপাতে' ও 'কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব' সফল জীবনী উপন্যাস।

একটি-দুটি করে রচনা হতে হতে আজ ত্রিপুরার বাংলা উপন্যাস স্ব-গৌরবে মহিয়ান। সীমিত পরিসরের এই আলোচনায় হয়তো সবার কথা বলা সম্ভব নয়। তবুও যাঁদের কথা না বললে এই আলোচনা পূর্ণতা পাবে না এখন তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করছি। অধর চন্দ্র দাস (কমলাসাগর), হরিভূষণ পাল (অচিন বৃক্ষ, যারে যায় না ধরা), হরিহর সাহা (সেতু বন্ধন, নিঃসঙ্গ), যোতিন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য (বিভাবরী, মহাজীবন), বিষ্ণু রমণ দও (স্বয়ম্বরা), শুভাশিস তলাপাত্র (পাতাম কাঠের নৌকা), সুজয় রায় (পথ বদল), অশোক দেব (সদাপুরাণ), দীপক ভট্টাচার্য (কলসিমুখের উপকথা), মীনাক্ষী সেন (জেলের ভিতর জেল), সমরজিৎ সিংহ (বিপন্ন, আলান), ননী কর (জীবন যখন), নন্দকুমার দেববর্মা (অতলান্তিকা, ঠিকানা কিরাত ভূমি), সত্যজিৎ দত্ত (পোড়া পতাকা লাল পাণ্ডুলিপি) জহর দেবনাথ (সাম্যবাদী, গণ্ডাছড়ায় গণ্ডগোল), পল্লব ভট্টাচার্য (কমলিনী উপাখ্যান), দিব্যেন্দু নাথ (আইলাইনার) প্রমুখ ঔপন্যাসিকের চেষ্টায় ত্রিপুরার

ক্ষুদ্র অঞ্চলে বাংলা উপন্যাস তার প্রাণোচ্ছল গতিতে সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যের বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

কথাকারেরা এখন অনেক বেশি শানিত, চিন্তায় মূলস্রোতে সামিল। উপন্যাস রচনার ফলে জীবনের যত জটিলতা, বাস্তবের বহু বর্ণময়তার সাথে কথাকারেরা প্রতিনিয়ত সম্পৃক্ত হচ্ছেন। মূল স্রোতের সঙ্গে ত্রিপুরার গল্প-উপন্যাস এখন একই ধারায় এগিয়ে চলেছে। একেবারে সাম্প্রতিক সময়েও ত্রিপুরার ঔপন্যাসিকেরা অনেকেই উপন্যাসের নানা দিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। এটা অবশ্যই সমৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে। গত কয়েকবছরে যাঁরা উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে নিজেদের তুলে ধরেছেন; যেমন-সুতপা দাস (সোনার দুয়ারী ঘর রূপার দুয়ারী ঘর, নিশি আন্ধারী), মৌমিতা চক্রবর্তী (এবং রসেম), সান্তনু চক্রবর্তী (জিরো বাই জিরো একটা মানুষ), গোপাল চন্দ্র চৌধুরী (স্বপ্ন বিভোর দিন গুলো), মানসী চক্রবর্তী (ব্যবধান), লিটন আচার্য্য (সেই সব দিনরাত্রি), দীলিপ দেবনাথ (মেঘনা থেকে মুহুরী), অরিন্দম নাথ, অলক দেব প্রমুখের হাতে এই সময়ে ত্রিপুরার উপন্যাস নতুন মাত্রা পেয়েছে।

একই বঙ্গ ভূখণ্ড-তা বিচ্ছিন্ন নয়। বহু বিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে পৃথক বলে ভাবার কারণ নেই। তবে আলোচনার প্রয়োজনে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গটি স্মরণ রাখতেই হবে। সমস্ত বাঁধা-বিঘ্নকে উপেক্ষা করে উপন্যাসের সব শাখাতেই ত্রিপুরার উপন্যাসের বলিষ্ঠ পদযাত্রা ঘোষিত হয়েছে। সামাজিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, রাজনৈতিক, রহস্য বা থ্রিলারধর্মী, আঞ্চলিক সব শাখাই ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ। তাই বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অপরাজিতা রায় তাঁর 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে লিখেছেন,–

"মানুষের জীবনের এক নির্দিষ্ট অধ্যায়কে ধরার চেষ্টা করে উপন্যাস, যে অধ্যায়ের মধ্যে প্রকাশিত হয় স্থান কালগত একটি সুসংহত আকৃতি। উপন্যাস তাই অনেক সময়ই ইতিহাসের এক বিশিষ্ট উপাদান হয়ে ওঠে। সেদিক দিয়ে ত্রিপুরার ঔপন্যাসিকরা সার্থকতার পথেই হাঁটছেন। বিশেষ যুগ-লক্ষণকে তাঁরা আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁদের কাছে তাই ত্রিপুরার পাঠক আলোচকদের প্রাপ্তির আশা ক্রমশ বাড়ছে।"[৫]

ত্রিপুরার উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি আশাব্যঞ্জক। এখানকার লেখকরা মেধা ও মননে অনেকটা অগ্রসর। উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্বাচনে এঁরা আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান। অনেকেরই দৃষ্টি স্বচ্ছ ও লেখনী শানিত। উপন্যাসের পটভূমির উত্তরোত্তর প্রসার ঘটবে এটা প্রজন্মের প্রতি প্রত্যাশা। সমস্যাদীর্ণ মানুষের কল্যাণের পথনির্দেশ করবে উপন্যাস। তীক্ষ্ণ সমাজচেতনা ও গভীর জীবনবোধে একদিন রচিত হবে কালজয়ী উপন্যাস।

উপসংহার

'খাঁচার পাখি' দিয়ে বীজ বুনন হলেও সফল প্রতিষ্ঠা বা সার্থক উপন্যাস পেতে এখানকার কথাকারেরা বহু চড়াই উতরাই পেরিয়ে আপন মনোবল ও স্বচ্ছ দৃষ্টিকে পাথেয় করে পাড়ি দিয়েছেন দশকের পর দশক। সমৃদ্ধির জন্য সময়ের দাবী মানতে হয়। সমাজ-সমস্যা ও সময়কে শিল্প-নন্দনে প্রতিষ্ঠা করে অনেকেই সার্থক উপন্যাসের রূপকার হয়েছেন। সমগ্র বঙ্গভাষী পাঠকের কাছে ত্রিপুরার সাহিত্য একটা সময় অবিদিত থাকলেও একুশ শতকে দাঁড়িয়ে অনেকেই সচেতন। আপনপাঠের ভূমিকে প্রসারিত করে অনেকেই দিন দিন উত্তর-পূর্বসহ ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করছেন।

তাই এই কথা পরিশেষে বলতেই হয় যে ইতিহাসের বিস্তৃত সময় জুড়ে বিভিন্ন লেখকের হাতে ত্রিপুরার উপন্যাস বহু বর্ণিলতায় প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত হয়ে নিজ অস্তিত্বকেই বারংবার সংস্থাপিত করেছে যা

কালান্তরে অখণ্ড বাংলা সাহিত্যে এক উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে উঠবে।

তথ্যসূত্র

১. ড. নির্মল দাশ ও রমাপ্রসাদ দত্ত সম্পাদিত - *শতাব্দীর ত্রিপুরা*, পৃ. ৩০৩
২. কৈলাসচন্দ্র সিংহ- রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা অংশ থেকে
৩. শেখর দাস- *গল্প নিয়ে ত্রিপুরা ও বরাক উপত্যকা*, পৃ. ০৯
৪. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়- *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, পৃ. ২৯
৫. অপরাজিতা রায় - *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, পৃ. ১৮৮

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

১. ড.শিশির কুমার সিংহ-ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস-অক্ষর পাবলিকেশানস্, জানুয়ারি ২০১৮

২. ড. অজিত কুমার সিংহ ও ড. রীতা রাণী দে সম্পাদিত-উওর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা উপন্যাস পাঠকের দৃষ্টিতে-ক্রান্তিকাল প্রকাশন, মে ২০১৮

৩. প্রদীপ আচার্য্য- ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ- শ্রীহরি প্রকাশন, আগস্ট ২০১৩

সহায়ক গ্রন্থ

১. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়-বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, সপ্তম সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৬

২. কৈলাশ চন্দ্র সিংহ-রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস, অক্ষর পাবলিকেশানস্, চতুর্থ সংস্করণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পুনর্মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৭

৩. ড. নির্মল দাশ ও রমাপ্রসাদ দত্ত সম্পাদিত-শতাব্দীর ত্রিপুরা, অক্ষর পাবলিকেশানস্, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬

৪. শেখর দাস-গল্প নিয়ে ত্রিপুরা ও বরাক উপত্যকা, অক্ষর পাবলিকেশানস্, জানুয়ারি ২০১৪

৫. অপরাজিতা রায়-নির্বাচিত প্রবন্ধ, সৈকত প্রকাশন, ডিসেম্বর ২০১৬

৬. দুর্গাচন্দ্র সান্যাল-বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, মডেল পাবলিশিং হাউস, বৈশাখ ১৪১০

৭. ড. নির্মল দাশ- পটভূমি ত্রিপুরা দর্পণে দ্বাদশ উপন্যাস, সৈকত প্রকাশন, মার্চ ২০১৮

৮. দেবেশ রায়-উপন্যাস নিয়ে, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৬

৯. সাধন দাস-ত্রিপুরার আখ্যানে লংতরাই, নব চন্দনা প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০১২

১০. ড. শিশির কুমার সিংহ ও ড. সুনৃতা বসু সিংহ সম্পাদিত-ত্রিপুরার বাংলা ও ককবরক উপন্যাসে আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি, নবচন্দনা প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০১৪

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-2, December 2020
pp. 24-41

বরেন্দ্র অঞ্চলের লোকসঙ্গীত : আলকাপ গান

প্রফেসর ড. মাযহারুল ইসলাম তরু

প্রফেসর ড. মাযহারুল ইসলাম তরু
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বাংলাদেশ
e-mail:drtoru.toru@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রচলিত এক শ্রেণির লোকসংগীতের নাম 'আলকাপ'। তবে শুধু বরেন্দ্র অঞ্চলেই এর প্রচলন-এলাকা সীমিত নয়। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ-মুর্শিদাবাদ এবং রাঢ় বাংলার বীরভূমেও 'আলকাপ' প্রচলিত। মালদহ ও মুর্শিদাবাদে আলকাপ নামে এই লোকসংগীত পরিচিত হলেও রাঢ়ে তা 'ছিচর' বা 'ছ্যাচড়া' নামে পরিচিত। গ্রাম্যগাঁথা, উপকাহিনী বা সামাজিক বিষয়বস্তু নিয়ে আলকাপ রচিত হয়। একসময় ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আলকাপ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বরেন্দ্র অঞ্চলের মোনাকষা গ্রামের জনৈক বনমালী শীল ওরফে বোনাকানা বর্তমান আঙ্গিকের আলকাপ গান প্রথম রচনা করেন। বর্তমানে বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলে আলকাপের যে রীতি প্রচলিত রয়েছে তা ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের বিকশিত অবস্থারই অনুরূপ। সেই সময় যাঁরা এখানে আলকাপ করতেন তাঁদের শিষ্য–প্রশিষ্যদের এখন আলকাপ করতে দেখা যায়। আলকাপ অসাম্প্রদায়িক চেতনাপ্রসূত লোকসঙ্গীত। আলোচ্য প্রবন্ধে আলকাপ গানের উৎপত্তি ও বিকাশ এবং এই শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিল্পীদের পরিচিতি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

মূলশব্দ

আলকাপ, সরকার, বরেন্দ্রভূমি, অসাম্প্রদায়িকতা, ছোকরা, গম্ভীরা, ঝুমুর, আখড়াই

গবেষণার উদ্দেশ্য

বিলুপ্তপ্রায় লোকসঙ্গীত আলকাপ গানের একটি চিত্র তুলে ধরা এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। বিষয়গুলো হলো– আলকাপ গানের উৎপত্তি ও বিকাশ সংক্রান্ত ইতিহাস উপস্থাপন, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও সামাজিক গুরুত্ব এবং এই শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে সম্পৃক্ত সাধকশিল্পীদের পরিচয় তুলে ধরা।

সাহিত্যিক প্রকাশনা

লোকসঙ্গীত আলকাপ নিয়ে খুব বেশি আলোচনা বা গবেষণা চোখে পড়ে না। অনুসন্ধানে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গের ড. ফণী পাল, ড. প্রদ্যোত ঘোষ, পুলকেন্দু সিংহ, কৌশিক বড়াল এবং বাংলাদেশের মহবুব ইলিয়াস আলকাপ নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ

তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'মায়া মৃদঙ্গ' তে আলকাপ গানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রবন্ধটি যুগপৎ সাহিত্য, ইতিহাস, সঙ্গীত পর্যালোচনার মাধ্যমে বর্ণনাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করে রচিত হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য শিল্পীদের সাক্ষাৎকার, শিল্পীদের কাছের মানুষের স্মৃতিকথা ও ক্ষেত্রসমীক্ষার সাহায্য নেয়া হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন গ্রন্থ, গবেষণা পত্রিকা ও স্থানীয় পত্র-পত্রিকা থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রচলিত এক শ্রেণির লোকসংগীতের নাম 'আলকাপ'। তবে শুধু বরেন্দ্র অঞ্চলেই এর প্রচলন-এলাকা সীমিত নয়। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ-মুর্শিদাবাদ এবং রাঢ় বাংলার বীরভূমেও 'আলকাপ' প্রচলিত। মালদহ ও মুর্শিদাবাদে আলকাপ নামে এই লোকসংগীত পরিচিত হলেও রাঢ়ে তা 'ছিচর' বা 'ছ্যাচড়া' নামে পরিচিত।[১] গ্রাম্য গাঁথা, উপকাহিনী বা সামাজিক বিষয়বস্তু নিয়ে আলকাপ রচিত হয়।[২] গম্ভীরা, যাত্রা বা পালাগানের মতো আলকাপও পল্লি-সংস্কৃতির বাহক। পল্লির পথে ঘাটে প্রান্তরে, নদী-নালায়, রাখাল বালক-কৃষক, মাঝি-মাল্লারা এ গানের সংরক্ষক। কেননা এ গানের রচয়িতারা কেউ অশিক্ষিত, কেউবা স্বল্পশিক্ষিত। আসরে মুখে মুখে গান গেয়ে দেয়ার পর তার আর কোনো খোঁজ থাকে না। সুতরাং পল্লির রাখাল বালক, কৃষক, মজুর, মুটে ও নৌকার মাঝি-মাল্লাই এ গান শোনার পর ইচ্ছে মতো মনের আনন্দে গেয়ে থাকে। তাই অন্যান্য পল্লি গানের মতো আলকাপও লোকসংগীতের অঙ্গ।

'আলকাপ' শব্দের অর্থ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কারো কারো মতে 'আলকাপ' শব্দটি আরবি শব্দজাত। শব্দটির অর্থ মস্করা, ঢং বা কৌতুক।[৩] আবার কারো মতে, 'আল' শব্দটি দেশজ, 'কাপ'ও তাই। পশ্চিমবঙ্গের আলকাপ শিল্পী ওস্তাদ মনকির হোসেনের মতে, 'আল' মানে 'রং' (রঙ্গ) আর 'কাপ' মানে 'সঙ'। আলকাপ মানে যে 'কাপ' অর্থাৎ 'সঙ' এ 'আল' (রঙ্গ) কাটা হয়। 'কাটা' শব্দটি 'ছড়াকাটা' 'টিপ্পনিকাটা' অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৪] পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ ফোকলোরবিদ পুলকেন্দু সিংহের মতে, 'আল' কথাটির অর্থ হলো 'হুল' বা বিদ্ধ করার প্রবৃত্তি (কথার আল)। আর 'কাপ' কথাটির অর্থ হলো ছলনা, ভান (কাপ করে পড়ে থাকা) ছদ্মবেশী, কপট, কৌতুককারী।[৫] অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলকাপ শিল্পী মহবুব ইলিয়াস বলেন, 'আলকাপ' শব্দের অর্থ 'আল'–কাঁচা রস এবং কাপ–গানের কৌশল।[৬] তার মতে, হাস্যরস ও সুরের কথা-কৌশল এবং নাটকীয়তার মিশ্রণে আদিরসাত্মক সঙ্গীত আলকাপ গাওয়া হয়ে থাকে, এজন্যই 'আলকাপ' অর্থ কাঁচারস (আদিরস) সমৃদ্ধ সংগীত বলা হয়ে থাকে। আলকাপের প্রতিশব্দ নির্ণয় প্রসঙ্গে আলকাপ গানের পটভূমিকায় রচিত প্রখ্যাত উপন্যাস 'মায়ামৃদঙ্গ' এর রচয়িতা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বলেন, 'আল' অর্থ হলো ব্যঙ্গের খোঁচা। 'কাপ' এর মজা পেতে হলে হুলটিও খেতে হবে। তাঁর মতে আলকাপের মূল অর্থ হলো 'অসংযত সঙ'।[৭]

যাই হোক-আলকাপ মানে 'অসংযত সঙ' পরে লোকরঙ্গ। মোটকথা যে 'কাপ' এ সঙ সীমাহীন রঙ (রঙ্গরস) করে থাকে। অর্থাৎ যে 'কাপ' এ 'রঙ' করা হয়। 'আল' কে 'রঙ' (রঙ্গ) ধরলে মানে দাঁড়ায়; যে কাপে আলকাটা (অসংযত রঙ্গ তামাসা) হয়। যেমন অশালীন ছড়াকাটা, টিপ্পনি কাটা হয়। এভাবে বলা

যেতে পারে 'আলকাটা কাপ'। 'আলকাপ' শব্দটি 'আলকাটা কাপ' এরই সংক্ষিপ্ত বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

আলকাপ মূলত কৃষিজীবী সমাজের উর্বরতামূলক যাদুবিশ্বাসজাত গাজনোৎসবের 'সঙ' জাতীয় অনুষ্ঠান। এ সংগীত বিশেষ সম্প্রদায়ের উৎসবানুষ্ঠানের সংগীত নয়। এই 'সঙ' জাতীয় সংগীতে কৃষিজীবী হিন্দু-মুসলমান, চাঁই-পলিয়া নির্বিশেষে অংশগ্রহণ করে।[৮] কিন্তু ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য আলকাপকে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের উৎসব সঙ্গীত বলতে রাজী নন। তাঁর মতে, এটি কেবলমাত্র মুসলমান সমাজে প্রচলিত সঙ্গীত।[৯] আবার হিন্দু সম্প্রদায়ের দেব-দেবীকে নিয়ে রচিত এবং হিন্দুদের পূজা পার্বণ এবং অন্যান্য উৎসব-অনুষ্ঠানে গীত হয় বলে একে অনেকে হিন্দুদের সম্পদ বলে মনে করেন।[১০] উভয় ধারণা পুরোপুরি মেনে নেয়া যায় না। পরবর্তীতে আমরা এ ব্যাপারে আলোচনার প্রয়াস পাবো।

আলকাপের উদ্ভব

আলকাপের উদ্ভব সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর লক্ষ করা যায়। প্রখ্যাত ফোকলোরবিদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে আলকাপকে শিব বিষয়ক গম্ভীরা গানেরই 'ইসলামী সংস্করণ' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, গম্ভীরা গানই কালক্রমে মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে আলকাপ গানে রূপান্তরিত হয়েছে।[১১] বাংলাদেশের ফোকলোরবিদ ড. আনোয়ারুল করীম ড. ভট্টাচার্যের এই মতকে সমর্থন করে বলেছেন, আলকাপ গান গম্ভীরা গানের ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ।[১২] আবার অনেকের মতে, গম্ভীরা থেকে আলকাপের উৎপত্তি নয়, আলকাপ থেকেই গম্ভীরার উৎপত্তি।[১৩]

আলকাপের উৎস সম্পর্কে বলতে গিয়ে সোহরাব নামে জনৈক প্রবীণ আলকাপ শিল্পী বলেছেন–

চৈত্র মাসের পরবেতে
আলকাপ সৃষ্টি গম্ভীরাতে।[১৪]

এই উক্তির আলোকে ড. দিলীপ ঘোষ বলেছেন, গাজনোৎসব জাত (তা শিবেরই হোক আর ধর্মেরই হোক) 'সঙ' জাতীয় অনুষ্ঠান থেকে সৃষ্টি হলো 'কাপ' এর। আগে গম্ভীরা উৎসবে[১৫] কাপ হতো। পরবর্তীকালে 'গম্ভীরা উৎসব' থেকে আলকাপের পরোক্ষ প্রেরণায় 'গম্ভীরা' নামক লোকনাট্য রূপ নিয়েছে। 'আলকাপ' গম্ভীরা বিযুক্ত হয়ে ব্যঙ্গধর্মী স্বতন্ত্র লোকসংগীতের শিল্পাঙ্গিক লাভ করেছে। 'গম্ভীরা' পরিণত হলো রাজনৈতিক বিষয়াশ্রিত ব্যঙ্গাত্মক প্রহসনধর্মী লোকনাট্যে (Political Folk Satire) আর আলকাপ হলো মূলত পারিবারিক বা গার্হস্থ্য বিষয়াশ্রিত রঙ্গমূলক প্রহসনধর্মী নাট্যগুণসম্পন্ন লোকসংগীতে (domestic folk song)।[১৬] ড. প্রদ্যোত ঘোষ বলেছেন, ৪০-৫০ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে আলকাপ ও গম্ভীরার সুর একইরকম ছিল। খ্যাতনামা শিল্পী অমরনাথ মণ্ডলই গম্ভীরাকে বিলম্বিত লয়ে গেয়ে আলকাপ থেকে পৃথক করেন। গম্ভীরায় যেমন আলকাপের সুর সংযোজনে লোহারাম খলিফা স্মরণীয়, তেমনি অমরনাথ গম্ভীরা ও আলকাপের পৃথকীকরণে শ্রদ্ধার্হ।[১৭]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে গম্ভীরা গান থেকে আলকাপের উৎপত্তি হয়নি। গম্ভীরা উৎসবের অনুসঙ্গ হিসেবে আলকাপের উদ্ভব এবং আলকাপ থেকেই পরবর্তীতে গম্ভীরা গানের সৃষ্টি।

আলকাপের উৎপত্তি গম্ভীরা উৎসব তথা ধর্মীয় অনুষঙ্গে হলেও সময়ের পরিবর্তনে তার বিষয় ও আঙ্গিকের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অপরাপর লোকসংগীতের সংস্পর্শ পেয়ে আলকাপ সমৃদ্ধ হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতামত আলোচনা করা যেতে পারে।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে আলকাপের সঙ্গে রাঢ় অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ঝুমুর গানের সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৮] ড. সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব থেকে ভগীরথী নদীর তীরে নদীয়া শান্তিপুর অঞ্চলে খেউর গান নামে এক ধরনের আদিরসাত্মক প্রশ্নোত্তরমূলক গান প্রচলিত ছিল। ক্রমে তা রাজধানী কলকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ঊনিশ শতকের প্রারম্ভে এই খেউর গান কিছুটা ওস্তাদি ঢং-এ মণ্ডিত ও মার্জিত হয়ে আখড়াই গানে পরিণতি লাভ করে।[১৯] আলকাপের অংশসমূহের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় আখড়াই গানের সঙ্গে এর বেশ কিছু অংশের সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন– আলকাপ গানের বন্দনার সঙ্গে আখড়াই গানের ভবানী বিষয়ক বন্দনা, আলকাপের ফার্সগানের সঙ্গে আখড়াই গানের প্রণয়গীতির যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। আখড়াই গান ভেঙে নতুন পদ্ধতির যে হাফ-আখড়াই গানের সৃষ্টি হয় তা আলকাপের গানের আরো নিকটবর্তী।

ড. সুকুমার সেনের বর্ণনানুযায়ী হাফ-আখড়াই গানে "একদল সখীসংবাদ গাহিয়া গেলে অপর দল আসিয়া প্রত্যুত্তরে সখী সংবাদ গাহিত। প্রতিপক্ষের গানের উত্তরের সঙ্গে যদি 'চাপান' অর্থাৎ নতুন Challange থাকিত তাহা হইলে প্রথম দলকে আবার আসিয়া সখীসংবাদ গাহিতে হইত।"[২০] হাফ-আখড়াই-এর এই রীতির সঙ্গে আলকাপের 'আশায়' অংশের পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে। আলকাপের অধিকাংশ সময় দু'টি দলের মধ্যে 'আশায়' বা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক গান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আশায়গুলো সাধারণত রাধা-কৃষ্ণ, শিব-দুর্গা, লক্ষ্মী-সরস্বতী, নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রাম-শহর ইত্যাদি বিষয়ক হয়ে থাকে। অংশগ্রহণকারী দুটি দলের একটি রাধার অপরটি কৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করে বিজয়ী হওয়ার মানসে গান ও অভিনয়ের মাধ্যমে শওয়াল-জবাব দিয়ে থাকে। দু'দলের মধ্যে জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে– রাত শেষ হয়ে অনেক সময় সকাল হয়ে যায়।[২১] আমরা খেউর ও হাফ-আখড়াই গানের সঙ্গে এ ধরনের বেশ সাদৃশ্য দেখতে পাই। এছাড়াও ঝুমুর গানের সঙ্গেও আলকাপ গানের সাদৃশ্য রয়েছে।

খেউর ও হাফ-আখড়াই গানের মতো ঝুমুর গানেও উভয় দলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক প্রশ্নোত্তরের বিধান রয়েছে। ঝুমুর ও খেউর গানের প্রতিযোগিতামূলক প্রশ্নোত্তরের সঙ্গে আলকাপের সাদৃশ্য দেখে আমরা ধারণা করতে পারি যে, পারস্পরিকভাবে এই গানগুলো একে অপরকে প্রভাবিত করেছে। এ প্রসঙ্গে কবিগান ও পাঁচালীর কথাও উল্লেখ করতে পারি। এককথায় বলা যায় 'আলকাপ' অন্য কোনো সংগীত ও লোকনাট্যের স্পর্শ এড়িয়ে চলেনি। তাই আলকাপে বিভিন্ন মেজাজের উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রচলিত আলকাপ গানের[২২] কিছুটা ভিন্নরূপও বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়। যেমন– 'ছিচর' বা 'ছ্যাচরা' (<সংস্কৃত ছিত্বর, অর্থ প্রবঞ্চক), লেটো (<নাট), ঝুমুর, বিদ্যাসুন্দরের গান, পালাটিয়া (মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে প্রচলিত 'পঞ্চরস' এর মতো পালা জাতীয় গান) ইত্যাদি।

আধুনিক যুগের অব্যবহিত পূর্বে খেউর, যাত্রা, কবিগান, পাঁচালী, তরজা, ঝুমুর ইত্যাদি যেসব গান প্রচলিত ছিল এদের মধ্যে যে বিষয়ে সর্বাধিক সাদৃশ্য লক্ষ করা যা তা হচ্ছে একদলের প্রতি অন্যদলের একটি প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা। আঠারো শতকের শেষ এবং ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে এই দ্বন্দ্বমূলক গীতিধারা তৎকালীন বাংলাদেশের জনগণকে বিনোদিত করে।[২৩] আলকাপ গানকে আমরা এই শ্রেণির সঙ্গীত পর্যায়ে ফেলতে পারি।

গম্ভীরা উৎসবের অনুষঙ্গ হিসেবে দীর্ঘদিন থাকার পর ঝুমুর, খেউর, আখড়াই, হাফ আখড়াই, পাঁচালী প্রভৃতি সঙ্গীতের সংস্পর্শ ধন্য হয়ে আলকাপ কখন কিভাবে স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ একটি লোকসংগীতে পরিণত হলো এ সম্পর্কে পণ্ডিতেরা স্পষ্টভাবে কিছু না বললেও প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে একথা বলা যেতে পারে যে, ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের দিকে এ গান পূর্ণতা লাভ করে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'নবাবগঞ্জ সাময়িকী' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মহসীন আহমেদ উল্লেখ করেন যে, ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে ভবতারণ নামের জনৈক ব্যক্তি বর্তমান আঙ্গিকের আলকাপ গানের প্রবর্তন করেন। ভবতরণের বাড়ি অবিভক্ত বাংলার মালদহ জেলার মোনাকষা গ্রামে।[২৪] এই মোনাকষা বর্তমানে বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলের চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত একটি জনপদ। এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায় বাংলা ১৩৭০ সনে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমা গ্রন্থমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থের একটি প্রবন্ধে। এতে বলা হয়েছে 'প্রায় একশ' বছর আগে মালদহের মোনাকষার ভবতারণ সরকার আলকাপের সূচনা করেন। তার শিষ্য ছিলেন বোনাকানা। এই বোনাকানার কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন জঙ্গীপুরের হাসুপুর গ্রামের বসন্ত সরকার। মুর্শিদাবাদের প্রখ্যাত আলকাপওয়ালা ঝাঁকসু সরকার ছিলেন বসন্ত সরকারের শিষ্য।[২৫] পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত ফোকলোর গবেষক পুলকেন্দু সিংহও এই মত সমর্থন করেন।[২৬] ব্যাপক তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে উপরিউক্ত তথ্যের সত্যতা পাওয়া গেলেও বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে, ভবতরণ সরকার আলকাপের গোড়াপত্তন করলেও তাঁর গান বন্দনা, খ্যামটা, ফার্স ও পালাসমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ ছিল না। তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য মোনাকষার নাপিত বনমালী শীল ওরফে বোনাকানাই (তাঁর এক চক্ষু কানা ছিলো বলে তিনি এই নামে পরিচিত ছিলেন) বরেন্দ্র অঞ্চলে পূর্ণাঙ্গ আলকাপের প্রচলন করেন।[২৭] অন্যদিকে মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে আলকাপের প্রসার ঘটান বোনাকানার সুযোগ্য শিষ্য জঙ্গীপুর মহকুমার হাঁসুপুর গ্রামের প্রখ্যাত কবিয়াল বসন্ত সরকার ও তাঁর শিষ্য ধনঞ্জয় সরকার ওরফে ঝাঁকসু (জ. ১৮৯৭)।[২৮] আর এ কারণে অনেকেই বোনাকানাকে আলকাপ গানের প্রকৃত প্রবর্তক বলে মনে করে থাকেন।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে বোনাকানাকে আমরা বরেন্দ্র অঞ্চলে আলকাপ গানের প্রচলনকারী বলে মনে করে থাকি। কিন্তু বরেন্দ্র অঞ্চলের জনপ্রিয় আলকাপ শিল্পী, সরকার ও রচয়িতা মহবুব ইলিয়াস একথা মেনে নিতে রাজী নন। তিনি বলেন, বোনাকানা পেশায় ছিলেন নাপিত। বিভিন্ন স্থানে কাজে যাবার সময় তিনি সুন্দর চেহারার এক কিশোরকে মেয়েদের মতো পোষাক পরিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কাজের অবসরে তিনি ঢোল বাজাতেন আর সেই মেয়েরূপী কিশোর মেয়েদের মতো চিকন কণ্ঠে গান গাইতো আর নাচতো। একে পুরোপুরি আলকাপ না বলে 'ছোকরা নাচ' বলাই সঙ্গত। তাঁর মতে, বোনাকানা নয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার পৌর এলাকার রাজারামপুর গ্রামের মরহুম জামুরুদ্দিন বিশ্বাস (১৮৫৭-১৯৫২) সরকারই সর্বপ্রথম বন্দনা, ছড়া, ফার্স, খ্যামটা ও পালা সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ আলকাপের প্রচলন করেন।[২৯] তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায় জামুরুদ্দিন বিশ্বাস চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর ও তার আশেপাশে আলকাপের প্রচলন করলেও তাঁর অনেক পূর্বে বোনাকানা আলকাপের পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে আমরা বর্তমান আঙ্গিকের আলকাপ গানের প্রবর্তক হিসেবে বোনাকানাকে ধরে নিতে পারি।

আলকাপ গানের বিকাশ

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আলকাপ গানের চর্চা শুরু হলেও, বিশ শতকের গোড়ার দিকে গৌড়ীয় অঞ্চলে এ গানের একটি উল্লেখযোগ্য বিকাশ লক্ষ করা যায়।[৩০] সে সময়ের একজন প্রখ্যাত 'সরকার'[৩১] সুবল কানার একটি ছড়ায় সমকালীন অসংখ্য সরকারের নাম পাওয়া যায়। এতো অধিক সংখ্যক সরকারের তালিকা দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, আলকাপ গান তখন বরেন্দ্র অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এমনকি আলকাপ তখন একটি লাভজনক পেশা হয়ে উঠেছিল এ তথ্য সম্ভবত তাও প্রমাণ করে।[৩২] বরেন্দ্র অঞ্চলের আলকাপ সম্পর্কে সমকালীন শিক্ষিত সমাজ বেশ অবহিত ছিলেন বলে মনে হয়। সুবল কানার ছড়ায় মালদহ, মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর, নূরপুর, রাজমহল এবং বরেন্দ্র অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের সরকারদের নাম পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে ছড়াটি উদ্ধৃত করা হলো:

"প্রথমে মোনাকষার বোনাকানা
আলকাপ গান করেন রচনা।
তারপরেতে সুবেদার আলী ভাই
বাড়ি তাহার মালদহেতে হয়।
তারপরেতে ঝাঁকসু সরকার নামটি শুনি
তার জঙ্গীপুরে বাড়ি জানি।
আলকাপে সে বিখ্যাত রে ভাই॥
জাগিরুদ্দিন যাহার নাম
তার নূরপুরেতে হয় গো ধাম।
ঝাঁকসু-জগু এক সঙ্গেতে গায়।
তারপর মকবুল হোসেন নামটি শুনি
তার রাজমহলে বাড়ি জানি।
সেও কিন্তু মন্দ নয়রে ভাই॥
সুধীর চন্দ্র যাহার নাম
তার সাগর দীঘি হয় গো ধাম।
সিরাজ মাস্টার তাকে রেখেছিল ভাই।
মোজাম্মেল– নৈমুদ্দিন শুনি
তারা দু'জনাতে বন্ধু জানি
তাদের দলটিও মন্দ নয়রে ভাই॥
মনকির আলী নামটি শুনি
তার গোবিন্দপুর বাড়ি জানি
বরকত আলী তার পাশেতে রয়।
কার বা কতো করবো নাম
এবার শুনেন সুবল কানার গান
এই বলে ভাই
আমি দশের কাছে প্রণাম জানাই॥[৩৩]

উপরিউক্ত ছড়া থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, একসময় ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আলকাপ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং বরেন্দ্র অঞ্চলের মোনাকষা গ্রামের[৩৪] জনৈক বনমালী শীল ওরফে বোনাকানা বর্তমান আঙ্গিকের আলকাপ গান প্রথম রচনা করেন।

বর্তমানে বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলে আলকাপের যে রীতি প্রচলিত রয়েছে তা ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের বিকশিত অবস্থারই অনুরূপ। সেই সময় যাঁরা এখানে আলকাপ করতেন তাঁদের শিষ্য–প্রশিষ্যদের এখন আলকাপ করতে দেখা যায়।[৩৫] বর্তমানে প্রত্যেক দলে যন্ত্রী ও ছোকরা[৩৬] সহ শিল্পী সংখ্যা ২৫-৩০ জন।

স্বাধীনতা পূর্বকালে বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় আলকাপ গানের ব্যাপক চর্চা হতো বলে জানা যায়।[৩৭] অর্থনৈতিক সংকটের কারণে বর্তমানে তেমন আলকাপের আসর বসছে না বললেই চলে। জানা গেছে গত পাঁচ বছরে বরেন্দ্র জেলাগুলোর মধ্যে আলকাপের ভিত্তিভূমি চাঁপাইনবাবগঞ্জে ১৬টি, রাজশাহীতে ৪টি, নওগাঁয় ৩টি ও নাটোরে মাত্র ১টি আসর বসেছে।[৩৮] একাত্তরের স্বাধীনতার পূর্বের ও বর্তমান সময়ের দুটো সারণী উল্লেখ করে দেখা

যেতে পারে আলকাপ গানের চর্চা পূর্বাপেক্ষা কতহ্রাস পেয়েছে।

সারণী–১

বরেন্দ্র অঞ্চলে আলকাপ চর্চা : স্বাধীনতার পূর্বে[৩৯]

ক্রমিক নং	জেলার নাম (মহকুমাভিত্তিক দল)		দলের সংখা	শিল্পী সংখ্যা
১	রাজশাহী জেলা ঃ		১৩৯	৪,৯১২
	চাঁপাই নবাবগঞ্জ মহকুমা	৫২		
	নওগাঁ মহকুমা	৫১		
	নাটোর মহকুমা	১১		
	রাজশাহী সদর মহকুমা	২৫		
২	দিনাজপুর জেলা ঃ		০৮	২০৬
	ঠাকুরগাঁও মহকুমা	০৫		
	দিনাজপুর সদর মহকুমা	০৩		
			১৪৭	৫,০১৮

সারণী–২

বরেন্দ্র অঞ্চলে আলকাপ চর্চা : বর্তমানে[৪০]

ক্রমিক নং	জেলার নাম		দলের সংখা	শিল্পী সংখ্যা
১	বৃহত্তর রাজশাহী জেলা :		২৪	৩০২
	চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলা	১৩		
	নওগাঁ জেলা	০৫		
	নাটোর জেলা	০২		
	রাজশাহী জেলা	০৪		
২	বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা :		০২	৫২
	ঠাকুরগাঁও জেলা	০১		
	দিনাজপুর সদর জেলা	০১		
			২৬	৩৫৪

আলকাপ গানের অসাম্প্রদায়িকতা

আলকাপের বিস্তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে ড. প্রদ্যোত ঘোষ বলেছেন, এটি কেবলমাত্র মুসলমান সমাজে প্রচলিত।[৪১] ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যও একে মুসলিম সমাজে প্রচলিত লোকসংগীত বলে উল্লেখ করেছেন।[৪২] আবার হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা-পার্বণ ও অন্যান্য উৎসব-অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় বলে অনেকে একে হিন্দুদের সম্পদ বলে মনে করে থাকেন। উভয় ধারণাই পুরোপুরি সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না। ড. ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' (৩য় খণ্ড) গ্রন্থে (১৯৬৫) আলকাপকে শুধু মুসলিমদের লোকসংগীত বললেও পরবর্তীতে তিনি এ ব্যাপারে ভিন্ন কথা বলেছেন।[৪৩] এবারে আমরা কিছু আলকাপ গান উদ্ধৃত করে এর বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করবো।

আলকাপ পরিবেশনের দিকে দৃষ্টি দিলে সহজেই লক্ষ করা যাবে যে, আলকাপ গানে মুসলিম ঐতিহ্য প্রচারের তেমন কোনো সুযোগ নেই। অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের অবকাশ রয়েছে প্রচুর। উদাহরণস্বরূপ আলকাপের বন্দনা অংশের কথা বলা যেতে পারে। আলকাপের সূচনায় আসর বন্দনা পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ বন্দনার মূল উপজীব্য বিষয় হচ্ছে হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং তাঁদের অনুগ্রহ প্রার্থনা। এসব বন্দনা মূলত শিব, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতি দেব-দেবী কেন্দ্রিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি বন্দনা উদ্ধৃত করা হলো–

১) বন্দি বীণাপাণি, বিদ্যাদায়িনী
শ্বেত সরস্বতী সরোজবাসিনী
কণ্ঠে দে মা সুর লহরী
যন্ত্রে দে মা শব্দ মাধুরী
চিত্তে জ্বেলে দে জ্ঞানের প্রদীপ
বক্ষে শক্তি জ্ঞান দায়িনী
বন্দি ..... দায়িনী।
মন্দিরে তব আলোর বন্যা
বিশ্বমাতা স্বনামধন্যা
আমরা কয়জন করি নিবেদন
শ্রীচরণে রাখি মধুর বাণী।
বন্দি ..... দায়িনী।[৪৪]

২) এসো মা হৃদে বিন্দুবাসিনী

হও মা তুমি সাকার, আমার অহংকার,
মধুর ঝঙ্কার মৃদু সুহাসিনী
মম-হৃদি মন্দিরে তুমি দেখা দাও
অরূপ ছাড়িয়ে স্বরূপে দাঁড়াও।[৪৫]

৩) এসো গো সরস্বতী আসরে
তোমার যে না ভজে মা
কোদাল চাপাও তার ঘাড়ে।
শিখিয়ে দাও মা তোমার আরাধনা
তুমি যা মোরে শিখিয়ে দেবে
সেই হবে আমার সাধনা।[৪৬]

৪) সারদা ও মা ও সারদা বীণা যন্ত্র বাদিনী,
কণ্ঠে দে মা সুর লহরী, চৈতন্যে জ্ঞানের খনি
সংকট থেকে শকট উত্তরণে,
চিত্তপটে আঁকি ক্ষণে ক্ষণে
তোর বাণীর বন্দনা
সুধী সভাতলে, বিপন্ন তোর ছেলে
দু'হাত বাড়িয়ে নে মা তুলে কোলে
বিপুলা মা তোরই অর্চনা।
শোভিত শুভ্র শতদলে ওগো সরোজিনী
শাশ্বত পৃথিবীর সারস্বত ছবি বীণাপাণি॥[৪৭]

শুধু আসর বন্দনা অংশেই নয় বন্দনা ছড়াতেও আমরা হিন্দু দেব-দেবীর গুণকীর্তণ দেখতে পাই। বন্দনা ছড়ায় মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যের কাহিনী অবলম্বনে দেবী মনসা, চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচার করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এখানে মনসা দেবীকে নিয়ে রচিত একটি আলকাপ বন্দনা ছড়ার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে–

বন্দনা ছড়া ঃ মনসা মঙ্গল

ধুয়া ঃ শুনেন শ্রোতা মহাজন
মনসা দেবীর কথা করিব বর্ণন।
বরিন্দের আঞ্চলিক কথা
থাকবে কিছু গীতে গাঁথা
সেই গাঁথুনি করবো সমাপন
শুনেন শ্রোতা মহাজন।
চাঁদ নামে ছিল এক বণিক সওদাগর
ম্যালাদিন ভৈর ছিল স্বর্গের ভিতর
স্বর্গের মধ্যে নাকি সভারই সুখ হয়
সেই কথা কহে কতো জ্ঞানী গুণী ভাই।
কপালে তার সুখ সহিল না মনসার কারণে
চাঁদের উপর ক্ষেপ্যা গ্যালো একদিন অকারণে
অভিশাপ দিলো তাকে মর্তে জন্ম লিব্যার
চাঁদ কহে হামি পুজা করবো না তোমার।
মর্তে জরমিলো চাঁদ স্ত্রী হয় সনকা
গোপনে মনসা পূজা করে সনকা একা
চাঁদ করে শিব পূজা সে দেখিলো একদিন
সনকা মনসার পূজা করে সবদিন।
ক্ষেপ্যা গিয়্যা মঙ্গলঘট ভাঙে লাত মাইর‍্যা
মান খুয়া যায় হাঁর মনসা পূজা কইর‍্যা
চ্যাং মুড়ি কানি সেতো হামা বরাবর
হৈবে না অর পূজা এই বাড়ির ভেতর।[৪৯]

আসর বন্দনা ও ছড়া বন্দনাতেই শুধু নয় আলকাপের জয়[৫০], পালা[৫১], খ্যামটা[৫২] ও আশায়[৫৩] অংশেও হিন্দু দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের অবকাশ রয়েছে। বিশেষ করে 'আশায়'এর বিষয়বস্তু মূলত রাধা-কৃষ্ণ, রাম-সীতা ও শিব-দুর্গা কেন্দ্রিক হয়ে থাকে।[৫৪] তাই আলকাপকে শুধু মুসলমানদের সম্পদ বলে মেনে নেয়া যায় না।

আলকাপে যেমন হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ঐতিহ্য প্রচারের সুযোগ রয়েছে, তেমনি মুসলিম সমাজের কথাও রয়েছে। দেড়শ' বছর পূর্বে 'আলকাপ' গানের বর্তমান রূপ দেয়া হলেও মধ্যযুগের প্রভাব এখনও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো দেব-দেবীর বন্দনা দিয়ে শুরু করা-কাব্য হোক আর লোকসংগীত হোক। বর্তমানে কাব্যের ক্ষেত্রে সে প্রভাব তিরোহিত হলেও

লোকসংগীতের ক্ষেত্রে তা অনেকটাই থেকে গেছে। আলকাপ গান তার ব্যতিক্রম নয়।

আলকাপ গানে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় প্রভাব থাকলেও প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে এ গানের বিষয়বস্তুতে রাজনীতির প্রবেশ ঘটেছে। আলকাপে রাজনীতি প্রবেশ করায় তার সার্বজনীনতা ও আবেদন হয়েছে ব্যাপক। আলকাপের এই ধর্মের বন্ধন মুক্তির ইতিহাসে জামুরুদ্দিন বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এই উদার মুসলিম আলকাপ সরকার শুধুমাত্র শিব, দুর্গা, সরস্বতীর বন্দনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকেননি, যে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ জন-জীবনকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করে– তাকে প্রকাশ করেন।[৫৫]

মধ্যযুগের মরমী সাধক দাদু বলেছিলেন, "দুন্যুঁ হাথী হৈব রহে, মিলি রস পিয়ান জাই।" অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান দুই হাত, এই দুই হাত একত্র না হলে কেমন করে অমৃতের অঞ্জলি রচিত হবে? কেমন করে অমৃতের রস পান করা যাবে।[৫৬] শতাব্দীর পর শতাব্দী কালব্যাপী ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় পাশাপাশি বসবাস করেও তাদের চিত্ত থেকে সাম্প্রদায়িক হিংসা ও বিদ্বেষের কালিমা ঘুচাতে পারেনি, অন্তর থেকে বিদ্বেষের বিষ নাশ করে দাদুর মতো উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারেনি– হিন্দু-মুসলমান এক না হলে কেমন করে অমৃতের অঞ্জলি রচিত হবে। সৃষ্টিকর্তার রাজ্যে হিন্দুর দেবালয়ও নাই, মুসলমানের মসজিদও নাই, একমাত্র স্রষ্টাই সেখানে বিরাজমান, সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতার স্থান সেখানে নাই।[৫৭] ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার প্রয়াস আমরা আলকাপ গানের মধ্যে লক্ষ করে থাকি। এখানে একটি প্রাচীন আলকাপের কিছু অংশ উল্লেখ করে আলকাপ শিল্পীদের অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচয় তুলে ধরা যেতে পারে–

কারো ফন্দি খাটবে না
তিনার হুজুরে
হিন্দু-মুসলমান থাকো সুখেরে।"[৫৮]

এ ধরনের বহু গান খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রবীণ লোকসংগীত সংগ্রাহক মোহসীন আহমদ বলেছেন, আলকাপ বরেন্দ্র অঞ্চলের নিজস্ব লোকসংগীত। এতে মানুষের হৃদয়ের কথা থাকলেও মুসলমান সমাজ তথা আলেম সম্প্রদায় সব সময়ই এই গানকে কুনজরে দেখেছেন। তাই চিরকালই আলকাপ শিক্ষিত সমাজের কাছে অনাদৃত রয়ে গেছে।[৫৯] বিভাগ পূর্বকালে বৃহত্তর রাজশাহী জেলা হিন্দুপ্রধান এলাকা হিসেবে বিবেচিত হতো। এখানে ছিলো জমিদার বাবু মধুসূদন চৌধুরী ও বাবু যদুনন্দন চৌধুরীর কাছারী বাড়ি[৬০] কানসাটের জমিদার সূর্যকান্ত, শশীকান্ত ও শিতাংশু কান্তদের[৬১] এস্টেট এবং নাধাইকৃষ্ণপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু আশুনন্দন[৬২] -এর নিবাস। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় আলকাপ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

মুসলিম সমাজে আলকাপ অনাদৃত হওয়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে, মানুষের জীবনের চরম সত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে এমন কিছু খোলামেলা কথাবার্তা আলকাপে এসেছে যাকে আলেম সমাজ অশ্লীলতা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও গবেষক অধ্যাপক নওয়াব আলী একে অশ্লীল বলতে রাজী নন। তাঁর মতে, আলকাপে অশ্লীলতা ছিলো না, তবে স্থূল রস ছিলো। যা আলকাপকে সর্বসাধারণের খুব কাছাকাছি নিয়ে যেতো। তিনি বলেন, আলকাপে হিন্দু শাস্ত্রের কথা যেমন এসেছে, মুসলমানদের কথাও তেমনি এসেছে। তাই এর মূল চরিত্র হচ্ছে মানুষ। আলকাপ গানকে তাই কোনো বিশেষ ধর্মের নয়, সমগ্র মানুষের সম্পদ বলা যায়।[৬৩] 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'– চণ্ডীদাসের এই মহান বাণীর মূলসুর খুঁজে পাওয়া যায় আলকাপের

প্রতিটি পালায় ও গানে।

আলকাপ গানের উৎপত্তি যে তৎকালীন মালদহ জেলার মোনাকষা গ্রামে (বর্তমানে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার অন্তর্ভুক্ত) এতে কারো দ্বিমত নেই। উৎপত্তির পর এই লোকসংগীত নিজ রসগুণ ও অসাম্প্রদায়িকতার কারণে ক্রমশ মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রসার লাভ করে। তবে বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পুর্ণিয়া অঞ্চলে আলকাপের চর্চা দ্রুত কমতে থাকে। '৭০ এর দশকে আলকাপের চর্চা সেসব অঞ্চল থেকে প্রায় উঠেই যায়। শুধু বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলের কয়েকটি জেলায় এ গানের চর্চা অব্যাহত থাকে, যদিও তার বর্তমান অবস্থা আশানুরূপ নয়।

আলকাপ গানের শিল্পী পরিচিতি

বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত সংগ্রহ, চর্চা ও গবেষণার বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সংগ্রাহক ও গবেষকগণ লোকসঙ্গীতের কেবল লিখিত রূপ (text) সংগ্রহ করেছেন। লোকসঙ্গীত শিল্পীর পরিচয় (identity) ও তার অনুষ্ঠানাদির (performance) বিবরণ, যেমন, আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি, সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসঙ্গীতের সম্পর্ক, শিল্পীর সৃষ্টিশীলতা (creativity), উদ্ভাবন শক্তি (innovation), শিল্পীর সমগ্র সৃষ্টি (repertoire) তাঁদের গবেষণায় উপেক্ষিত। আধুনিক লোকসঙ্গীত গবেষণায় লোকসঙ্গীতের প্রাসঙ্গিক পাঠ (contextual study) শিল্পীর জীবন ইতিহাস রচনা এবং এর মাধ্যম বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। একজন সঙ্গীত শিল্পীর জীবন ইতিহাস রচনার প্রধান কারণ হলো এর মাধ্যমে লোক ঐতিহ্যের সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্ক নির্ধারণ করে ফোকলোর প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক উদঘাটন সম্ভব।[৬৪] ফোকলোর কোন স্থানু (static) বিষয় নয়। এটি একটি গতিশীল ও জীবন্ত (living and dynamic) বিষয়। বিশেষ একটি প্রক্রিয়ায় লোকসঙ্গীত সমাজে নতুন নতুন রূপ ও ধারা সৃষ্টি করছে এবং বিবর্তিত হচ্ছে। সক্রিয় ঐতিহ্যবাহী শিল্পীর সঙ্গে নিবিড় সংলাপের মাধ্যমে এই বিষয়টি জানা যায়। শিল্পীর বংশ পরম্পরালব্ধ জ্ঞান, অনুকরণ (imitation), নিজস্ব রচনা (composition), তাৎক্ষণিক সৃষ্টি (improvisation) আমাদের লোকসঙ্গীতের ধারা, সংস্কৃতির গতি প্রকৃতি, প্রক্রিয়া সম্পর্কে চমকপ্রদ তথ্য দিতে পারে। আধুনিক ফোকলোর চর্চার এই ধারায় মাঠসমীক্ষাভিত্তিক গবেষণা গুরুত্ব লাভ করায় গবেষক ও তথ্য দাতার দ্বিপাক্ষিক নিবিড় ও ধারাবাহিক সংলাপের বিষয়টিও নতুন মাত্রা লাভ করেছে। তাই বর্তমান বিশ্বে ফোকলোর চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষক ও শিল্পীর মর্যাদা সমান। ফিনল্যাণ্ডের আন্তর্জাতিক খ্যতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ প্রফেসর লাউরি হংকো শিল্পীকে সহ-গবেষক (Co-researcher) বা গবেষকের সঙ্গী (partnar-in-research) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত ফোকলোর বিশেষজ্ঞ প্রফেসর হেনরি গ্লাসি লোকশিল্পীদের শিক্ষক (teacher) আখ্যায়িত করে তাঁদেরকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[৬৫]

আলকাপ গানের শিল্পী হিসেবে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁদের পরিচয় এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও অভিজ্ঞতার আলোকে অর্জিত তাঁদের পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ কবিত্ব সবাইকে অবাক করে। বোনাকানার পরবর্তী সময় থেকে অদ্যাবধি আলকাপ চর্চায় যে সমস্ত সরকার ও শিল্পী অবদান রেখেছেন এবং রাখছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, দলের শিল্পী ও যন্ত্রীদের নাম এবং গানের নমুনা উপস্থাপন করা হলো :

মরহুম জামুরুদ্দিন সরকার (১৮৫৭-১৯৫২ খ্রিঃ) : জামুরুদ্দিন বিশ্বাস আলকাপ গানের পুরাতন দিনের শিল্পী ও দর্শক-শ্রোতাদের কাছে অতি পরিচিত নাম। তিনি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন মালদহ জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের অদূরে রাজারামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম আইনুদ্দিন বিশ্বাস। জামুরুদ্দিন বিশ্বাসের শিক্ষাগত যোগ্যতা ম্যাট্রিকুলেশন। তিনি ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে আলকাপ দল গঠন করেন। তিনি মুখে মুখে গান রচনা করতেন, সুর দিতেন এবং গাইতেন। তাঁর দলের শিল্পীরা কেউ বেঁচে নেই। শিল্পীদের নাম– শ্রী নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (বেহালাবাদক), শ্রী মনিন্দ্রনাথ ঘোষ (তবলাবাদক), দোস্ত মোহাম্মদ পণ্ডিত (হারমোনিয়াম বাদক), শ্রী রতিরাম ঘোষ (ছোকরা), শ্রী মনিন্দ্রনাথ শীল (ছোকরা), শ্রী ভুবনমোহন কর্মকার (কাইপ্যা), মোঃ ফাইজুদ্দিন মিয়া (দোহারী), মোঃ মহিরুদ্দিন (দোহারী), মোঃ লুৎফল হক (দোহারী), মোঃ বদিউজ্জামান (দোহারী), মোঃ হামেদ আলী (দোহারী), মোঃ ইউনুস আলী (দোহারী), মোঃ হাসুরুদ্দিন (দোহারী), মোঃ আসুরুদ্দিন (দোহারী)।[৬৭]

স্বর্গীয় শশীভূষণ দফাদার (১৮৭০-১৯৫৫ খ্রিঃ) : তৎকালীন মালদহ জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত নামোশংকরবাটী বিন্দপাড়া গ্রামে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে শশীভূষণ দফাদার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কবিরাজ অন্তভূষণ দাস। তিনি ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে আলকাপ দল গঠন করেন। তাঁর দলের সদস্যরা হচ্ছেন–পণ্ডিত ইদ্রিস আলী মিয়া (ব্যবস্থাপক), শ্রী তারণচন্দ্র দাস (তবলাবাদক), শ্রী বলরাম মণ্ডল (তবলা বাদক), শ্রী শ্যামাচরণ কর্মকার (কাইপ্যা), শ্রী কুইশচন্দ্র দাস (কাইপ্যা), শ্রী হুসান দাস (ছোকরা), শ্রী মনিন্দ্রনাথ বরিক (ছোকরা), শ্রী কানাই দাস (ছোকরা), শ্রী উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল (অভিনেতা), শ্রী নগর চন্দ্র দাস (অভিনেতা), শ্রী ভক্তিভুষণ দাস (অভিনেতা), শ্রী অমিয়নাথ দাস (অভিনেতা), শ্রী কালিপদ দাস (দোহারী), শ্রী নগেন্দ্রনাথ দাস (দোহারী), শ্রী আশুতোষ মনিকার (দোহারী)।[৬৯]

মরহুম আলহাজ এমাজউদ্দিন সরকার (১৮৮৩-১৯৮৪ খ্রিঃ) : আলকাপ গানের প্রখ্যাত সরকার এমাজউদ্দিন ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে বরেন্দ্রভূমির বর্ধিষ্ণু গ্রাম হরিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম কামুরুদ্দিন বিশ্বাস। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিম্নলিখিত শিল্পীদের সমন্বয়ে আলকাপ দল গঠন করেন– শ্রী যতীন্দ্রনাথ সাহা (হারমোনিয়াম বাদক), মোঃ আইয়ুব আলী (কাইপ্যা), শ্রী মনিদাস (তবলা বাদক), শ্রী শশী ভূষণ দাস (ছোকরা), শ্রী লক্ষণ দাস (ছোকরা), মোঃ আতারুদ্দিন (অভিনেতা), মোঃ হাসুরুদ্দীন মণ্ডল (দোহারী), মোঃ মহিউদ্দীন মণ্ডল (দোহারী), মোঃ কামরুদ্দীন (দোহারী), মোঃ বদু মণ্ডল (দোহারী)।[৭০]

ইসমাইল সরকার (১৮৯০-১৯৫৫ খ্রিঃ) : ইসমাইল সরকার ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে মসজিদ পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম ইব্রাহীম সরকার। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে আলকাপ দল গঠন করে সুদীর্ঘ ২০ বছর মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে গান পরিবেশন করে ইসমাইল সরকার যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর দলের শিল্পীরা হচ্ছেন– মঙ্গল মাষ্টার (হারমোনিয়াম বাদক), মাওলা বক্স মণ্ডল (তবলাবাদক), আকালু প্রামাণিক (ছোকরা), মদিনা প্রামাণিক (ছোকরা), সলিম প্রামাণিক (ছোকরা), রুস্তম প্রামাণিক (সহকারী), মেসের প্রামাণিক (অভিনেতা)[৭১], গফুর প্রামাণিক (অভিনেতা), আকন্দ প্রামাণিক (অভিনেতা), ডালিম মণ্ডল (দোহারী), কালি প্রামাণিক (দোহারী), এলাহী বক্স (দোহারী), সুখলাল প্রামাণিক (দোহারী)।[৭২] ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ইসমাইল সরকার আলকাপ থেকে অবসর নেন এবং ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

শ্রী লক্ষীনারায়ণ পাল ওরফে ঝড়ুপাল (১৯০০-জীবিত): লক্ষীকান্ত পাল তৎকালীন মালদহ জেলার বর্ধিষ্ণু গ্রাম বারোঘরিয়া নতুন বাজারে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ খ্রি. তিনি আলকাপ গানের দল গঠন করেন। তাঁর দলের শিল্পীরা ছিলেন– শ্রী মনীন্দ্রনাথ দাস (হারমোনিয়াম বাদক),[৭৩] শ্রী নিরানন্দ হালদার (হারমোনিয়াম বাদক), শ্রী মনোরঞ্জন দাস (তবলা বাদক), শ্রী মাধব পাল (তবলা বাদক), শ্রী জামিনীকান্ত পাল (বেহালাবাদক), শ্রী মনোহর সাহা (কাইপ্যাল), শ্রী মেঘনাদ ঘোষ (কাইপ্যাল), শ্রী শ্যামাচরণ হালদার (ছোকরা), শ্রী তারাপদ দাস (ছোকরা), শ্রী দুর্গাচরণ দাস (অভিনেতা), শ্রী নকুল চন্দ্র হালদার (অভিনেতা), শ্রী দুলাল চন্দ্র হালদার (অভিনেতা), শ্রী ঝড়ু ঘোষ (দোহারী), শ্রী অশ্বিনী পাল (দোহারী) , শ্রী ভুনু হালদার (দোহারী) ।[৭৪]

মরহুম হেসামুদ্দিন সরকার (১৯০৭-১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ): আলকাপ গানের প্রখ্যাত সরকার হেসামুদ্দিন ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মালদহ জেলার নবাবগঞ্জ থানার পোল্লাডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মোকসেদ আলী। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি আলকাপ দল গঠন করেন।[৭৫] দলের অন্যতম প্রধান গায়কের ভূমিকাও তিনি পালন করতেন। তাঁর দলের শিল্পী ও বাদকবৃন্দ ছিলেন– মোঃ সানাউল্লাহ (হারমোনিয়ামবাদক), শ্রী ধনঞ্জয় হালদার (তবলাবাদক), মোঃ সিদ্দিক মণ্ডল (দোহারী), মোঃ ইদ্রিস মিয়া (দোহারী), মোঃ তোফাজ্জল হোসেন (দোহারী), শ্রী পরেশ পুনিয়া (অভিনেতা),[৭৬] শ্রী নরেশ পুনিয়া (অভিনেতা), শ্রী আশুতোষ পুনিয়া (অভিনেতা), শ্রী নিমাই পুনিয়া (অভিনেতা), শ্রী সূর্যকান্ত পুনিয়া (অভিনেতা), শ্রী উমেশচন্দ্র দাস (ছোকরা), শ্রী ভূষণ দাস (ছোকরা), মোঃ নুরুদ্দিন (কাইপ্যা), মোঃ হাসুরুদ্দীন (সহকারী), মোঃ আইউব আলী (সহকারী), মোঃ দেরাশতুল্লাহ মণ্ডল (পরিচালক) ।[৭৭]

মরহুম ওয়াজেদ আলী ওরফে মংলা মিয়া (১৯১৮-১৯৮২ খ্রিঃ) : মংলা মিয়া ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে নামোশংকরবাটী মিয়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মুনসুর আলী মিয়া। মংলা মিয়া ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ২৫ বছর বয়সে আলকাপের দল গঠন করেন এবং তৎকালীন মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক, কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে আলকাপ পালা মঞ্চায়ন করে প্রচুর যশ ও খ্যাতি অর্জন করেন।[৭৮] তাঁর দলে যেসব শিল্পী ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন- মোঃ শুকুরুদ্দি বিশ্বাস (হারমোনিয়াম বাদক), শ্রী গোধন চন্দ্র দাস (তবলাবাদক), মোঃ লুটু মিয়া (কাইপ্যা), শ্রী হারাধন দাস (ছোকরা), শ্রী শ্যামাপদ দাস (ছোকরা), মোঃ মনিরুদ্দিন (অভিনেতা), শ্রী সূর্যকান্ত কর্মকার (অভিনেতা), শ্রী ভোলানাথ কর্মকার (অভিনেতা), মোঃ গিয়াস উদ্দিন মিয়া (দোহারী), মোঃ আমজাদ আলী (দোহারী), শ্রী ধীরেন কর্মকার (দোহারী), মোঃ সাবজাব আলী বিশ্বাস (পরিচালক) ।[৭৯]

খোশ মোহাম্মদ সরকার (জ. ১৯২২ খ্রিঃ) : খোশ মোহাম্মদ সরকার বরেন্দ্র অঞ্চলের নামোশংকরবাটী ভূতপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম দোস্ত মোহাম্মদ পণ্ডিত। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে খোশ মোহাম্মদ আলকাপ দল গঠন করেন। তাঁর দলের শিল্পীরা হচ্ছেন– শ্রী গুরুপদ ঘোষ (হারমোনিয়ামবাদক), শ্রী শচিন্দ্রনাথ ঘোষ (তবলাবাদক), শ্রী ভজহরি ঘোষ (তবলাবাদক), শ্রী, নকুল চন্দ্র ঘোষ (ছোকরা)[৮০], শ্রী বীরেন্দ্রনাথ গোষ (ছোকরা), শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (ছোকরা), মোঃ এসলাম মিয়া (অভিনেতা), মোঃ সাবেদ আলী (অভিনেতা), মোঃ নওসের আলী (সহকারী),

শ্রী যুধিষ্ঠির ঘোষ (দোহারী), মোঃ গিয়াস উদ্দিন (দোহারী), মোঃ মোজাম্মেল হক (দোহারী), মোঃ আনাম মিয়া (দোহারী), মোঃ সাইদুর রহমান (দোহারী)।[৮১]

শ্রী মহেশচন্দ্র মণ্ডল (১৮৯৮-১৯৭৬ খ্রিঃ) : মহেশচন্দ্র শিবতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বেনুয়ারী মণ্ডল। বয়সের প্রায় শেষ সীমানায় এসে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি আলকাপ গানের দল গঠন করেন। একই সাথে তিনি গায়ক ও অভিনেতা ছিলেন। তাঁর দলের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন– শ্রী রাধেশ্বর মণ্ডল (হারমোনিয়ামবাদক), শ্রী ফুটুক চন্দ্র মণ্ডল (তবলাবাদক), শ্রী গোপালচন্দ্র দাস (কাইপ্যা), শ্রী নিরাপদ মণ্ডল (ছোকরা), শ্রী বিপদভঞ্জন সরকার (ছোকরা), শ্রী যটু মণ্ডল (গায়ক ও অভিনেতা), শ্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল (দোহারী), শ্রী প্রভাত কুমার নিয়োগী (দোহারী), শ্রী যতীন্দ্রনাথ মণ্ডল (দোহারী)।[৮২]

শ্রী তিনকড়ি সাহা (১৯১০-১৯৮৭ খ্রিঃ) : তিনকড়ি সাহা ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে বরেন্দ্রভূমির উল্লেখযোগ্য জনপদ নয়ানশুকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৮৩] তরুণ বয়সে দল গঠন করার পর চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর ও নওগাঁর বিভিন্ন স্থানে পূজা-পার্বণ, অন্নপ্রাসন, বিয়ে ও প্রতিযোগিতার আসরে আলকাপ পরিবেশন করে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর দলের শিল্পীরা ছিলেন– মোঃ আফজাল হোসেন (হারমোনিয়ামবাদক), মোঃ সাইফুল ইসলাম (তবলাবাদক), মোঃ সাইদুর রহমান (কাইপ্যা),[৮৪] মোঃ ইউসুফ আলী (কাইপ্যা), শ্রী সমীর মণ্ডল (ছোকরা), মোঃ খাইরুল ইসলাম (অভিনেতা), মোঃ নাইমুল মিয়া (অভিনেতা), শ্রী দীনেশচন্দ্র সাহা (অভিনেতা), মোঃ চুটু মিয়া (দোহারী), মোঃ আব্দুর রহমান (দোহারী), মোঃ আব্দুল, মতিন (দোহারী)।[৮৫]

মরহুম নাসির উদ্দিন সরকার (১৯১৫-১৯৮৯ খ্রিঃ) : নাসির উদ্দিন সরকার ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন মালদহ জেলার নবাবগঞ্জ থানার আজাইপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম ইয়াকুব আলী। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি আলকাপ গানের দল গঠন করেন এবং তৎকালীন মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সুনামের সঙ্গে আলকাপ গান পরিবেশন করেন। তাঁর দলের শিল্পীরা হচ্ছেন–মোঃ বদির উদ্দিন (হারমোনিয়ামবাদক), শ্রী নগেন্দ্রনাথ দাস (তবলাবাদক), মোঃ ইউনুসুর রহমান (কাইপ্যা), শ্রী বিজয় কুমার দাস (ছোকরা), মোঃ দানেশ আলী (অভিনেতা), মোঃ আবদুর রাজ্জাক (অভিনেতা), খোশ মোহাম্মদ (অভিনেতা), মোঃ ভুটু মণ্ডল (দোহারী), মোঃ বুধু মণ্ডল (দোহারী)।[৮৬]

মরহুম সাবেদ আলী সরকার (১৯১৮-১৯৭৩ খ্রিঃ) : সাবেদ আলী সরকার ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে চরজোতপ্রতাপ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম ওসমান গণি। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে মাত্র বিশ বছর বয়সে তিনি আলকাপের দল গঠন করেন এবং দীর্ঘ কাল যাবত মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে আলকাপের আসর বসিয়ে প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। সাবেদ আলী সরকার স্বয়ং দলের হারমোনিয়াম বাদক ছিলেন। তাঁর দলের অন্যান্য শিল্পীরা হচ্ছেন– শ্রী মনিন্দ্রনাথ মণ্ডল (তবলা বাদক), মোঃ আবেদ আলী (কাইপ্যা), মোঃ সুবেদ আলী (ছোকরা), শ্রী উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল (অভিনেতা), শ্রী লখিন মণ্ডল (অভিনেতা), শ্রী ভাদু মণ্ডল (অভিনেতা), শ্রী লক্ষ্মী মণ্ডল (দোহারী), শ্রী পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল (দোহারী), শ্রী বিনু মণ্ডল (দোহারী)।[৮৭]

আবেদ আলী সরকার (জ. ১৯৩৭ খ্রিঃ) : মরহুম সাবেদ আলী সরকারের ছোট ভাই আবেদ আলী সরকার ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি মাত্র বছর বয়সে আলকাপ দল

গঠন করেন।[৮৮] তাঁর দলের শিল্পীরা ছিলেন– মোঃ আলতাফ হোসেন (হারমোনিয়ামবাদক), শ্রী দাশুনাথ মণ্ডল (তবলাবাদক), মোঃ আনারুল হক (কাইপ্যা), মোঃ সাইফুদ্দিন (ছোকরা), মোঃ আবুল হোসেন (অভিনেতা), শ্রী অনীল চন্দ্র মণ্ডল (অভিনেতা), মোঃ শুকুদ্দিন মণ্ডল (দোহারী), মোঃ নওসের আলী (দোহারী)।[৮৯]

মরহুম হাসু মণ্ডল সরকার (১৮৯০-১৯৬২ খ্রি.) : হাসু মণ্ডল ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে নামোশংকরবাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম বরকতুল্লাহ মিয়া। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে হাসু মণ্ডল আলকাপ গানের দল গঠন করেন এবং সুদীর্ঘ সময় সুনামের সঙ্গে বরেন্দ্র অঞ্চলের বিভিন্ন জনপদে আলকাপ পরিবেশন করেন। তাঁর দলের শিল্পীরা ছিলেন– মোঃ হেরাস উদ্দিন (হারমোনিয়াম বাদক), শ্রী নগেন্দ্রনাথ নিয়োগী (তবলাবাদক), মোঃ নইমুদ্দিন (কাইপ্যা), মোঃ তজু মিয়া (ছোকরা), তুফান আহমেদ (ছোকরা), মোঃ উলফৎ মিয়া (ছোকরা), মোঃ ভাদু মণ্ডল (অভিনেতা), মোঃ কালু পাতান (অভিনেতা), মোঃ তোরাব আলী (দোহারী), মোঃ মোকারুদ্দীন (দোহারী), মোঃ বেলাল উদ্দিন (দোহারী) ও মোঃ সলিম উদ্দিন মিয়া (পরিচালক)।[৯০]

মহবুব ইলিয়াস সরকার (জ. ১৯২৯ খ্রিঃ) : মহবুব ইলিয়াস সরকার ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন মালদহ জেলার নবাবগঞ্জ থানার নামোশংকরবাটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মোহাম্মদ আলী বিশ্বাস। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি আলকাপ দল গঠন করেন এবং রাজশাহী জেলার নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিভিন্ন স্থানে আলকাপ গান পরিবেশন করে খ্যাতি অর্জন করেন।[৯১] আলকাপ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে তিনি বহু কাপ, মেডেল ও সার্টিফিকেট লাভ করেন। তাঁর দলের অন্যান্য শিল্পীরা হচ্ছেন– শ্রী নকুল চন্দ্র কর্মকার (হারমোনিয়ামবাদক), শ্রী দাস রবিদাস (তবলাবাদক), শ্রী তারাপদ দাস (বেহালাবাদক),[৯২] মোঃ ফসিউদ্দিন (বাঁশিবাদক), শ্রী গংগা প্রসাদ দাস (ছোকরা), শ্রী মন্টু মোহন দাস (ছোকরা), শ্রী শ্রীকান্ত কর্মকার (কাইপ্যা), মোঃ ফাইজুদ্দীন (অভিনেতা), মোঃ আবদুল মালেক (অভিনেতা), মোঃ সুজাউদ্দিন (অভিনেতা), শ্রী গণপতিসাহা (অভিনেতা), শ্রী যোগেন্দ্রনাথ কর্মকার (অভিনেতা), মোঃ লতিফুর রহমান (অভিনেতা ও ছড়াকার), শ্রী শশধর সাহা (দোহারী), শ্রী দাসুদাস (দোহারী), ইউনুস আলী (ব্যবস্থাপক) ও মোঃ ধল্লু রহমান (সহকারী)।[৯৩]

উপসংহার

আলকাপ গানের নামকরণ, উদ্ভব, বিকাশ, এর বৈশিষ্ট্য এবং আলকাপ গানের সরকারদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে তুলে ধরা হলো। তাঁদের দলের শিল্পীদের নাম ও আলকাপ গানে তাঁদের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করা হলো। বরেন্দ্র অঞ্চলের এইসব লোকশিল্পীরা সক্রিয় ঐতিহ্যবাহী বা active tradition bearer হিসেবে সমাজে এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে চলেছেন। শিল্পীদের অধিকাংশই আজ বেঁচে নেই। আলকাপ গান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সাধারণ মানুষের জন্য অতিসাধারণ ভাষায় গানগুলো রচিত হয়েছে। জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায় এসব গানে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও আলকাপ গানে ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। আমাদের তথা বাঙালির জীবন, ধর্ম, আধ্যাত্মিক চেতনা, আন্দোলন, সংগ্রাম ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সঙ্গেও গানগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ। অগণিত মানুষকে আনন্দ দান, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নতুন উপলব্ধি সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই গানের গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্যসূত্র

১. দিলীপ ঘোষ, বাংলার লোকনাট্য : আলকাপ, পুথি পত্র (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১

২. প্রদ্যোত ঘোষ, লোকসংগীত : গম্ভীরা, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৮৬

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৪. দিলীপ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

৫. পুলকেন্দু সিংহ, মুর্শিদাবাদের আলকাপ গান (প্রবন্ধ), কর্ণসুবর্ণ পত্রিকা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ১৯৭৫ পৃ. ২৬

৬. মুর্শিদ আনোয়ার, ফোকলোর ক্ষেত্র নিরীক্ষণ : উত্তরবঙ্গ লেখা, বাংলা একাডেমীর মাসিক পত্র, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ৭ আগষ্ট ১৯৯২, পৃ. ৭

৭. দিলীপ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১

৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য (৩য় খণ্ড) ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ২৭৫

১০. তাসাদ্দক আহমদ, নবাবগঞ্জ জেলার লোকসংগীত: গম্ভীরা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৩৭

১১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

১২. আনোয়ারুল করীম, বাংলাদেশের লোকসংগীত, বৈশাখী লোকউৎসব ১৪০০, স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ২৬

১৩. মাযহারুল ইসলাম তরু, চাঁপাই নবাবগঞ্জের লোকসংস্কৃতি পরিচিতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৪৭

১৪. দিলীপ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

১৫. একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, মধ্যযুগে কৃষ্টি কালচারের প্রধান অবলম্বন ছিল বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীর গুণকীর্তন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লৌকিক দেবতার কল্পনা করে পুজো-উৎসব পালন করা হতো। নিজেদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অভাব-অভিযোগ, আনন্দ-বেদনা প্রভৃতি তাঁদের পাদপদ্মে নিবেদন করে প্রতিকারের আশায় বসে থাকতো। 'শিবের গাজন' নামে গম্ভীরা পুজোও শুরু হয় এই প্রেক্ষাপটেই। এক সময় গম্ভীরা পুজো অত্রাঞ্চলে 'জাতীয় উৎসব' হিসেবে পরিচিত ছিল।

১৬. দিলীপ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

১৭. প্রদ্যোত ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

১৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

১৯. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৪০, পৃ. ১০৪৬

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫১

২১. সাক্ষাৎকার : মোঃ রকীবুদ্দীন, গম্ভীরার নাতী, গ্রাম: বাসুনিয়াপট্টি, ডাক: চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ। বয়স: ৬০ বছর। তিনি তাঁর দাদা গম্ভীরা গানের বর্তমান আঙ্গিকের রূপকার মরহুম শেখ সফিউর রহমান ওরফে সুফী মাস্টারের মুখে শুনেছিলেন যে, আলকাপ গান পেশা হিসেবে অনেকেই গ্রহণ করেছিলেন। সারারাত ধরে শওয়াল-জবাব উপভোগে দর্শক শ্রোতাদের আগ্রহ ছিল প্রচণ্ড। রাত শেষ হয়ে অনেক বেলা পর্যন্ত চলতে থাকতো প্রতিযোগিতা।

২২. দিলীপ ঘোষ, বাংলার লোকনাট্য : আলকাপ, পুথি পত্র প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৬

২৩. স্বরোচিষ সরকার, 'কবিগান : অতীত ও বর্তমান : সাহিত্য পত্রিকা, অষ্টাবিংশবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৯১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৮৭

২৪. মহসিন আহমেদ, 'লোকসাহিত্যে আলকাপ', নবাবগঞ্জ সাময়িকী, সম্পাদক : আজিজ এন মোহাম্মদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জানুয়ারি ১৯৬৪, পৃ. ২৭

২৫. জঙ্গীপুর মহকুমা গ্রন্থমেলা স্মারক গ্রন্থ, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, বৈশাখ, ১৩৭০

২৬. পুলকেন্দু সিংহ, 'মুর্শিদাবাদের আলকাপ গান', কর্ণসুবর্ণ পত্রিকা, শারদীয় সংখ্যা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ১৯৭৫, পৃ. ২৯

২৭. সাক্ষাৎকার ঃ অধ্যাপক নওয়াব আলী, বালুবাগান, ডাকঘর : চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন মালদহ জেলার নবাবগঞ্জ থানাভুক্ত বারোঘরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম এম.কে.বিশ্বাস (বিদ্যাবিনোদ)। তিনি এ. এস. আই অব স্কুলস্ হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে রাজবাড়ি কলেজ, হবিগঞ্জ সরকারি কলেজ, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ ও নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজে বাংলা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকসংগীত গম্ভীরা, আলকাপ ও মেয়েলি গীত নিয়ে গঠনমূলক চিন্তাভাবনা করতেন। তিনি ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২২ এপ্রিল ১৯৯৪

২৮. কুণালকান্তি দে, আলকাপের শতবর্ষে ঝাঁকসু, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর ১৯৮০, পৃ. ৪৫৭

২৯. সাক্ষাৎকার: মহবুব ইলিয়াস সরকার, গ্রাম: ইসলামপুর, গ্রাম: ইসলামপুর, ডাকঘর: চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন মালদহ জেলার নবাবগঞ্জ থানার নামোশংকরবাটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫ বছর বয়স থেকেই তিনি আলকাপ গানের সঙ্গে জড়িত। তাঁর নিজস্ব দল ছিলো। পেশায় ব্যবসায়ী। বর্তমানে তিনি নবাবগঞ্জ শহরের নতুন ইসলামপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ২১ মার্চ ১৯৯৪

৩০. সাক্ষাৎকার : অধ্যাপক নওয়াব আলী।

৩১. আলকাপ দলের প্রধানকে 'সরকার' বলে।

৩২. সাক্ষাৎকার : মোঃ রকীবুদ্দীন, প্রাগুক্ত।

৩৩. সৈয়দ খালের নৌমান, 'মুর্শিদাবাদের লোকসংস্কৃতি: আলকাপ' শ্রী প্রতিভারঞ্জন সম্পাদিত 'মুর্শিদাবাদ চর্চা' শীর্ষক গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ, ১৯৮৮

৩৪. বর্তমান চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানাধীন একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম।

৩৫. নিজস্ব সংগ্রহ।

৩৬. আলকাপে পুরুষেরা নারী সাজে। বয়সে নবীন যুবকেরাই সাধারণত নারীর পোষাক পরে অভিনয় ও নৃত্য পরিবেশন করে। এদেরকেই 'ছোকরা' বলা হয়।

৩৭. সাক্ষাৎকার : মহবুব ইলিয়াস, প্রাগুক্ত

৩৮. স্ব-উদ্যোগে সংগৃহীত তথ্য।

৩৯. মরহুম মোহসীন আহমেদ, গ্রাম: হাঙ্গামী, ডাকঘর : মোনাকষা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর নিকট থেকে সংগৃহীত।

৪০. স্ব-উদ্যোগে অনুসন্ধানের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য।

৪১. প্রদ্যোত ঘোষ, লোকসংগীত ঃ গম্ভীরা, পৃ. ৮৬

৪২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য (৩য় খণ্ড), পৃ. ২৭৫

৪৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'লোকনাট্য', বাংলার লোকঐতিহ্য লোকনাট্য, সম্পাদনা : সৈকত আসগর, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯, পৃ. ১২৩

৪৪. মহবুব ইলিয়াস, গ্রাম : নতুন ইসলামপুর, ডাকঘর : চাঁপাই নবাবগঞ্জ, উপজেলা : নবাবগঞ্জ সদর, জেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ -এর নিকট থেকে সংগৃহীত।

৪৫. শ্রী জগন্নাথ ঘোষ, গ্রাম : হোগলা, উপজেলা : গোমস্তাপুর, জেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ -এর নিকট থেকে সংগৃহীত।

৪৬. প্রাগুক্ত

৪৭. মহবুব ইলিয়াসের নিকট থেকে সংগৃহীত।

৪৮. প্রাগুক্ত

৪৯. শ্রী জগন্নাথ ঘোষের নিকট থেকে সংগৃহীত।

৫০. আলকাপের শুরুতেই দেবী সরস্বতী, সঙ্গীত সাধক তানসেন, দলের সরকার প্রমুখের নামে জয়ধ্বনি করা হয়।

৫১. কাহিনী নিয়ে নাটকের আঙ্গিকে আলকাপ গানে পালা পরিবেশিত হয়।

৫২. নৃত্য সহযোগে দ্বৈত সঙ্গীত।

৫৩. একটি বিষয়ের পক্ষে একদল বিপক্ষে আরেকদল যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় তাকে আশায় বলে।

৫৪. সাক্ষাৎকার : মহবুব ইলিয়াস।

৫৫. তাসাদ্দক আহমদ, নবাবগঞ্জ জেলার লোকসংগীত : গম্ভীরা, পৃ. ৩৩

৫৬. আবু জাফর, 'সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ঐতিহাসিক পটভূমি : একাল সেকাল', উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৮

৫৭. আবু জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৫৮. মানিক সরকার, শিবগঞ্জ কর্তৃক চল্লিশের দশকে পরিবেশিত একটি জনপ্রিয় বন্দনা ছড়ার অংশবিশেষ। মোহসীন আহমদের নিকট থেকে সংগৃহীত।

৫৯. মোহসীন আহমেদ, 'লোকসাহিত্যে আলকাপ', নবাবগঞ্জ সাময়িকী, সম্পাদক : আজিজা এন. মোহাম্মদ, নবাবগঞ্জ, ১৯৬৪, পৃ. ৩২

৬০. শ্রী প্রতুল চন্দ্র ঝা, শোভানগর, গান্ধী রোড, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ (বাংলা), ভারত। দেশ বিভাগের পূর্বকালে তাঁর পিতা হরিশচন্দ্র ঝা এই জমিদারের নায়েব ছিলেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০০

৬১. মাযহারুল ইসলাম তরু, জেলা নবাবগঞ্জের ইতিকথা, রহিম বুক ডিপো, নবাবগঞ্জ, ১৯৯০, পৃ. ৫৭

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৬৩. সাক্ষাৎকার : অধ্যাপক নওয়াব আলী।

৬৪. শফিকুর রহমান চৌধুরী, 'সাইদুর রহমান বয়াতির সৃষ্টিতত্ত্বের গান', বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৪১ বর্ষ: ৩য় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ, ১৪০৪, পৃ. ৭৭

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

৬৬. সাক্ষাৎকার : শ্রী গুরুপদ ঘোষ, আলকাপ শিল্পী, বয়স: ৭০ বছর, গ্রাম : নামোশংকরবাটী তেলিপাড়া, ডাকঘর : নামোশংকরবাটী, উপজেলা : নবাবগঞ্জ সদর, জেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২৭ এপ্রিল ১৯৯২

৬৭. আলকাপ শিল্পী গুরুপদ ঘোষ-এর নিকট থেকে সংগৃহীত

৬৮. সাক্ষাৎকার : মোঃ সাজ্জাদ আলী, বয়স : ৭৮ বছর, গ্রাম : নামোশংকরবাটী, ডাকঘর : নামোশংকরবাটী, উপজেলা : নবাবগঞ্জ সদর, জেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১৯ এপ্রিল ১৯৯২

৬৯. মোঃ সাজ্জাদ হোসেনের নিকট থেকে সংগৃহীত

৭০. সাক্ষাৎকার : সৈয়ব আহমদ মাস্টার, বয়স : ৯০ বছর, গ্রাম : দূর্গাপুর, ডাকঘর : চাঁপাই দূর্গাপুর, উপজেলা : নবাবগঞ্জ সদর, জেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২৪ এপ্রিল '৯২

৭১. সৈয়ব আহমদ মাস্টারের নিকট থেকে সংগৃহীত

৭২. সাক্ষাৎকার : মহবুব ইলিয়াস, প্রাগুক্ত

৭৩. মহবুব ইলিয়াসের নিকট থেকে সংগৃহীত

৭৪. সাক্ষাৎকার : লক্ষীনারায়ণ পাল (ঝড়ুপাল), বয়স: ১০২ বছর, গ্রাম : নতুন বাজার, ডাকঘর : বারোঘরিয়া, উপজেলা : নবাবগঞ্জ সদর, জেলা : চাঁপাই নবাবগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৩

৭৫. লক্ষ্মীকান্ত পাল (ঝড়ুপাল) এর নিকট থেকে সংগৃহীত

৭৬. সাক্ষাৎকার : ডা. মোঃ রুহুল আমিন, বয়স : ৭৯ বছর, গ্রাম : আজাইপুর, ডাকঘর : রাজারামপুর, উপজেলা : নবাবগঞ্জ সদর, জেলা : চাঁপাই নবাবগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২৯ মার্চ ১৯৯৪

৭৭. মহবুব ইলিয়াসের নিকট থেকে সংগৃহীত

৭৮. সাক্ষাৎকার : মহবুব ইলিয়াস, প্রাগুক্ত

৭৯. মেহবুব রাজা (সঙ্গীত শিল্পী) এর নিকট থেকে সংগৃহীত

৮০. সাক্ষাৎকার : খোশ মোহাম্মদ সরকার, বয়স ৭৪ বছর, গ্রাম : ভূতপাড়া, ডাকঘর : নামোশংকরবাটী, উপজেলা : নবাবগঞ্জ সদর, জেলা : চাঁপাই নবাবগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১ মার্চ ১৯৯৯

৮১. খোশ মোহাম্মদ সরকারের নিকট থেকে সংগৃহীত

৮২. সাক্ষাৎকার : শ্রী অচিন্ত্য কুমার রায়, বয়স ৫২ বছর, গ্রাম : চরজোতপ্রতাপ, ডাকঘর : চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ৬ এপ্রিল ১৯৯৬

৮৩. শ্রী অচিন্ত্য কুমার রায়-এর নিকট থেকে সংগৃহীত

৮৪. সাক্ষাৎকার : মোঃ আব্দুল মতিন সরকার,

বয়স : ৩৫ বছর, গ্রাম : শিমুলতলা, ডাকঘর : বারোঘরিয়া, উপজেলা : নবাবগঞ্জ সদর, জেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২৬ এপ্রিল ১৯৯৫

৮৫. মোঃ আবদুল মতিন সরকারের নিকট থেকে সংগৃহীত

৮৬. সাক্ষাৎকার : ডা. মোঃ রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত

৮৭. সাক্ষাৎকার : এ. কে. ফজলুল হক টুনু, বয়স : ৪৬ বছর, গ্রাম নয়ানশুকা, ডাকঘর : চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা : নবাবগঞ্জ সদর, জেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১৩ মার্চ ১৯৯৬

৮৮. মহবুব ইলিয়াস সরকার -এর নিকট থেকে সংগৃহীত

৮৯. সাক্ষাৎকার : মোঃ আবেদ আলী সরকার, বয়স : ৬৪ বছর, গ্রাম চরজোতপ্রতাপ, ডাকঘর : চাঁপাই নবাবগঞ্জ, উপজেলা : নবাবগঞ্জ সদর, জেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০০

৯০. সাক্ষাৎকার : মোঃ আমিনুল ইসলাম জনি, বয়স: ৩৫ বছর, গ্রাম : মসজিদ পাড়া, ডাকঘর : চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা : নবাবগঞ্জ সদর, জেলা: চাঁপাই নবাবগঞ্জ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯৯

৯১. মহবুব ইলিয়াস সরকারে নিকট থেকে সংগৃহীত।

৯২. সাক্ষাৎকার : মহবুব ইলিয়াস, প্রাগুক্ত

৯৩. মেহবুব রাজার নিকট থেকে সংগৃহীত।

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-2, December 2020
pp. 42-49

নীললোহিতের দিকশূন্যপুর : একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

বৈশালী ঘোষ চৌধুরী

বৈশালী ঘোষ চৌধুরী
পিএইচডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail : ghoshbai26@gmail.com

সারসংক্ষেপ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের একজন দিকপাল ব্যক্তিত্ব। তাঁর সৃষ্টি করা একটি কাল্পনিক চরিত্র নীললোহিত। সাতাশ বছর বয়সী এক ভবঘুরে চরিত্র নীললোহিত। দক্ষিণ কলকাতার এক বহুতলে বিধবা মা ও দাদা-বৌদির সংসারে তার বাস। বাঁধাধরা চাকরি করতে অনিচ্ছুক এই নীললোহিত মাঝেমধ্যেই নিরুদ্দেশ হয়ে লুকিয়ে থাকে দিকশূন্যপুরে। সে এক কাল্পনিক স্থান, মানবতাই সেখানে বেঁচে থাকার শর্ত। বাংলা সাহিত্যে এমন দিকশূন্যপুরের খোঁজ দিয়েছেন একমাত্র সুনীল, যেখানে মানুষ নিজের মনের মতো পেশা বেছে নিয়ে সমস্ত দলাদলি থেকে দূরে আপনমনে বাস করতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধে নীললোহিতের এই দিকশূন্যপুর সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা করা হল। দিকশূন্যপুরের অবস্থান, পরিচয়, অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে যেমন আলোচনা রয়েছে তেমনি কীরূপ মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এমন দিকশূন্যপুরের উদ্ভব হয় সেই বিষয়ের উপরেও নজর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ দিকশূন্যপুরের উদ্ভবের পিছনে প্রেক্ষাপট ও সময়ের প্রভাব, একটি কাল্পনিক স্থান রূপে দিকশূন্যপুরের বিশিষ্টতা এবং অনন্যতা নিরূপণ করা হয়েছে।

মূলশব্দ

নীললোহিত, দিকশূন্যপুর, ময়ূরাক্ষী, ইউটোপিয়া, রোমান্টিকতা

ভূমিকা

পঞ্চাশের দশকে কলকাতার সাহিত্যক্ষেত্রে এক ঝাঁক তরুণ কবির আবির্ভাব ঘটে। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত এই কবিগোষ্ঠীর প্রত্যেকেই রচনাধারায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, জীবনযাপনে বেপরোয়া এক নিজস্বতাকে ভর করে বাংলা সাহিত্যের জগতে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) তাদেরই একজন, বা বলা ভালো, সেই দলের অগ্রণী। সাহিত্যের বিচিত্র শাখায় তার স্বচ্ছন্দ্য গমন। স্বনামে ছাড়াও একাধিক নামে তিনি সাহিত্যরচনা করে পাঠককে মোহিত করেছেন। এর মধ্যে যে নামে তিনি নিজেকে ছাড়িয়ে

একটি স্বতন্ত্র সত্তা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন সেটি নীললোহিত। বাঙালি পাঠকের কাছে নীললোহিত নামটি এক নিরন্তর ভালোলাগা বহন করে। তার বয়স সাতাশের বেশি কখনও বাড়ে না। স্বভাবে সে বাউণ্ডুলে ও ভবঘুরে, চাকরি পেলেও নিতে চায় না। সে কেবল নানান স্থানে ঘুরে বেড়ায়, বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় এবং সেই সংক্রান্ত নিজস্ব অনুভূতিকে প্রকাশ করে তার লেখায়।

বাংলা সাহিত্যে নীললোহিতের আবির্ভাব ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে, 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' নামক ফিচার সিরিজের হাত ধরে। ক্রমে ফিচার, উপন্যাস, নভেলা, ছোটগল্প প্রভৃতি বিভিন্ন সংরূপে নীললোহিতের কাহিনিগুলি পাঠককে এক অপরূপ অনুভূতির স্বাদ এনে দেয়। পথ চলার আনন্দে তার ভ্রমণ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ণ। চলার পথে সে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়, সবেতেই সে অংশগ্রহণ করে কিন্তু তেমন গভীরে প্রবেশ করে না। সঞ্চিত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কোন গুরুতর আত্মবিশ্লেষণে যেতেও সে রাজি নয়। ইঁট বালি কংক্রিটে মোড়া শহর কলকাতায় সদাব্যস্ত ও যুক্তিবাদী মানুষের ভিড়ে থাকতে থাকতে তার প্রাণ হাঁফিয়ে উঠলে সে রওনা দেয় পথের আকর্ষণে, বলে–

"আমি নিছক ঘুরে বেড়াই। কলকাতা শহরে মাঝে মাঝে আমার দম আটকে যায়। এখানে বড়ো রকমের কোনো সমস্যা দেখলেই পালিয়ে যাই জঙ্গলে পাহাড়ে, ট্রেন থেকে নেমে পড়ি কোনো অখ্যাত স্টেশনে। কখনো লুকিয়ে থাকি দিকশূন্যপুরে।"[১]

তার রচনায় বারবার এই দিকশূন্যপুরের কথা এসেছে। এ এক 'সব পেয়েছির দেশ'- বিভিন্ন পেশায় সফল অথচ প্রচলিত শহুরে যাপন সম্পর্কে উদাসীন কিছু মানুষ সেখানে বাস করে। এই পৃথিবীতে একমাত্র সে এই দিকশূন্যপুরের ঠিকানা জানে, মাঝেমাঝে সেখানে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসে।

বিশ্লেষণ

(১)

নীললোহিতের বিভিন্ন লেখায় বারবার দিকশূন্যপুরে পোঁছাবার আকুতি ধরা পড়েছে, অবশেষে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'নিরুদ্দেশের দেশে' উপন্যাসে নীললোহিত সশরীরে প্রথম সেখানে গিয়ে পোঁছেছে। এখানে যাওয়ার নির্দিষ্ট কোনো পথনির্দেশিকা নেই। অনামী এক ছোট্ট স্টেশনে নেমে হাইওয়েতে ট্রাক ধরে বেশ কিছুটা যেতে হয়, সেখান থেকে খানিকটা হেঁটে জঙ্গল-নদী-টিলা পেরিয়ে সেখানে পোঁছাতে হয়। নদীটির নাম চন্দ্রহার, নীলুর কথায়- "কোনো অপ্সরীর ভুল করে ফেলে যাওয়া অলংকারের মতন নিঃশব্দে পড়ে আছে নদীটা"[২]। কোনো ভৌগোলিক মানচিত্রে এর উল্লেখ আছে কিনা জানা নেই। তবু ঝুরো ঝুরো লাল পাথরের টিলা, শাল গাছের জঙ্গল প্রভৃতি দেখেশুনে স্থানটিকে ছোটনাগপুর মালভূমির অংশ বলে ভেবে নিতে ইচ্ছে হয়। পাহাড়, জঙ্গল ও নদী দিয়ে ঘেরা ছোট্ট জনপদ এই দিকশূন্যপুর, তার খবর না জানলে বাইরে থেকে তার অস্তিত্ব বোঝা সম্ভব নয়। কেউ কাউকে সেখানে পৌঁছে দিতে পারে না, দিকশূন্যপুরকে নিজে নিজে খুঁজে বের করতে হয়।

দিকশূন্যপুর নির্মাণের ইতিহাস সম্পর্কেও আমরা জানতে পারি নীললোহিতের মুখে–

"কত কাল আগে, ইংরেজ আমলে মিলিটারির লোকেরা এখানে একটা অস্থায়ী বসতি বানিয়েছিল। তারা চলে যাবার পর পরিত্যক্তই পড়েছিল সব বাড়ি ঘর। আস্তে আস্তে পলাতক মানুষদের দিয়ে গড়ে উঠেছে দিকশূন্যপুর।"[৩]

এখানে একটি গির্জাও আছে, সেটি ধর্মস্থান অপেক্ষা বেশি কমিউনিটি হলের মতো ব্যবহৃত হয়। নতুন মানুষ এসে যতদিন না কোন খালি ঘর পায় ততদিন ঐ

গির্জায় আশ্রয় নেয়। এছাড়া যার কাছে যে জিনিসটা অতিরিক্ত থাকে সে তা গির্জায় রেখে আসে, যাতে যার সেটি একান্ত প্রয়োজন সে সেখান থেকে তুলে নিতে পারে। দিকশূন্যপুরের জীবনধারাও খুব অদ্ভুত। টাকা পয়সার ব্যবহার এখানে নেই। আদিম বিনিময় প্রথায় এখানে আদানপ্রদান চলে। মানুষ এখানে নিজেরাই নিজেদের খাদ্য ও প্রয়োজনের সামগ্রী উৎপাদন করে নেয়, জঙ্গলের নুনপাথর ভেঙে নুন সংগ্রহ করে আনে। এখানে কোনো দোকান নেই, চা-চিনি-তেল বা কিছু কিছু শখের সামগ্রি তাদের একজন কখনো কখনো গিয়ে শহর থেকে সংগ্রহ করে আনে, তারপর সবার মধ্যে ভাগ করে দেয়। একে অপরকে সাহায্য করতেই তাদের আনন্দ। নিজে থেকেই সব পাওয়া যায় বলে এখানে চোর-ডাকাতের উপদ্রব নেই, তাই বাড়ির দরজা জানালা খোলা রেখেই বেরনো চলে। সেখানে কেউ কারুর ব্যক্তিগত বিষয়ে কৌতূহল দেখায় না, পূর্বজীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করা সেখানে নিষিদ্ধ। তবুও ভাব ভালোবাসা এখানে হয়, দুটো মানুষ চাইলেই একত্রে থাকতে পারে বিয়ে করে বা না করে, বাঁধা দেওয়ার কেউ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, কারুর এখানে থাকতে ভালো না লাগলে অথবা সংসারের মায়া ত্যাগ করতে না পারলে পুনরায় ফিরে যেতে পারে পূর্বজীবনে, কোনো বিধিনিষেধ নেই। সেখানে আনন্দ আছে, গান আছে, আড্ডা আছে– অদ্ভুত-মুক্ত এক পৃথিবী এই দিকশূন্যপুর, মানবতাই সেখানে বেঁচে থাকার একমাত্র শর্ত।

পাশের জঙ্গলের মধ্যে আছে একটি জলাশয়, তার পাশে একটি উঁচু বেদি। কারুর কোনো বড় ধরনের অসুখ হলে দিকশূন্যপুরের অধিবাসীরা তাকে সেখানে শুইয়ে রেখে আসে, কারণ তারা বিশ্বাস করে প্রকৃতির সাহচর্য মানুষের শরীর মনের বহু রোগ সারিয়ে দিতে পারে। আবার একজন বিশেষ মানুষের সেবা, শারীরিক ও মানসিক নৈকট্য মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছে এমন উদাহরণও এখানে আছে। সেখানে রাস্তার মোড়ে আছে পেল্লায় সাইজের ব্যাকবোর্ড, যার যা খুশি সেখানে লিখতে পারে, কেউ বারণ করে না। দিকশূন্যপুরে সরকার বা প্রশাসন কোনো হস্তক্ষেপ যেমন করে না, তেমনি সাহায্যও করে না। ওখানে বিদ্যুৎ পরিষেবা নেই, ডাকব্যবস্থাও নেই। কারো কোনো সমস্যা হলে মাদল বাজিয়ে লোক ডাকে, সেই জন্য প্রত্যেক পাড়ায় একটা করে মাদল রাখা আছে। তাছাড়া বাইরের কাউকে ডাক পাঠাতে হলে ওরা ইথার তরঙ্গ তোলে, কারণ তারা বিশ্বাস করে- সম্পূর্ণ মন দিয়ে ডাকলে যদি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, তাহলে মানুষকে পাওয়া যাবে না কেন? আরেকটি মজার ব্যাপার হলো দিকশূন্যপুরের অধিবাসীদের মিটিং। নদীর প্রান্তরে পাথরের মঞ্চে মাদল বাজিয়ে সকলকে আহ্বান করা হয়। সেখানে কোনো প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারি নেই, যে কেউ মিটিং ডাকতে পারে। প্রথমেই কোনো কাজের কথা না বলে টুকটাক গান-কবিতা-গল্প বলে নেওয়া হয়। সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলা ও পারস্পরিক সাহচর্যের সার্থক দৃষ্টান্ত এই দিকশূন্যপুর।

(২)

দিকশূন্যপুরের পুরো ব্যবস্থাটাই এখানকার বাসিন্দাদের তৈরি, তারাই একে মনুষ্য বসবাসের উপযোগী করে রেখেছে। এই মানুষগুলোই দিকশূন্যপুরের প্রাণভোমরা। এরা কেউ জীবনযুদ্ধে পরাজিত নয়, বরং বিভিন্ন পেশার সফল কিছু মানুষ কোনো না কোনো সময়ে বিশেষ মানুষের দ্বারা বা ঘটনার মাধ্যমে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। নীললোহিত বলে– "এদের প্রত্যেকের জীবনেরই এক একটা গল্প আছে। কিন্তু সে সব গল্প জিজ্ঞেস করা যায় না।"[৪] যেমন- এককালে

কলকাতার নামকরা নৃত্যশিল্পী ও নীললোহিতের বৌদির বন্ধু বন্দনাদি, নিজের জামাইবাবুর ঔরসে যার একটি মেয়ে হয়েছে অথচ দিদির সংসার ভাঙতে সে অনিচ্ছুক। সে সুন্দরী, শিক্ষিতা ও রুচিশীল, তথাপি কলকাতায় নিজের ঝকঝকে কেরিয়ার এককথায় ছেড়ে চলে এসেছে দিকশূন্যপুরে। তারপর ধরা যাক রোহিলার কথা, বোম্বেতে ফিল্মের জগতে শরীর প্রদর্শন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে সে এসে হাজির হয়েছে দিকশূন্যপুরে। নিজের পুরনো ক্লেদাক্ত জীবনের সমস্ত ঘটনা ধুয়ে মুছে ফেলতে চেয়েছে, মেয়ে পরিচয়ের চেয়েও বেশি মানুষ পরিচয়ে বাঁচতে চেয়েছে। তাকে তার স্বামী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেও সে রাজি হয় না, বলে–

"আমি কারুর সন্তান নই, আমার মা-বাবা নেই, ভাই-বোন নেই, আমি কারুর স্ত্রী নই, প্রেমিকা নই, আমি সম্পূর্ণ একা। একা থাকার অপূর্ব আনন্দের স্বাদ আমি পেয়েছি। এরা কেন আমার সেই আনন্দ কেড়ে নিতে চায়?"[৫]

এই কথাটি কেবল রোহিলার একার নয়, বরং দিকশূন্যপুরের সমস্ত অধিবাসীর জীবনের মূলসুর। যেমন- বসন্ত রাও চাইলেই নামকরা চিত্রশিল্পী হতে পারতো, পাঁচমিনিটের মধ্যে তুলির নিখুঁত আঁচড়ে সে নীললোহিতের মুখ এঁকে দিয়েছিল। এখানে সে কেবল প্রকৃতির ছবি আঁকে, এতেই তার আনন্দ। অথবা নীলুর বন্ধু বিজন, বরাবরের বইমুখো, গ্র্যাজুয়েশনে অর্থনীতিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল যে, সে আজ দিকশূন্যপুরে খুশিমনে পোলট্রি বানিয়েছে। কিংবা নীললোহিতের বন্ধু রফিকের জামাইবাবু মুরাদ সাহেব, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে আত্মহত্যা করবেন বলে নোট লিখে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন, বহু পথ ঘুরে এসে পৌঁছেছেন দিকশূন্যপুরে। কলকাতায় বিরাট পারিবারিক ব্যবসা তাদের, সব ছেড়ে এখানে এসে ফলের বাগান করেছেন। অবশ্য এরা ছাড়াও আরও বেশ কিছু মানুষ আছেন, যারা সত্যিই পরিস্থিতির চাপে পড়ে এখানে এসে বাস করতে শুরু করেছেন, যদিও পরে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে গেছেন। যেমন জয়দীপ, শিক্ষিত ও বিত্তবান ঘরের যুবক, একটা ভীষণ গোপন কথা বা 'স্টেট সিক্রেট' জেনে ফেলার অপরাধে তার পিছনে চর লাগানো হয়, প্রাণের দায়ে সে এখানে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। অথবা পিউ নামের মেয়েটি, বাবা মা দুর্ঘটনায় মারা যাবার পর সম্পত্তির লোভে তার মামা তাকে বিক্রি করে দেয়। যে দালালের হাতে তাকে দেওয়া হয়েছিল তার দ্বারা চূড়ান্ত শারীরিক ও মানসিক হেনস্থার শিকার হয়ে সে পালিয়ে দিকশূন্যপুরে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

তবে দিকশূন্যপুরের জীবনযাপন নিয়েও বেশ কিছু প্রশ্ন ওঠে। এখানকার বেশিরভাগ মানুষই সারাদিন বিবিধ ফসল ফলানোর ও খাদ্য উৎপাদনের কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকে। শিল্পী, তাত্ত্বিক বা চিন্তাবিদ প্রভৃতিরা থাকলেও সংখ্যায় বেশ কম। এখানে নতুন বাসিন্দা এলে কেউ যেচে আলাপ করতে যায় না, পূর্ব জীবনের কাহিনি জানবার কৌতূহল কারুর নেই। নিজেদের চারপাশে একটি অদৃশ্য বৃত্ত তারা রচনা করে রাখে এবং তার বাইরে বেরোতেও চায় না। রোহিলা এদের অভিহিত করেছে 'ইনটেলেকচুয়াল ইন্ট্রোভার্ট' নামে, কোনো দুরূহ বিষয় নিয়ে এরা মাথা ঘামায় না। যদিও এর পুরোটা ঠিক নয়। আসলে বাইরের পৃথিবী থেকে এই যাপন অনেকটা আলাদা। বাইরের লোকের চোখে এখানকার বাসিন্দাদের আত্মকেন্দ্রিক পলায়নবাদী বলে মনে হলেও পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থানের শ্রেষ্ঠ উদাহরণও এই দিকশূন্যপুর। এখানে কেউ অপরের সমস্যা সৃষ্টি করে না, কারুর থেকে কিছু প্রত্যাশা করে না, সাংসারিক টান এদের নেই, উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কেও এরা উদাসীন। বসন্ত রাও বলে– "দিকশূন্যপুর শুধু একটা জায়গার নাম নয়,

একটা ফিলোসফি, একটা বিশেষ ওয়ে অব লাইফ, একটা এক্সপেরিমেন্ট।"[৬] নিজেদের পৃথিবীতেই এরা বেশ সুখী আর এই তাদের বৈভব।

(৩)

নীললোহিতের আবির্ভাব ভারতের এক ক্রান্তিলগ্নে। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা ও দেশভাগ, তা থেকে সামলে উঠতে না উঠতেই পরপর দুটি ভয়াবহ যুদ্ধের ধাক্কা (১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধ ও ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ) নবগঠিত ভারতরাষ্ট্রকে বেসামাল করে দিয়েছিল। এছাড়া উদ্বাস্তু সমস্যা, দুর্ভিক্ষ, বেকারত্ব, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যর্থতা প্রভৃতি তো ছিলই। সবমিলিয়ে এক চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে সমকালীন শিক্ষিত যুবসমাজের ওপর। এই যুবসমাজের একটি অংশ ক্রমে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেয়, বিপ্লবের স্বপ্নে মশগুল হয়ে দিনবদলের ডাক দেয়– যার চূড়ান্ত পরিণতি সত্তরের দশকে নকশাল আন্দোলন, যা বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এক বহুচর্চিত অধ্যায়। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হয় যুবসমাজের অপর অংশটিকে কেন্দ্র করে। এরা সশস্ত্র বিপ্লবের পথে পা বাড়াতে আগ্রহী ছিল না, আবার প্রথাগত নিরূপদ্রব জীবনযাপনকেও মনেপ্রাণে স্বীকার করে নিতে পারেনি। যুবসমাজের এই অংশটি সম্পর্কে দীপেন্দু চক্রবর্তীর অভিমত–

"পঞ্চাশের দশক থেকেই কলকাতায় শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের একটা অংশ দেশপ্রেম, বিপ্লব, পেশাগত সাফল্য ইত্যাদিতে আস্থা হারিয়ে পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এক ভেসে চলা জীবনের প্রতি ক্রমশ আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিল। ওরা সংঘবদ্ধ বিদ্রোহে আগ্রহী ছিল না, এদের আগ্রহ ছিল নিতান্তই ব্যক্তিক খেয়ালে মধ্যবিত্ত যত্নে লালিত respectability-র জীবনদর্শনকে আঘাত করা। শুধু কথায় নয়, জীবনযাপনেও।"[৭]

এইসব চরিত্রের প্রত্যেকের মনেই দেশভাগের স্মৃতি টাটকা, উদ্বাস্তু ও দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মৃত্যুমিছিল এরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে এসে মহানগর কলকাতার শহুরে, যান্ত্রিক, মানবিক আবেগবর্জিত আধুনিক জীবনের ছাঁচে নিজেদের ঢালাই করে নিতে গিয়ে সমাজ-আদৃত মূল্যবোধের প্রতি অনাস্থা এদের মনে দৃঢ়মূল হয়েছে। হৃদয়ের অস্থির অবুঝপনাকে আঁকড়ে ধরে তারা পুরনো মূল্যবোধগুলিকে ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেলতে চেয়েছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নীললোহিতও এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ের ফসল। সাতাশ বছর বয়সী নীললোহিত যুবসম্প্রদায়েরই একজন প্রতিনিধি, কিন্তু তার প্রতিবাদের ধরনটি একেবারে আলাদা। সে 'আক্রমণাত্মক' নয়, বরং 'কল্পনা বিলাসী'। চাকরি-বিবাহ-সংসার প্রভৃতি সমাজনির্দিষ্ট 'আদর্শ' গুলিকে অস্বীকার করে স্বেচ্ছায় সে বাউণ্ডুলে ভবঘুরের জীবন বেছে নিয়েছে। কিন্তু স্থিতাবস্থাকে মেনে নিতে পারেনি, নিজের জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে সে প্রচলিত সমাজনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। বাস্তব পৃথিবীর জীবনযন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত বাঙালি পাঠককে সে খোঁজ দিয়েছে এক 'সব পেয়েছির দেশ' দিকশূন্যপুরের। যেখানে কোনো পাপ নেই, কষ্ট নেই, যন্ত্রণা নেই। কেউ কাউকে নীচু চোখে দেখে না বা দূরে সরিয়ে রাখে না। অনন্ত এক মায়া ও মানবিকতার বাঁধনে সেখানে সকলে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে। ফলে নীললোহিত যেন হয়ে উঠেছে সমকালীন যুবসম্প্রদায়ের রোমান্টিক মনেরই প্রতিরূপ, যে সমাজ ও সংসারের জাঁতাকলে নিত্য নিষ্পেষিত হয় এবং যাবতীয় অপ্রাপ্তি ও অপারগতাকে পূরণ করে হৃদয়ের রোমান্টিকতা দিয়ে। এই রোমান্টিকতাই চূড়ান্ত রূপ পায় দিকশূন্যপুরের

বা ধারণাতে, তাই এই দিকশূন্যপুরকে দেশ-কালের মানচিত্রে ধরা যায় না। আনন্দময় হৃদয়ের গহীন গোপন কুঠুরিতে এর চিরন্তন অবস্থান, যা মানুষকে এই সঙ্কটকালেও স্বপ্ন দেখায়, বেঁচে থাকার মূলমন্ত্রের খোঁজ দেয়। আশাপূর্ণা দেবীর কথায়–

"আমি সুনীলের অনেক অনেক ছোট্ট ছোট্ট লেখার মধ্যেই হঠাৎ হঠাৎ ওই "দিকশূন্যপুরের" আভাস খুঁজে পাই। যেটা আজকের সাহিত্যের রূঢ় বাস্তব আর জীবনযন্ত্রণার কষ্টকর স্বাদ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। অন্য একটি লাবণ্যময় স্বাদের অনুভূতি এনে দেয়।"[৮]

(৪)

আপাতদৃষ্টিতে দেখলে নীললোহিতের দিকশূন্যপুরকে একটি 'ইউটোপিয়া' বলেই মনে হয়। টমাস মোরের লেখা ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ক্ল্যাসিক উপন্যাস 'ইউটোপিয়া'। শব্দটি গ্রীক 'ou' অর্থাৎ 'no' এবং 'topos' অর্থে 'place' বা স্থান -এর সংমিশ্রণে গঠিত, অর্থাৎ যে নামে কোনো স্থান আসলে নেই। অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুসারে যার সংজ্ঞা– "an imagined place or state of things in which everything is perfect."[৯] 'ইউটোপিয়া' -এর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য দিকশূন্যপুরের মধ্যেও বিদ্যমান। যেমন–

১। অধিবাসীদের চিন্তা, যাপন ও মতাদর্শগত স্বাধীনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

২। মানুষের মধ্যেকার জাতপাত, ধর্ম, লিঙ্গ, জাতি প্রভৃতি বিভেদকে সরিয়ে রাখা হয় এবং সকলকে সমান চোখে দেখা ও সমান অধিকার লাভ করতে সাহায্য করা হয়।

৩। মানুষের মধ্যেকার সামাজিক ও মানবিক গুণাবলির উৎকর্ষ সাধন করে।

৪। ব্যক্তি মালিকানা ও অর্থের গুরুত্বকে পুরোপুরি নস্যাৎ করা হয়।

৫। মানুষ ও প্রকৃতির সম্পৃক্ততা বাড়ে।

৬। সরকার বা প্রশাসনের অস্তিত্ব থাকলেও কার্যকারিতা নেই। বাসিন্দারা নিজেদের মধ্যে আলোচনার দ্বারা নীতি ও কর্মসূচি স্থির করে।

৭। অধিবাসীরা যে যার পছন্দের কাজ করতে পারে এবং সকলে একসঙ্গে আনন্দে বসবাস করে।

৮। বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে একপ্রকার ঔদাসীন্য এখানকার মানুষের মনে কাজ করে প্রভৃতি।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একজন বাইরের মানুষের চোখ দিয়ে এই পুরো ব্যবস্থাটা বর্ণনা করা হয়। সে হয় কাহিনির কেন্দ্রিয় চরিত্র। পাঠক তার মধ্যে দিয়েই এই পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ করে। এক্ষেত্রে নীললোহিতের ভূমিকাটিও তাই। তার দিকশূন্যপুর আবিষ্কারের পিছনে প্রাথমিক কারণ বন্দনাদি। বৌদির বান্ধবী এই বন্দনাদির প্রতি ছেলেবেলা থেকেই নীলুর এক অমোঘ আকর্ষণ, হঠাৎ একদিন তার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া নীলু মেনে নিতে পারেনি। নিজেমুখে সে পরে বন্দনাদির কাছে স্বীকার করেছে– "তোমার জন্যই আমি অনেক কষ্টে এই দিকশূন্যপুর খুঁজে বার করেছি।"[১০] কিন্তু সেখানে যেতে যেতে, বিভিন্ন অধিবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে নীলু ক্রমে তাদেরই একজন হয়ে গেছে। সেখানকার মুক্ত বাতাস, স্বার্থবিহীন সাহচর্য, মানবিকতাময় রূপ তাকে আকর্ষণ করে। সেখানকার সকলের প্রতিই তার ভালোবাসা অফুরন্ত, কলকাতা থেকে যাওয়ার পথে তাদের জন্য কিছু না কিছু সে উপহার নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানে স্থায়ীভাবে থাকার কথা সে চিন্তাও করতে পারে না। 'নিরুদ্দেশের দেশে' উপন্যাসে একবার সে চেষ্টাও নীলু করেছিল। প্রথমে খানিকক্ষণ তার ভালোও লেগেছিল, সমস্ত শহুরে

পিছুটান একে একে ঘুচিয়ে ফেলেছিল কিন্তু থাকতে পারেনি। ধুলো-ধোঁয়ায় মোড়া শহর কলকাতা, তার ভিড়ভাট্টা, বাস-ট্রাম, কফিহাউসসহ তার এতকালের চেনা বিচরণক্ষেত্র তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। সেই ডাক উপেক্ষা করার সাধ্য নীলুর নেই। তখন তার মনে হয়েছে–

"এতদিন মাঝে মাঝেই স্বপ্ন দেখতাম, কোনো একদিন দিকশূন্যপুরে যাব। এখানে পাকাপাকি পৌঁছে গেলে আর কোথায় যাবার স্বপ্ন দেখব? যদি এখানে থাকতে ভালো না লাগে তাহলে সে দিকশূন্যপুর চিরকালের মত হারিয়ে যাবে?"[১১]

একলা সে রাত্রে নীলু পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। এই দো-টানা শেষাবধি নীললোহিতের সঙ্গী। আর তাই দিকশূন্যপুরে এসে থাকলেও, সেখানকার সব রঙ গায়ে মাখলেও সে পুরোপুরি তাদের মতো হয়ে যেতে পারেনি। তার মনে হিংসা আছে, কৌতূহল আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে এবং এইসব কিছুর জন্যই তাকে একজন রক্তমাংসের মানুষ বলে ভাবতে পাঠকেরও সুবিধা হয়।

বাংলা সাহিত্যে যার সঙ্গে নীললোহিতের চরিত্রগত মিল সবচেয়ে বেশি সে হল হুমায়ূন আহমেদের হিমু। নীললোহিতের মতো সেও একটি 'ইউটোপিয়া'কে সামনে রেখে ছুটে চলে। হিমুর ছেলেবেলায় স্বপ্নে দেখা এক কাল্পনিক নদী ময়ূরাক্ষী। চোখ বন্ধ করলেই সে নদীটিকে চোখের সামনে দেখতে পায়। হিমুর বর্ণনায়–

"ছোট্ট একটা নদী। তার পানি কাঁচের মতো স্বচ্ছ। নিচের বালিগুলি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। নদীর দুধারে দূর্বাঘাসগুলি কী সবুজ! কী কোমল! নদীর ঐ পাড়ে বিশাল ছায়াময় একটা পাকুড় গাছ। সেই গাছে বিষণ্ন গলায় একটা ঘুঘু ডাকছে। সেই ডাকে একধরনের কান্না মিশে আছে।"[১২]

আর সেই নদীর ধারে দেখে একটি কিশোরী মেয়েকে, সবুজ ডুরে শাড়ি পরে সে ছুটে বেড়াচ্ছে নদীর ধার ঘেঁষে। হিমু একঝলক মেয়েটির মুখ দেখতে পায়। সেই মুখ হিমুর বড় চেনা, জন্মান্তরের আপন। সেই কিশোরী তার মা, হিমুর পিতা যাকে একসময়ে হত্যা করেছিল। স্বপ্নে সেই ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে বসে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়, মন শান্ত করে। অনেক সময় বন্ধু বান্ধব কাউকে আমন্ত্রণ জানায় সেখানে সময় কাটাতে। কিন্তু নীললোহিতের মতো হিমু কখনো সশরীরে ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছায় না। তার রোমান্টিকতার কোনো সমাপ্তি নেই, অন্তহীন তার চলন, তার খোঁজ কখনো শেষ হয় না। উদ্দেশ্যহীন এক পথে তার এই নিরন্তর ছুটে বেড়ানো।

উপসংহার

মানবমনে সর্বদাই দুটি পৃথক সত্তা বর্তমান; একটি সত্তা বাস্তবধর্মী, অপরটি কল্পনাধর্মী। প্রথমটি যখন সমাজ ও সংসারের যাবতীয় কষ্ট, দুর্দশা, না পাওয়া, পেয়েও হারিয়ে ফেলাগুলো নিয়ে বিধ্বস্তপ্রায়, দ্বিতীয়টি তখন সব ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে পড়তে চায় এমন এক পৃথিবীর খোঁজে যা তার সমস্যাব্যাকুল পরিশ্রান্ত মনকে তৃপ্ত করবে। সেখানে কোনো বৈরিতা নেই, হিংসা-দ্বেষ-স্বার্থ নেই। সেখানে সবাই স্বাধীন, পৃথিবী আনন্দময় রূপটি সেখানে সর্বদা ভাস্বর। নীললোহিতের দিকশূন্যপুর এমনই এক স্বপ্ন দেখায়, এমন এক জগতের দ্বার উন্মোচন করে দেয় যেখানে পৌঁছানোর আকুতি সকল মানুষেরই চেতন বা অবচেতন মনে কমবেশি ক্রিয়াশীল। যে লেখা পড়ে প্রাত্যহিক জীবনের টানাপোড়েন ভুলে পাঠকের মনে পৃথিবীর বুকে আরও কটা দিন বেশি কাটানোর ইচ্ছা জাগে, অথচ সেখানে পৌঁছানোর সাধ্য কারুর নেই। নীললোহিতের চোখ দিয়েই একমাত্র তার রসাস্বাদন করা সম্ভব। এই মধুময় 'ইউটোপিয়া' দিকশূন্যপুর নির্মাণ, তাকে আকর্ষণীয় করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে

যথাযোগ্য বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপনের কৃতিত্ব লেখকের প্রাপ্য।

তথ্যসূত্র

১. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, "ভূমিকা", 'নীললোহিত সমগ্র, প্রথম খণ্ড', প্রথম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৭

২. নীললোহিত, "নিরুদ্দেশের দেশে", 'দশটি উপন্যাস', তৃতীয় সংস্করণ, 'দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৬৫৪

৩. নীললোহিত, "চলো দিকশূন্যপুর', 'দশটি উপন্যাস', তৃতীয় সংস্করণ, 'দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা : ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৭৫৬

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭৮

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২২

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮৮

৭. চক্রবর্তী, দীপেন্দু, "সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মবিকাশ", 'পঞ্চাশের দশকের কথাকার', উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, পুস্তকবিপণি, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১৬৭

৮. দেবী, আশাপূর্ণা, "শ্রী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্নেহভাজনেষু", 'শতমুখে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়', উজ্জ্বলকুমার দাস (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, সাহিত্যম্, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১৮

৯. সূত্র-http://en.oxforddictionaries.com/definition/us/utopia.

১০. নীললোহিত, "নিরুদ্দেশের দেশে", 'দশটি উপন্যাস', তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৬৯৫

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩৩

১২. আহমেদ, হুমায়ূন, "ময়ূরাক্ষী", 'হিমু সমগ্র- প্রথম খণ্ড", দ্বিতীয় প্রকাশ, কাকলি প্রকাশনী, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪২৩, পৃ. ১৪

গ্রন্থপঞ্জি

১. নীললোহিত, "নিরুদ্দেশের দেশে", 'নীললোহিত সমগ্র, সপ্তম খণ্ড', দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর ২০১২

২. নীললোহিত, "চলো দিকশূন্যপুর", 'দশটি উপন্যাস', তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬

৩. নীললোহিত, 'সত্যি মিথ্যের মাঝখানে', প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, মে ২০১৬

৪. আহমেদ, হুমায়ূন, "ময়ূরাক্ষী", 'হিমু সমগ্র- প্রথম খণ্ড', দ্বিতীয় প্রকাশ, কাকলি প্রকাশনী, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪২৩

৫. More, Thomas, 'Utopia', Translated by Dominic Baker- Smith, Penguin Classics, New Delhi, August 2012

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-2, December 2020
pp· 50-56

আন্তিগোনে : তিন প্রজন্মের অভিশাপ কিংবা একক নারীর স্পর্ধা

সুরজিৎ বেহারা

সারসংক্ষেপ

নারীর নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতীক আন্তিগোনে চরিত্রটি। যাকে গ্রিক নাট্যকার সোফোক্লেস নির্মাণ করেছিলেন খ্রিস্ট জন্মের প্রায় চারশো চল্লিশ বছর আগে। বিতর্কে, প্রতিবাদে এবং প্রতিস্পর্ধায় আন্তিগোনে ব্যতিক্রমী এক নাম। যাকে বহন করতে হয়েছিল তার পূর্বজদের অভিশাপ। তাই জীবনে আদর্শের পদাঙ্ক ধরে পথ হাঁটলেও বারবার নিয়তি নিয়ন্ত্রিত অসহায়তার কাছে তাকে নতি স্বীকার করতেই হয়েছে। আন্তিগোনে অভিশপ্ত যন্ত্রণার বোঝা বহন করে চলেছে, কারণ তার জন্ম সন্তান ও মাতার সংসর্গে। আন্তিগোনে প্রতিবাদী, কারণ সে চোখের সামনে দেখতে পারেনা- এক ভাই রাজকীয় সম্মানে এবং অন্যজন দেশদ্রোহিতার অপমান বুকে ধারণ করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। রক্ত-বন্ধনের দায় এই নারী অস্বীকার করতে পারেনি। তার বোন ইসমিনে পুরুষকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখতে নারাজ। কিন্তু আন্তিগোনে সাহসী। গ্রিক নগর-রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক অভিপ্রায় 'নোমোস'কে সে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ক্রেয়ন-এর দুরাচারকে সে ভয় পায় না। তার সঙ্গেই আন্তিগোনে'র মধ্যে আছে পারিবারিক 'মিয়াজমা' বা অপবিত্রতাকে মোচন করার গার্হস্থ্য বৈশিষ্ট্যগুলিও। নিজেকে বিপর্যস্ত করেও এই নারী ন্যায়ের কাঠগড়ায় পুরুষ-শাসিত সমাজ ব্যবস্থাকে এনে দাঁড় করিয়েছে। গ্রিক ট্রাজেডিতে ইফজেনিয়া, ক্যাসেন্দ্রা, ক্লাইতেমোনস্ত্রা- বিভিন্ন ধারার নারী চরিত্র অবস্থান করেছে। কিন্তু প্রতিবাদে ও স্পর্ধায় আন্তিগোনে স্বতন্ত্র, একক।

সুরজিৎ বেহারা
পিএইচ.ডি.গবেষক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail : Surojitbehara06@gmail.com

মূলশব্দ

দৈববাণী, প্রজন্ম , গণতন্ত্র, স্বেচ্ছাচার, প্রতিস্পর্ধা, রক্তবন্ধন, বিশ্ব-বিধান, নারীবাদ

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রচলিত সমাজ কাঠামোর বিপরীতে সমাজ-ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে যে আরও একটি কণ্ঠস্বর নিহিত আছে, তার অনুসন্ধান, তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে অতীতের সূত্র ধরে নারীর সামাজিক অধিকার, ক্ষমতার সম্পর্ক,

প্রান্তিকতা এবং ইতিহাস নির্মাণের নানাবিধ নেপথ্য রাজনীতিগুলিকে বুঝে নেবার চেষ্টা করা এবং অতীত ও সাম্প্রতিক সমাজ জীবনে নারীর স্বর ও সত্তা কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে, সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনার দ্বারা সেগুলি নতুন করে খুঁজে নেওয়া এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

বিশ্লেষণ

ক. তিন প্রজন্মের অভিশাপ

আন্তিগোনে খুব প্রচলিত নাম নয়। কিংবা বলা চলে সচেতনভাবেই এই নারীর পরিচয় দেশ-কাল-সমাজের গণ্ডিতে উচ্চারণ করা হয় না। ভারতীয় সংস্কৃতির পটভূমিতে তো তাকে গ্রহণেই বিস্তর সংস্কার রয়েছে। তবে না থাকাটাই কি স্বাভাবিক নয়? কে এই আন্তিগোনে? যাকে গ্রিক নাট্যকার সোফোক্লিস নির্মাণ করেছিলেন যিশুর জন্মেরও চারশো চল্লিশ বছর আগে? আসলে সেই জন্মের মধ্যেই তো নিহিত রয়েছে অভিশাপের দস্তাবেজ। সন্তান ও মাতার সংসর্গে যে নারী জন্মেছে কোন্ সভ্যতাই-বা তাকে গ্রহণে সম্মত হবে? তবু এই সন্তান প্রতিবাদের বীজ জীবন চেতনার মধ্যে বুনন করতে চেয়েছেন। কেবল নারীত্বের দাবি নয়, আজ থেকে প্রায় ২৪৫০ বছর আগে সাহিত্যের এক নারী রাজশাসন এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে, তা সেই যুগপটভূমিকায় আর অন্য কোনো লেখকের নাটকে চোখে পড়বে না।

একটি নয়, পরস্পর তিন প্রজন্মের অভিশাপের ভার বহন করে চলেছে আন্তিগোনে। পিতা লাবদাকুস্ -এর মৃত্যুর পর আর্গোস রাজ্যে পালিয়ে আসেন লেয়াস। আর্গোস-রাজ পেলোপস্ তাঁকে সন্তানের মতো পালন করলেও লেয়াস বড়ো হয়ে সেই রাজার প্রতি অন্যায় করেন। রাজা পেলোপস্ যন্ত্রণায় তাঁকে অভিশাপ দেন এবং আপোল্লো দৈববাণী করেন -এই লেয়াস তাঁর সন্তানের হাতেই নিহত হবেন। অনিবার্য পতনের ইতিহাস এখান থেকেই শুরু হয়। লেয়াস বিবাহ করেন ক্রেয়নের বোন জোকাস্টাকে। তাদের সন্তানের নাম ঈদিপাস। এবার লেয়াস অভিশাপ ও দৈববাণী স্মরণে রেখে সন্তানকে কিথাইরোন পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা করার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দায়িত্বে থাকা মেষপালক এই আদেশ পালন করেনি। সে কোরিন্থ রাজ্যের নিঃসন্তান রাজ-দম্পতির হাতে ঈদিপাসকে সমর্পণ করে। বড়ো হয়ে ওঠা ঈদিপাসও দেলফির মন্দিরে দৈববাণী শুনতে পেলেন। তিনি শোনেন, আগামীতে তাঁর হাতেই পিতা নিহত হবেন এবং নিজের জন্মদাত্রীই হবেন তাঁর স্ত্রী। অভিশপ্ত দৈববাণী শোনার পরে ঈদিপাস আর কোরিন্থে ফিরে আসেননি। তিনি থিবির দিকে পা বাড়ান। পথে তাঁর এক বৃদ্ধ অশ্বারোহীর সঙ্গে বিবাদ হয় এবং খণ্ড যুদ্ধে বৃদ্ধকে (লেয়াস'কে) ঈদিপাস হত্যা করেন। তিনিই ছিলেন ঈদিপাস-জনক। অভিশাপ ফলতে শুরু করে।

থিবি তখন অশান্ত। সেই রাজ্যকে শান্ত করে সেখানকার রাজা হয়ে বসেন ঈদিপাস। বিবাহ করেন রানি জোকাস্টাকে। পরে সেই চরম সত্য জানতে পেরে ইয়োকাস্তা আত্মহত্যা করেন এবং ঈদিপাস অন্ধ করে দেন নিজেকে। অথচ তারপরেও যন্ত্রণার দুই পক্ষকাল বাকি। ঈদিপাসের ঔরসে জোকাস্টার গর্ভে চার সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে– এতোয়ক্লেস, পলুনেইকেস্, ইসমেনে ও আন্তিগোনে। একসময় চরম অপমানে উন্মাদনা-বশে ঈদিপাস দুই সন্তানকে অভিশাপ দেন যে, তারা একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ হারাবে। হলো তাই। পিতার মৃত্যুর পর এক ভাইয়ের শর্ত সাপেক্ষ রাজশাসন শেষ হলেও সে অন্যজনকে দায়িত্ব দিতে চাইল না। নির্দিষ্ট সময় পরে এতোয়ক্লেস -এর রাজ-ক্ষমতা ছাড়ার

কথা। তা হচ্ছিল না। অগত্যা পলুনেইকেস তাঁর শ্বশুর আর্গোসরাজ আত্রাসতোস্ -এর সৈন্য নিয়ে ভাইকে বাইরে থেকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে দুই ভাই নিহত হন। রাজা হয়ে বসলেন ক্রেয়ন, তিনি শহিদ এতোয়ক্লেস্'কে রাজকীয় অন্ত্যেষ্টির সম্মান জানানোর নির্দেশ দিলেও পলুনেইকেস'কে চিল-শকুনের মুখে ফেলে দেবার নির্দেশ দেন। কারণ সে আক্রমণকারী। এবার আমরা প্রজন্মের অভিশাপ বুকে নিয়ে মঞ্চে এসে দাঁড়াতে দেখব আন্তিগোনে'কে। তিনি তাঁর দুই ভাইকেই শহিদের সম্মান দিতে চান। লড়াই এখান থেকেই শুরু হল। বিপর্যস্ত দৈববাণীর বিরুদ্ধে মানবতা ও আত্মশক্তির লড়াই। প্রাতিষ্ঠানিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সততার সংগ্রাম।

চরম পরিণতিকে বুঝতে পেরেও আন্তিগোনে বলছেন,

'...আমি আমার ভাইয়ের শেষ কৃত্য করবই
তার জন্য যদি মরি সেও সুখ।
পবিত্র কাজের জন্য দণ্ড মেনে নেব।
... মৃতকে ভালোবাসার সময় আমার অনন্ত
আমি পৃথিবীর নীচে শুয়ে থাকব অন্তহীন কাল।'[১]

-ভাবতে অবাক লাগে,

'অ্যারিস্টটলের মতো মনীষীও ভেবেছিলেন, কিছু কিছু আবশ্যিক গুণাবলি নেই বলেই নারীকে নারী থাকতে হয়, পুরুষের কাম্য অবস্থানে পৌঁছাতে পারে না। সন্ত টমাস অ্যাকুইনাস বলেছিলেন, নারী হল অসম্পূর্ণ পুরুষ। পুরুষ বুদ্ধি ও ধীসম্পন্ন এবং সক্রিয় ও শ্রেষ্ঠ; অন্যদিকে নারী বুদ্ধির ক্ষেত্রে হীন, ধীরিক্ত এবং নিষ্ক্রিয়।'[২]

সেখানেই খ্রিস্ট জন্মেরও প্রায় চারশো চল্লিশ বছর আগে লেখা একটি আখ্যান- যেখানে যুদ্ধ ঝলসিত তলোয়ার ও পুরুষের জয়ধ্বনি, যেখানে অভিশাপে পঙ্কিল হয়ে আছে একটি বংশের পরম্পরা; সেখানেই পবিত্র মুক্তির জল বহন করে আনছেন একজন নারী। ক্রেয়ন স্বেচ্ছাচারিতার বর্তিকা বাহক এবং বিপরীতে আন্তিগোনে রক্তবন্ধনের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। দুই সহোদরের বিপরীত পরিণতি এই বোন সহ্য করবে কী করে? আন্তিগোনে তাই পুরুষের বেঁধে দেওয়া পরিসীমায় আজ আবদ্ধ থাকতে নারাজ। আন্তিগোনে শব্দের আরও এক অর্থই যে বিদ্রোহিনী। বোন ইসমিনে তাকে বলছে, 'পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধ আমাদের কাজ নয়।' কিন্তু আন্তিগোনের স্পর্ধা রোধ করবে কে? রাষ্ট্রনীতি বা রাজার শাসন দণ্ডেরও ঊর্ধ্বে যে তাঁর পদচারণা।

খ. গণতান্ত্রিক কিংবা মানবিক দাবি

'নোমোস' শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি গণতান্ত্রিক অভিপ্রায়। যে শব্দের অর্থ, লিখিত বা অলিখিত সেই নিয়ম-যা নিছক ব্যক্তি-সমাজকে নয় বরং প্রভাবিত করবে সমস্ত মানবিক আচরণকে। আন্তিগোনে'র মধ্যে সেই আচরণ লালিত হয়েছে। তাই চরম দুঃখের দিনে এক ভাইকে মৃত্যু গৌরব এবং অন্য-জনকে চরম অন্ত্যেষ্টি- যন্ত্রণার দিকে তিনি ঠেলে দেননি। তারই বিপরীতে আরও একটি শব্দ রয়েছে, 'কেরুগনা'। যার অর্থ হতে পারে, নিয়মের নামে অবৈজ্ঞানিক স্বেচ্ছাচার অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া। সেই 'কেরুগনা'র প্রতীক রাজা ক্রেয়ন। গ্রিসের মতো গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় 'হুব্রিস' ও 'পাররেসিয়া' শব্দ দুটিও বিশেষ তাৎপর্যবহ। 'হুব্রিস' অর্থে অহমিকা, যা ক্রেয়ন-এর চরিত্র। তাই তো নিজের সন্তান হাইমোনকে সে তিরষ্কার করে বা অন্ধ ভবিষ্যৎ-বক্তা তাইরেসিয়াস তাকে সাবধান করতে এলে তাঁকেও রাজা ক্রেয়ন ধিক্কার জানায় ।

বিপরীতে 'পাররোসিয়া' অর্থাৎ গণতান্ত্রিক মশাল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আন্তিগোনে। কেবল নারী

নন একই সঙ্গে নগর রাষ্ট্রেরও নাগরিক তিনি। তাঁর অধিকার আছে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভাষা উচ্চারণের। তাই ব্যক্তিগত সংকটের ঊর্ধ্বে বাক্ স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে এই নারী গণতান্ত্রিক দাবিকেও প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। কিছুটা সংস্কারেরও দায় কি আন্তিগোনের মধ্যে নেই? ইংরেজির ১৯৭১ সালে Donna C. Kurtz এবং Ges John Boardman-এর লেখা 'Greek Burial Custom' থেকে জানা যায়, মৃত্যুর পরে পরিবারে আসে 'মিয়াসমা' বাংলা অর্থ-অপবিত্রতা। ভারতীয় সংস্কারে তাকেই 'অশৌচ' বলে। সেই অশৌচ থেকে মুক্তি লাভ তখনই সম্ভব যখন, পরিবারের কেউ সেই মৃত্যু পরবর্তী আচরণগুলি পালন করেন।[৩] সে-দিকেও আন্তিগোনে সচেষ্ট। কারণ নারীত্বের আচরণাদি লঙ্ঘনকে তিনি প্রগতি বলে ভাবেননি। নারীত্ব, প্রেম, নগর রাষ্ট্রনীতি, প্রতিবাদ ইত্যাদি মিলে মিশে সোফোক্লেস-এর কলমে আন্তিগোনে নারী চৈতন্যের এক অপরাজেয় বিজয় গাথা হয়ে উঠেছে।

গ. প্রতিস্পর্ধিত উচ্চারণ

এক নারী রাজশাসন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে ভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে তা সেই সমকালে অন্য কোনো নাট্যকারের নির্মিত নারীদের মধ্যে লক্ষ করা যায় না। খ্রিস্টপূর্ব ৫২৫-৪০৫ অব্দের মধ্যে গ্রিক নাট্যসাহিত্যে সোফোক্লেস ছাড়াও কলম ধরেছেন– এসকাইলাস, ইউরিপিদিস প্রমুখ নাট্যকার। কিন্তু তাঁদের নির্মিত কোনো চরিত্রই কি আন্তিগোনের প্রতিস্পর্ধি? এসকাইলাস তাঁর 'আগামেমনন' ট্র্যাজেডিতে দুই নারীর অসহায়তাকে দেখিয়েছেন। ট্রয়ের বিরুদ্ধে গ্রিক বাহিনীর সমর অধিনায়ক আগামেমনন দৈব নির্দেশ পান-যদি যুদ্ধে জয়লাভ করতে হয়, তবে কন্যা ইফিইয়া'কে বলি দিতে হবে। তিনি তাই করলেন। সেখানে তো নারীর অধিকার পুরুষের সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে নিয়েই শেষ হয়েছে। যেমন স্ত্রী ক্লাইতেমনেস্থাকে মাতৃত্ব থেকে তিনি বঞ্চিত করলেন তেমনি স্ত্রীর যোগ্য সম্মান না দিয়ে ট্রয় থেকে রক্ষিতা করে আনলেন ভবিষ্যৎ-বক্তা কাসান্দ্রাকে। সেখানে ক্লাইতেমনেস্ত্রার স্বামীর প্রতি যথার্থ প্রতিশোধের আয়োজন থাকলেও তা কখনই আন্তিগোনের মতো সমাজ ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানায়নি। কিংবা ইউরিপিদেসে-এর কলমে সেই 'ইফিইয়া' যখন নাট্যরূপ পেল তখনও ঘটনাধারাকে ভেঙেচুরে পিতৃসত্য পালনকারী কন্যাকে লেখক আর বলি দিলেন না। চরম মুহূর্তে সেই চতুর্দশবর্ষীয়া নারী হরিণে পরিণত হলেন এবং দেবতারা তাঁকে নিয়ে গিয়ে পরিণত করলেন মন্দিরের পূজারিণীতে।

প্রশ্ন জাগে, এই আখ্যানগুলিতে নারীর গৌরব কোথায়? শিশিরকুমার দাশ লিখছেন–

'যে রক্তবন্ধনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে সে রাষ্ট্র শক্তির বিরোধিতা করেছে, তার জন্য পেয়েছে মৃত্যু, সেই মৃত্যু এখন তাকে রক্তবন্ধনের ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত করবে। তার আশা তাই সে মিলিত হবে, জননীর সঙ্গে, পিতার সঙ্গে, ভাইয়ের সঙ্গে।'

প্রথমে যখন বোন ইসমেনের কাছে সাহায্য চেয়েও কেবলমাত্র প্রত্যাখ্যান পেয়েছেন তখনও আন্তিগোনে ভেঙে পড়েননি, বরং আরও দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের সংকল্পের কাছে ফিরে এসেছেন। দু'বার রক্ষকদের নজর এড়িয়ে সমাধিস্থ করেছেন রাজদণ্ডে দোষী ভাইকে। এই অপরাধে তাঁকে বন্দিনী করা হলেও সেই স্থিরতা তখনও আন্তিগোনের মধ্যে বর্তমান। এবার সমস্ত বন্ধন তাঁর অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। অনন্ত নিদ্রালোকে যাবার সময় তিনি উচ্চারণ করছেন–

'আমার পুণ্য পবিত্র কাজ
পাপ বলে আজ হয়েছে গণ্য
এই কি ইচ্ছা স্বর্গলোকের?
আমার কর্ম অন্যায় হলে
মৃত্যুতে হোক প্রায়শ্চিত্ত
আর যদি হয় অন্যেরা দোষী
তারা যেন পায় সমান দণ্ড।'[৪]

নানাভাবে আন্তিগোনের এই প্রতিস্পর্ধাকে ব্যাখ্যা করা যায় । প্রবল প্রতাপশালী ক্রেয়ন এই 'সামান্য' মানবীর কাছে নত হতে বাধ্য হয়েছে। যেখানে বিজ্ঞরা ক্রেয়নের বিরুদ্ধতা করার সাহস দেখায়নি, সেখানে আন্তিগোনে তার বিপক্ষে! মনে হয়েছে এই নারী আজ তাঁর ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী। পুত্র হাইমোন বা অন্ধ ভবিষ্যৎ বক্তা তাইরেসিয়াসকে রাজা ক্রেয়ন অবহেলায় পাশ কাটিয়ে এলেও আন্তিগোনেকে অস্বীকার করার ক্ষমতা তার মধ্যে নেই। তাই বিশিষ্ট আলোচকের মতানুসারে বলা যায়, আন্তিগোনের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ রাজা ক্রেয়নকেও শিক্ষিত করেছে। এই নাটক ক্রেয়নের ক্ষমা ভিক্ষার আখ্যান। আন্তিগোনে যার অনুঘটক।

একই সঙ্গে এই নারী ধীর এবং শান্ত! প্রেম তাঁর মধ্যেও এসেছে। তবে আত্ম-সম্মানকে সে-জন্য বিসর্জন দিতে রাজি নয় এই নারী। তিনি ভালোবাসেন রাজা ক্রেয়নের সন্তান হাইমোনকে। অথচ পিতা চায় না এই 'পিশাচী'র সঙ্গে তার সন্তানের বিবাহ হোক। তাই সেই আন্তরিক প্রেমকেও এই নারী বিসর্জন দিতে পারেন। প্রেমিককে উদ্দেশ্য করে একবার মাত্র আন্তিগোনে জানিয়েছেন, 'হাইমোন। তোমার পিতা আমাকে অপমান করেছেন।' বোন ইসমেনেকেও একবার আন্তিগোনে বলেছিলেন, সুখ নয় বরং দুঃখকেই তিনি নির্বাচন করে নিয়েছেন। একই সঙ্গে লাভ-ক্ষতির ঊর্ধ্বে গিয়ে বিদ্রূপকেই এই নারী তাঁর আত্ম-যন্ত্রণার ভাষা করে তুলেছেন। তাঁর প্রেমে বিহ্বলতা নেই, আছে তরঙ্গবিহীন আর্তনাদ।

শেষ পর্যন্ত অপমানিত ভাইয়ের শেষকৃত্য করতে সক্ষম হয়েছেন আন্তিগোনে। তাই অনিবার্যত তিনি এখন রাজ অপরাধী। তবে আর কোনো ক্রোধ বা উত্তেজনা এখন তাঁর মধ্যে অবশিষ্ট দেখা যায় না। মৃত্যুর সঙ্গে এবার তাঁর বিবাহ পর্ব শুরু হবে। প্রহরীরা তাঁকে নির্বাসন দিয়ে আসবে অনন্ত ঘুমের রাজ্যে। যাকে কোরাসের বৃদ্ধরা বলেন- 'পাঙ্কোইতেন'। তবু এই পতন তো তাঁর নিজের কারণে নয়। সমাধি-বিবাহ সজ্জা-কারাগার; সব, সবই তাঁর রাষ্ট্র-বিরোধিতার ফলাফল। থিবি'র পণ্ডিতেরা জানেন, এই পতন আসলেই পিতার অভিশপ্ত জীবনের ফলাফল কিংবা সেই বিপর্যয়ের নেপথ্যে আছে পূর্ব তিন প্রজন্মের অভিশাপ।

কবি শামসুর রাহমান তাঁর 'বন্দি শিবির থেকে' শীর্ষক কাব্যে 'আন্তিগোনে' নামের একটি কবিতা লিখেছেন। সেখানে রুক্ষতার বিপক্ষ মরুদ্যান যেন এই নারী। যে মরু-নগরের আকাশে বাতাসে মৃতের গন্ধ ভাসছে আজ, আন্তিগোনেই সেখানে একমাত্র ব্যতিক্রম। নীল শপথ তাঁর চেতনা জুড়ে। সিপাহী, প্রহরী অতিক্রম করে একমাত্র এই নারীই তাঁর সহোদরের কবরে মাটি দিতে পেরেছিলেন। রাজার বিধান, রুদ্ধ গুহা-কোনো কিছুই তাঁকে শঙ্কিত করতে পারেনি সেদিন। স্বদেশের অসহায়তার এক চরম সন্ধিক্ষণে প্রাচ্যের কবি শামসুর রাহমানও তাই আন্তিগোনেকে আহ্বান করছেন। সেই নারীর প্রতিস্পর্ধা আজ বড়ো প্রয়োজন। কবি লিখছেন,

'রৌদ্রে শুকায় রক্তধারা,
মাংস ছেঁড়ে শবাহারী,
কে দেবে গোর দুর্বিপাকে?
নেই যে তুমি উদার নারী।'[৫]

একই ভাষ্য কবিতায় তুলে এনেছেন ভারতের অন্যতম শক্তিশালী বাঙালি লেখক কবিতা সিংহ। তাঁর 'হরিণাবৈরী' কাব্যেও আছে 'আন্তিগোনে' নামের একটি কবিতা। সেখানে নারীর নিজস্ব অধিকারের বয়ানে কবি এই প্রত্ন- নারীকে উপস্থাপন করেছেন। তিনি আন্তিগোনের কাছে জানু পেতে বসতে চান। বলেন,

'একবার, শুধু একবার
চুম্বন করাতে চাই আন্তিগোনে
তোমার ওই কলাপাতারঙ্ পোশাকের পুণ্য প্রান্তদেশ!'[৬]

কারণ, আর পাঁচজন নারীর মতো সতীত্ব, রমণ, সন্তান-সুখ নিয়ে সেই নারী ব্যস্ত থাকেননি। মাত্র সতেরো বছর বয়সেই আন্তিগোনে জীবনের সব রহস্য সমাধান করেছিলেন। তাই কি পরম সত্যের অনুসন্ধানই তাঁর পতনের মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ। কবির ভাষায়,

'তুমি বুকে রেখেছিলে মৃত্যুবীজ তীব্র সহজাত?
যেভাবে, স্বভাবে, বুকের ভিতর বয়, মিথ্যার যন্ত্রণা কিছু
স্বতন্ত্র ঝীনুক!'[৭]

উপসংহার

সম্ভাবনার সমস্ত অঙ্কুরিত ফসলকে নষ্ট করেই প্রতিজ্ঞা এবং সাহসের কাঁধে ভর দিয়ে আন্তিগোনে সেই পাঙ্কোইতেনের দিকে যাত্রা করেছেন। সঙ্গে বহন করেছেন তাঁরই পিতার 'মাতৃ-গমন'জাত অভিশাপ। এই ভাবেই যুগে যুগে প্রতীচ্যের একজন বীরাঙ্গনা প্রাচ্যের স্রষ্টাদের কলমেও সময়ের মেজাজ অনুযায়ী জীবন্ত হয়ে ওঠেন।

বিশ্ব-বিধান ও স্বর্গের নিয়মকে এই নারী অবহেলায় চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। সাম্প্রতিক নারীবাদী পাঠমালায় এই প্রতিষ্ঠান বিরুদ্ধতার নানা সাক্ষ্য বর্তমান। কখনও Elaine Showalter তাঁর 'Gynocritics' গ্রন্থে বলছেন,' এই তত্ত্বের আলোচনা একমুখী বা কোনো এক বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ নয়। বরং একদিকে যেমন তা মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতার প্রাচীন ঐতিহ্যের খোঁজ করে, তেমনই তা হাল আমলের নারীকে ছুঁয়ে থাকা সমস্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে তার অবস্থানকেও তুলে ধরার চেষ্টা করে।'[৮] কিংবা Jasbir Jain তার মধ্যেই খুঁজে চলেন ক্ষমতার সম্পর্ক, প্রান্তিকতা ও ইতিহাসের কল্পনা। 'আন্তিগোনের মতো একটি টেক্সট সেই ইতিহাসের ধূসর জগতে বহু সহস্র শতাব্দী আগেই নারীর অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করেছে। সেখানে কেবল নারীবাদী তত্ত্বের আড়ম্বর নয় বরং মিশে আছে আত্মজনের সম্মান উদ্ধার ও রক্তবন্ধনের প্রতিস্পর্ধা। আন্তিগোনে সেই স্পর্ধারই অন্যতম পুরাতন একটি নাম।

তথ্যসূত্র

১. শিশিরকুমার দাশ (অনুবাদ), 'আন্তিগোনে', তৃতীয় মুদ্রণ, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১৪

২. তপোধীর ভট্টাচার্য, 'প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব', তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১৫৭-১৫৮

৩. শিশিরকুমার দাশ, পূর্বোক্ত পৃ. ৮১

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

৫. শামসুর রহমান, আন্তিগোনে, বন্দিশিবির থেকে, সর্বাধুনিক সংস্করণ, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৫৬

৬. কবিতা সিংহ, আন্তিগোনে, হরিণাবৈরী, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৯ পৃ. ১০০

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১

৮. দ্র. মুন্সী মহম্মদ ইউনুস, 'নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব: একটি নিবিড় পাঠ'; নবেন্দু সেন (সম্পাদনা),

'পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা', দ্বিতীয় সংস্করণ, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৪১৪-৪১৫

গ্রন্থপঞ্জি

আকর

শিশিরকুমার দাশ (অনুবাদ), 'আন্তিগোনে', প্রমা প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ২০০৪

শিশিরকুমার দাশ (অনুবাদ), 'গ্রীক নাটক সংগ্রহ', প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১২

সহায়ক

কবিতা সিংহ, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯

তপোধীর ভট্টাচার্য, 'প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব', তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬

নবেন্দু সেন (সম্পাদিত) 'পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, রত্নাবলী, ২০১২

শামসুর রাহমান, 'কবিতা সংগ্রহ', সর্বাধুনিক সংস্করণ, কলকাতা, পুনশ্চ, ২০১০

সাধনকুমার ভট্টাচার্য, 'এরিস্টটলের পোয়েটিকস্ ও সাহিত্যতত্ত্ব', দশম সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-2, December 2020
pp· 57-66

মনসামঙ্গলকাব্যে প্রতিফলিত পৌরাণিক সমাজ ও দ্বিজবংশী দাসের মৌলিকতা

মিজানুর মণ্ডল

সারসংক্ষেপ

সুদীর্ঘকাল ধরে মনসামঙ্গল কাব্য রচনার গতানুগতিক ছকে বাঁধা পথ ছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে কবিদের স্বাতন্ত্য দেখাবার কোনো সুযোগ সে যুগে ততখানি ছিলনা। তা সত্ত্বেও জীবনের দাবিতে, কবিদের অভিজ্ঞতায় যুগ-পরিবেশ, সমাজ-সংস্কৃতি, আঞ্চলিকতা, ভাষা ব্যবহার, কবিদের পারস্পরিক রুচিগত ভেদ সর্বোপরি চৈতন্যদেব ও পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাব তাঁদের রচনাশৈলী ও কাহিনি বয়ানে পার্থক্য ঘটিয়েছিল। আর এখানেই সৃষ্টি হয়েছে অভিনবত্ব– এসব নিয়ে স্বল্পপরিসরে এই প্রবন্ধে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

মিজানুর মণ্ডল
গবেষক রবীন্দ্র ভারতী
বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত
e-mail : mizanurmondal07@gmail.com

মূলশব্দ

জাতি, ধর্ম, মঙ্গল, অখ্যান, নিম্নবর্গ, প্রাগাধুনিক, মনসা, দ্বিজবংশীদাস

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় হল প্রাগাধুনিক যুগ। খ্রিস্টীয় দশম-একাদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বিষয় বৈচিত্র্যের ধারা এই সময়ে বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। এই সময় সর্বভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতি সাহিত্যের অনুবর্তন যেমন ঘটেছে, তেমনি আবার রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা, ব্যক্তিজীবন, নর-নারীর হৃদয়ের চাওয়া পাওয়া, ইসলামি ঐতিহ্য, আবহমানকালের গ্রাম বাংলার পল্লীগীতি প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠেছিল সাহিত্য-সংস্কৃতি ধারা। পাশাপাশি কিছু ধর্মমূলক আখ্যানকাব্যের সন্ধান মেলে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এইসব ধর্মমূলক আখ্যানকাব্যকে মঙ্গলকাব্য নামে অবিহিত করা হয়। সাধারণত মধ্যযুগের বাঙালি বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, সাপ ও বাঘ ইত্যাদি নানাবিধ ভয়ের সম্মুখীন হয়েছে। তখন তারা বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীর আশ্রয় নিয়েছেন প্রতিকারের জন্য। এইসব লৌকিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্য উপলক্ষ করে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিতের আঙ্গিনায় এক শ্রেণির কাব্য গড়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যা মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মঙ্গলকাব্যের সময়সীমা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন,– 'আনুমানিক খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের যে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান-কাব্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত।'[১]

মঙ্গলকাব্যগুলি বাংলা সাহিত্যের ভুঁইফোঁড় কেনো বিষয় নয়। এগুলি প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব ফসল। এর বিষয় অনুবাদ সাহিত্যের মতো অন্য ভাষা থেকে গৃহীত হয়নি। এতে প্রতিফলিত সমাজ জীবনের সঙ্গে সর্বভারতীয় পরিমণ্ডলের পরিবেশ সে ভাবে যুক্ত নয়। বরং বলা যায় এই কাহিনীতে আছে লোকায়ত বাংলার এক নিবিড় সম্বন্ধ। ত্রয়োদশ শাতাব্দীর প্রারম্ভে তুর্কি অভিযানের অব্যবহিত পরে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ কর্তৃক নির্যাতিত নিম্নবর্ণের অবহেলিত হিন্দুরা ইসলামধর্মের সাম্যবাদের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তরিত হয়। নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কারণে বাংলার সমাজজীবন ছিল সমস্যা জর্জরিত। পরবর্তীতে ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে সামসুদ্দীন ইলিয়াসশাহ বাংলার স্বাধীন সুলতান রাজ্য স্থাপিত করলে দেশ অনেকটা ঐক্যবদ্ধ এবং রাষ্ট্রনৈতিক অশান্তি দূরীভূত হলো। এই সময় আবার নতুন করে জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিল। আর উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজ উপলব্ধি করলেন বাইরের শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে নিম্নবর্ণের সঙ্গে একটা আপোষ দরকার। ফলে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে সংযোগ সাধনের চেষ্টা লক্ষ করা গেল। নিম্নবর্ণের পূজিত দেবতাগণ উচ্চবর্ণের দ্বারা সমাদৃত হলেন। যে অনার্য দেব-দেবীরা উচ্চস্তরে স্থান পেয়ে মঙ্গলদেবীরূপে পরিচিত হলেন, তাঁদেরই নিয়ে রচিত ও প্রচারিত মাহাত্ম্যপূর্ণ কাব্যই হল মঙ্গলকাব্য।

মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে মনসামঙ্গলই প্রাচীনতম। সর্পদেবী মনসার পূজা প্রচারের কাহিনি বর্ণনা করাই মনসামঙ্গল কাব্যের উদ্দেশ্য। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে তুর্কি অভিযানের পটভূমিকায় বাংলাদেশের উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজকে নিজেদের দুর্গ শক্তিশালী করার প্রতিক্রিয়ায় নিম্নবর্ণের অনেক আচার ও বিশ্বাসের সঙ্গে আপোষ করতে হয়েছে। উচ্চবর্ণের প্রতিভূ চাঁদ সদাগর মনসাদেবীর শত নির্যাতন, বিড়ম্বনার মধ্যেও মাথা নিচু করেননি। অবশেষে স্নেহের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে বাম হাতে মনসার পূজা দেন। আসলে অনার্য দেবতা মনসাকে কতটা অভ্যন্তর বাধা বিপত্তি এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আর্যসমাজে স্থান করে নিতে হয়েছিল এ থেকে তা বোঝা যায়। বাংলার সর্বত্রই কবিগণ এই কাহিনি অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসকার অধ্যাপক সুকুমার সেন ও অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মনসামঙ্গল কাব্যগুলিকে মূলত তিনটি ধারায় বিভক্ত করেছেন। যথা–

১) রাঢ়ের ধারাঃ এই ধারার উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন- বিপ্রদাস পিপিলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বিষ্ণু পাল।

২) পূর্ববঙ্গের ধারাঃ এই ধারার উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন- বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, দ্বিজ বংশীদাস।

৩) উত্তরবঙ্গের ধারাঃ এই ধারার উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন- তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবন মৈত্র।

৩. প্রকাশনা

আমাদের আলোচ্য দ্বিজ বংশীদাস পূর্ববঙ্গ ধারার এক প্রসিদ্ধ কবি। দ্বিজ বংশীদাস ছিলেন বাংলার সুপরিচিত কৃত্তিবাস কবি চন্দ্রাবতীর পিতা। কবির নিবাস পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাতোয়ারী গ্রাম বলে জানা যায়। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের কবি। তিনি তাঁর কাব্যের বন্দনা অংশে গোত্রাবলির শেষাংশে কাব্য রচনার যে সন তারিখ উল্লেখ করেছেন তাহলো :

> 'জলধর বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার।
> শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার।।'[২]

এ থেকে বোঝা যায়, কবি ১৪৯৭ শকাব্দে বা

১৫৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দে কাব্য রচনা করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে সর্বপ্রথম এই কবির পরিচয় দেন। প্রাচীন পালাগান সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে ময়মনসিংহ থেকে লোকমুখে প্রচলিত পালাগান সংগ্রহ করতে গিয়ে বংশীদাসের বিস্তারিত পরিচয় গ্রহণ করে 'সৌরভ' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তাছাড়া ১৩১৮ বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাসে শ্রীরামনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় বংশীদাসের 'পদ্মাপুরাণ' প্রকাশিত হয়।

৪. পদ্ধতি : লেখাটিতে বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. বিশ্লেষণ

সুদীর্ঘকাল ধরে গতানুগতিক ছকে মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হয়ে আসছিল। সেই ধারা থেকে বেরিয়ে কবিদের স্বতন্ত্র হওয়ার তেমন কোনো সুযোগ সে যুগে ততখানি ছিলনা। তা সত্ত্বেও কবিদের অভিজ্ঞতায় যুগ- পরিবেশ, সমাজ-সংস্কৃতি, আঞ্চলিকতা, ভাষা ব্যবহার, রুচিগত ভেদ সর্বোপরি চৈতন্যদেব ও পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাব তাঁদের রচনাশৈলী ও কাহিনী বয়ানে ভিন্নতা এনেছিল। আর এখানেই সৃষ্টি হয়েছে অভিনবত্বের। দ্বিজ বংশীদাস চৈতন্যত্তোর যুগের কবি। চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি তখন পাবিত। চৈতন্যের পবিত্র জীবন, তাঁর অধ্যাত্মিকভাব তৎকালীন সময়ে কবিদের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। মনসামঙ্গলধারার কবি দ্বিজ বংশীদাসও তার ব্যতিক্রমী নয়। তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সমন্বয়মূলক মনোভাব। ফলে তাঁর কাব্যের কাহিনীর মধ্যে লক্ষ করা যায়। তাইতো দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে দেখা যায় চাঁদ সদাগরের ইষ্টদেবতা শিব নয়, শিবের পত্নী চণ্ডী। নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে চাঁদ সদাগর শিবের উপাসক। দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে চাঁদ চণ্ডীর উপাসক। আর এখানে মনসার সঙ্গে চণ্ডীর বিবাদ। দেবতা ও মানবের মধ্যে তিনি কোনো বিবাদ ঘটালেন না। বিবাদ এখানে দুই দেবিতে। এমনকি চাঁদ সদাগর চণ্ডীর ভক্ত হলেও অন্য দেবতার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ নয়। তিনি যখন সনকাকে প্রথম মনসা পূজা করতে দেখলেন, তখন কোনো ক্রোধ প্রকাশ করলেন না বরং চণ্ডী ও মনসা যে অভিন্ন এই ভেবে স্তব করলেন–

'তত্ব জানি চান্দ আসি দেখে সন্নিধান।
চতুর্ভুজ ত্রিনয়নী ঘটে অধিষ্ঠান।।
করযোড়ে ভক্তিভাবে করিলেক স্তুতি।
ব্রহ্ম স্বরূপিনী তুমি আদ্যা প্রকৃতি।।
যেই দুর্গা সেই তুমি জগতের মাতা।
অভেদ চণ্ডিকা তুমি নাহিক অন্যথা।।'[৩]

বোঝা যাচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচারিত হচ্ছে। এইভাবে মনসামঙ্গলের মূল আখ্যানের মধ্যে যে সব ছোট ছোট কাহিনি আছে সেগুলোকে তিনি পাল্টে দিচ্ছেন। ফলে কাহিনি বর্ণনায় ঘটেছে অভিনবত্ব। এইভাবে আখ্যানগত দিক থেকে দ্বিজ বংশীদাসের মনসামঙ্গলকাব্যের অভিনবত্বের দিকগুলো দেখান যেতে পারে।

৫.ক. অখ্যানগত পর্যালোচনা

কাহিনি বিন্যাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে দ্বিজ বংশীদাস চারটি খণ্ডে কাহিনিকে বিস্তার করেছেন। যথা– বন্দনা অংশ, গোত্রাবলী, দেবখণ্ড, এবং মানবখণ্ড। এইভাবে খণ্ডে ভাগ করে সেগুলোকে আবার কয়েকটি পর্বে বিন্যস্ত করেছেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ চতুর্দশ পালায়, বিপ্রদাস পিপিলাই ত্রয়োদশ পালায়, বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণ দেব কয়েকটি পর্বে তাঁদের কাব্য কাহিনি বিন্যস্ত করেছেন। বন্দনা অংশে

দেখা যায় দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যের শুরুতেই রয়েছে গনেশ বন্দনা, তারপর নারায়ণ, সরস্বতী, পদ্মা, ব্রহ্মা দশ অবতারের বন্দনা এবং সর্বদেব বন্দনা দিয়ে কবি তাঁর বন্দনা অংশ সমাপ্ত করেছেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ জীবন মৈত্র তাঁদের কাব্যে চৈতন্য বন্দনা করেছেন। কিন্তু দ্বিজ বংশীদাস চৈতন্য পরবর্তী কবি হলেও আলাদা করে চৈতন্য বন্দনা করেননি।

দেবী মনসার জন্ম বিবরণ প্রত্যেক কবিই তাঁদের নিজস্ব মত অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। মূল আখ্যান বস্তু একই হলেও মনসা জন্মের বিবরণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে মনসার জন্মকাহিনী অভিনব। ব্রহ্মা ধ্যানযোগে জানতে পারলেন মহাদেব কমলের বনে এসেছেন। পারিপার্শ্বিক পরিবেশে শিবের শরীরের অংশ পাতালে নামে। ব্রহ্মা তখন শিবের লক্ষণাযুক্ত ত্রিনয়নী এক কন্যাকে কদ্রুর কোলেতে নির্মাণ করলেন–

'কদ্রুর কোলেতে জন্ম অঙ্গ নাগ।
শিবের ঔরসে জন্ম দেব অদ্ধ ভাগ।।'[৪]

অতপর মনসার বিষহরী, জয়ব্রাহ্মণী গৌরী, পদ্মাবতী নাম হওয়ার কারণও দ্বিজ বংশীদাস ব্যাখ্যা করেছেন। বিপ্রদাসের কাব্যে ডুমনী রূপী চণ্ডী মহেশকে ছলনা করার পর শিব পুষ্পবনে গমন করেন। সেখানে মনোরম পরিবেশে মহেশের মন গৌরীর জন্য ব্যাকুল হয়। তখনই 'শঙ্করের চন্দ্রটলে' সেই বীর্য পদ্মপাতে রাখলেন। পক্ষী এসে সেটা ভক্ষণ করলো। সঙ্গে সঙ্গে পক্ষীর সর্বগা জ্বালা করে উঠলে সেটা উগরে দেন। অতপর বাসুকি নির্মাণের কাছে আনলে তিনি সুন্দরী কন্যা নির্মাণ করে নাম দেন মনসা। এই একই ঘটনা কেতকাদাসের কাব্যেও দেখা যায়। তবে তিনি জানিয়েছেন মনসার জন্ম পদ্মবনে নয়, কেয়াবনে। এই জন্য তাঁর অপর নাম কেতকা। মহাদেবের অংশ পদ্মপাত্রে রাখা ও পক্ষীর ভক্ষণের ঘটনা কবি বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণ দেবের কাব্যেও বর্ণিত হয়েছে। সেদিক থেকে দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে মনসার জন্মকাহিনী অভিনব।

শিবের 'পুষ্পবাড়ি গমন প্রসঙ্গ' মনসামঙ্গল কাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেক কবিই এই প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। নারায়ণ দেবের বর্ণনা থেকে জানা যায়-শিব চণ্ডীকে 'নিদ্রালী' দিয়ে পুষ্পবনে চলে গেলেন। বিজয় গুপ্তের কাব্যেও শিব অস্থির চিত্তে পুষ্পবনে যাবার জন্য উদগ্রীব হলেন। কিন্তু চণ্ডী তাকে একা পুষ্পবনে যেতে নিষেধ করলেন। রাত্রে আঁচলে গিঁট বেঁধে দুজনে শুয়ে পড়লে, শিব চণ্ডীকে নিদ্রালা দিয়ে পুষ্পবনে চলে গেলেন। আর দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে শিব মহামায়াকে নিদ্রায় আচ্ছন্ন রেখে চলে গেলেন। এক্ষেত্রে মানস বাসনা ছিল একটি কন্যা সন্তানের :

'চলিলেন ত্রিপুরারি নিদ্রায় ছাড়িয়া গৌরী
পুষ্পবাড়ী কমলের বনে
দেবের স্বাধীন কম্ম পুত্র হৈল আনুপাম
কন্যা হৈতে আকিঞ্চন মনে।।'[৫]

চণ্ডী-মনসার দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গটিও মনসামঙ্গল কাব্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মনসামঙ্গলের কবিরা এই প্রসঙ্গে গতানুগতিকভাবে অনুসরণ করলেও দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে অভিনবত্বের সূচনা হয়েছে। দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে পুষ্পবন থেকে ফিরে পুষ্পের করণ্ডীতে পদ্মাকে লুকিয়ে রেখে শিব অন্যত্র যাত্রা করেন। চণ্ডী করণ্ডীর মধ্যে পরমা সুন্দরী কন্যাকে দেখে সতীন সন্দেহে মারধর করতে থাকেন। তখন পদ্মা বলেন :

'পদ্মা বলে ছাড় সতাই বড় দুঃখ পাই।
শঙ্কর আমার বাপ তুমি সে সতাই।।
পদ্মাবন হতে পিতা আনিয়াছে ঘরে।'[৬]

এতে চণ্ডী আশ্বস্ত না হলে গঙ্গা চণ্ডীর নিন্দামন্দ শুরু করে। চণ্ডীকে গঙ্গার আশার বাণী শোনানোর বিষয়টি বংশীদাসের কাব্যে অভিনব। তাছাড়া দেখা যায় বংশীদাসের কাব্যে দারুণ ক্রোধের সময় দেবী আঙুলের নখাঘাতে চোখ কানা করেন–

'এতবলি কোপে চণ্ডী না করিল আন।
নখাঘাতে করি বামচক্ষু কৈল কাণ।।'[৭]

অপরপক্ষে তন্ত্রবিভূতি ও জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে চণ্ডী আঙুলের খোঁচায় মনসার চোখ কানা করেছেন। কেতকাদাসের কাব্যে চণ্ডী মনসার বামচক্ষু নষ্ট করেন 'দাহন অঙ্গারে'। বিপ্রদাস ও বিষ্ণু পালের কাব্যে কুশের আঘাতে।

মনসার বিবাহ-বিচ্ছেদ ও জরৎকারু মুনি কর্তৃক পরিত্যাগের কাহিনি অংশে দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে দেখা যায়, বিবাহের পর একদিন মনসার উরুতে জরৎকারু মুনি দিবানিদ্রা ছিলেন। তখন কালীনাগের ফণায় সূর্য হঠাৎ ঢাকা পড়ে যায়। মনসা সন্ধ্যা হয়ে গেছে ভেবে স্বামীকে জাগিয়ে দেন। পরক্ষণেই আকাশ পরিষ্কার হয়। তখন জরৎকারু মুনি ক্রোধে মনসাকে পরিত্যাগ করে চলে যান–

'জাগিয়া পদ্মারে মুনি বলে কোপমনে।।
অকারণে সুখভঙ্গ করিলা আমার।
তোমাতে বিদায় আমি কহি কথা সার।।'[৮]

বিজয় গুপ্তের কাব্যে জরৎকারু মুনি মনসাকে তাঁর পূজার সামগ্রী একত্রিত করতে বললে মনসা ক্রোধিত হয়ে ওঠেন। এরপর মুনির দিকে বিষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে মুনি তাতেই ঢলে পড়েন। শিবের আদেশে মুনিকে পুনরায় মনসা জীবিত করেন বটে কিন্তু মুনি চেতনা পেয়ে পদ্মাকে পরিত্যাগ করে যান। বিপ্রদাসের কাব্যে মনসা বাসর সজ্জায় চণ্ডীর উপদেশে সর্প সজ্জায় ভূষিত হয়ে গেলে মুনি ভয়ে পালিয়ে যান। কেতকাদাসের কাব্যে মুনির সঙ্গে বাসর রাত্রি যাপনের সময় চণ্ডী মায়াভেক সৃষ্টি করে সেখানে প্রেরণ করেন। ভেকের হিস হিস শব্দ শুনে ছুটে এল মনসার সাপের দল। মুনি ভয়ে পালিয়ে গেলেন।

চাঁদ মনসার বিবাদের ক্ষেত্রেও দ্বিজ বংশীদাস কিছু কিছু নতুন তথ্য সংযোজনের চেষ্টা করেছেন। যেমন- বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে বর্ণিত আছে চাঁদের প্রতি ক্রোধে মনসা নিজেই ক্ষুর দিয়ে বণিকের গুয়াবাড়ি ধ্বংস করেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে বর্ণিত আছে মনসা স্বয়ং নয়, তাঁর নির্দেশে হনুমান এই কাজটি সমাধা করেছিল। আর আমাদের আলোচ্য দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে দেখা যায়–

'মনুষ্য শরীর ধরি সর্প রূপএড়ি।
কুড়াল হাতে লৈয়া কাটে বাগোয়ন বাড়ি।।'[৯]

আবার নেতার হরিণ বেশে চাঁদকে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাও দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে অভিনব। এই অংশের কাহিনি বর্ণনায় তিনি রামায়ণ কাহিনির আশ্রয় নিয়েছেন। রামায়ণে যেমন মারিচের মায়ায় রামচন্দ্র বন থেকে বনান্তরে ছুটে বেড়িয়েছেন, তেমনি এখানে নেতা ছদ্মবেশে চাঁদকে বন থেকে বনান্তরে ঘুরিয়ে পদ্মার নিকট হাজির করেছেন। ফলে আলোচ্য অংশটি পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে।

দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে চাঁদের ছয় পুত্রের মৃত্যুর কাহিনি অভিনব। কেননা কেতকাদাসের কাব্যে দেখা যায় মনসার কোপে ধন্বন্তরি ওঝা মরল। তবুও চাঁদ মনসার পূজা করেননি। তখন নেতার সঙ্গে যুক্তি করে বিঘতিয়া নাগকে পাঠান চাঁদ সদাগরের বাড়িতে অন্নে বিষ মেশাতে। বিঘতিয়া নাগ অন্নে বিষ উগরে দিলে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় একই সঙ্গে ছয় পুত্রের

মৃত্যু ঘটে–

'বিঘতিয়া গেল তথা দেবীর বচনে।
উগরিল কালকূটি ওদন ব্যঞ্জনে।।
মধ্যাহ্নের কালে ভুঞ্জে তনয় সকল।
ছয় পুত্র মৈল তার খাইয়া গরল।।'[১০]

বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই ও জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে একই সঙ্গে মনসা চাঁদের ছয় পুত্রের মৃত্যু ঘটিয়েছেন। দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে এক্ষেত্রে মনসা এক এক করে ছয়টি নাগকে দিয়ে চাঁদের ছয় পুত্রকে দংশন করিয়েছেন–

'চান্দর প্রধান পুত্র নাম শ্রীকর।
বাহির খণ্ডেতে বসি থাকে নিরন্তর।।
ধামলা আসিয়া বৃদ্ধ বিপ্র রূপ ধরি।
পুষ্পমালা হাতে দিল আশীর্বাদ করি।।
ভ্রমরের রূপ হৈয়া পুষ্পে থাকি নাগে।
শোঁকিতে কামড় দিল নাসিকার আগে।।'[১১]

দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে বাসর ঘরে লক্ষ্মীন্দর বেহুলার কথোপকথনে আমরা ব্রাহ্মণ কুমারের মৃত্যু কাহিনি বর্ণনার বিষয়টিও অন্য কোনো মনসামঙ্গলে পাইনা। লক্ষ্মীন্দর জানে আজ রাতেই তাঁর জীবন সংশয়। সে বেহুলাকে বোঝায় যদি কাল তাকে নেয়, তাহলে এই লোহার বাসর, প্রহরী কিছুই করতে পারবে না। এক্ষেত্রে দ্বিজ বংশীদাস এক ব্রাহ্মণ কুমারের কাহিনি বেহুলাকে শুনিয়েছেন। অকালে ব্রাহ্মণের পুত্রের মৃত্যুর ফলে ব্রাহ্মণ দ্বারকাতে কৃষ্ণের সভায় উপস্থিত হলেন। শোকাকুলে অভিভূত হয়ে তিনি জানান এই অধার্মিকের দেশে আর বাস করতে চাননা–

'হেন অধাম্মিকের দেশে না করিব বাস।
অকালেতে পুত্র মোর হৈল বিনাশ।।'[১২]

তখন ব্রাহ্মণের দুঃখ দেখে অর্জুন নিজে ব্রাহ্মণের পুত্রের রক্ষার ভার নিলেন। যদি তিনি তা না পারেন তাহলে যদুবংশে এই দুর্বল শরীর আর রাখবেন না। ব্রাহ্মণ নির্ভয়ে রইলেন। অতপর পুনরায় ব্রাহ্মণীর গর্ভে পুত্র জন্মাল। অর্জুন স্বয়ং এসে শরজালে চারিদিকে আচ্ছন্ন করে রাখলেন। তবুও কাল পুত্রকে হরণ করে নিল। তখন এই গল্পের শেষে লক্ষ্মীন্দর বেহুলাকে বলেন–

'এই মতে সুরাসুর যতেক সংসার।
কাল পূরিলে প্রিয়া কে রাখিতে পারে।।'[১৩]

এই কাহিনী আমরা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাসের কাব্যে পাইনা।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাসের কাব্যে আমরা লক্ষ করি ভেলা দেবপুরের নিকটে এলে বেহুলা নেতা ধোপানীর সঙ্গে আত্মীয়তা করতে। ফলে বেহুলার পক্ষে সহজ হয়েছিল দেবপুরে দেবতাগণের কাছে যেতে। নেতা তাকে দেবপুরের দেবতাগণের নিকট হাজির করেন। এই নেতা ধোপানীর কাহিনি বংশীদাসের কাব্যে নেই। বেহুলা এখানে দেবপুরের নিকট এলে সম্মুখে এক সেতু দেখতে পান। এটার নাম ধর্মসেতু। দুই দিকে দুটি শোলার খুঁটি, উপরে এক গাছি চুল, নিচে গভীরতর খাদ। সরু চুলের উপর দিয়ে হেঁটে আপন ধর্মবলে এই সেতু পার হয়ে দেবসভায় হাজির হয়েছিলেন বেহুলা–

'কি মতে সাঁকোতে হৈবা পার।
দুকূলে শোলার খুঁটি কেশের উপর হাঁটি
পরিলেত না দেখি নিস্তার।।'[১৪]

চাঁদ কর্তৃক মনসার পূজা করবার বিষয়টিও অভিনব। সাত পুত্রসহ চোদ্দডিঙ্গা ফিরে পাবার পর পাত্রমিত্র সকলে মিলে চাঁদকে মনসার পূজা করবার উপদেশ দেন। চাঁদসদাগর পূজায় মনস্থ করেন। এই বিষয়টি

বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেখা যায় যে, চাঁদ কিছুতেই মনসা পূজা করতে রাজি নয়। কিন্তু সনকা যখন স্নেহভরে বেহুলাকে আদর করে বুকে ডেকে নিলেন, তখন স্নেহের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে বাম হাতে পূজা দিতে রাজি হয় চাঁদসদাগর–

'বাম হস্তে পূজা আমি করিব তাহান'[১৫]

বিপ্রদাসের কাব্যে দেখা যায় বেহুলা মনসাকে জানায় যে সপ্ত ডিঙ্গা যদি চাঁদসদাগরের আঙিনায় হাজির করে তাহলে চাঁদ মনসাকে পূজা করবেন। তখন মনসার নির্দেশে সাত নাগ সাত ডিঙ্গা চাঁদের দরবারে হাজির করেন। বেহুলা চাঁদসদাগরকে জিজ্ঞাসা করে তার মনে কিছু সংশয় আছে কিনা। তখন চাঁদসদাগর বলে ওঠেন–

'চাঁদো বলে আইস ঘরে সর্ব পরিবার।
পূজিব মনসা পদ বিবিধ প্রকার।।'[১৬]

কেতকাদাসের চাঁদ এক্ষেত্রে অনেকটা দ্বিধাগ্রস্ত। এত দিনের সংস্কার যেমন তিনি সহজেই বিসর্জন দিতে পারছেন না, তেমনি আবার এত লাঞ্ছনার পরেও সব কিছু নতুন করে ফিরে পাবার উচ্চাশা। ফলে অনেকটা দ্বিধাগ্রস্তভাবে তিনি মনসার পূজা দেন–

'সাবিত্রী সমান হৈল পুত্রবধূ মোর।
ঘরেতে পাইলু বস্যা চৌদ্দ মধুকর।।
হেন মনসার পূজা নাঞি করি যদি।
বিপাকে হারাই পাছে পায়্যা পঞ্চনিধি।।'[১৭]

আর দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে দেখা যায় চাঁদ মনসার পূজা করতে অস্বীকার করলে পাত্র-মিত্র সকলে পদ্মা পূজার পরামর্শ দেন। চাঁদ তখন চণ্ডীকে স্মরণ করে। চণ্ডী তাকে জানায় পদ্মা ও চণ্ডীর অভিন্নতার কথা। আর এখানেই তিনি কাহিনিতে আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন–

'চান্দরে স্মরণে চণ্ডী কৈলা অধিষ্ঠান।
চান্দরে বলয়ে পুত্র না ভাবিও অন।।
যেহি পদ্মা সেহি আমি জানিও নিশ্চয়।
পদ্মা পূজা কর পুত্র না ভাব বিস্ময়।।'[১৮]

এক্ষেত্রে খানিকটা বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। এইভাবে টুকরো টুকরো কাহিনীগুলোকে দ্বিজ বংশীদাস পরিবর্তন করে কাহিনি বয়ানে অভিনবত্বের সূচনা করেছেন।

৫.খ. চরিত্র-চিত্রণ পর্যালোচনা

এবার আমরা চরিত্র চিত্রনের দিকে আলোকপাত করতে পারি। চরিত্র চিত্রনে দ্বিজ বংশীদাস গতানুগতিক কাহিনির মধ্যেও কোনো কোনো স্থানে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। সমগ্র কাব্যে চাঁদ সদাগর চরিত্র অভিনব। দ্বিজ বংশীদাসের মতে চাঁদ পূর্বজন্মে পশুসখা নামে এক তপস্বী ছিলেন। একদিন গঙ্গা তীরে তপস্যাকালে তিনি দেখলেন, দুটি পাখির শাবক স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। তখন দয়াবশত তপস্বী তাদের তুলে এনে লালন-পালন করতে লাগলেন। একদিন তপস্বীর অনুপস্থিতিতে একটি সাপ এসে পাখির শাবক দুটিকে ভক্ষণ করলো। এই শোকে দুঃখকে জর্জরিত হয়ে তপস্বী কাম্যতীর্থে গিয়ে দেহত্যাগ করলেন। আর মনে মনে কামনা করলেন– 'মুঞি হব সর্পের বৈরী'। চাঁদ সদাগরের এই জন্ম কাহিনী নিয়ে বেশির ভাগ কবিই নীরব থেকেছেন। দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে প্রথমে চাঁদের মনসা পূজায় কোনো আপত্তি ছিলনা। কিন্তু চণ্ডী তাঁকে স্বপ্নে তাঁর পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মনসা পূজা করতে নিষেধ করেন। তাই এখানে দেবতা ও মানবের মধ্যে কোনো বিবাদ নেই, বিবাদ ঘটেছে দুই দেবিতে। আর এইজন্যই চাঁদসদাগর চরিত্র নির্মাণে তিনি যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। চাঁদের কঠোরতা তিনি একবিন্দু হ্রাস হতে দেননি। লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যুর

পর সনকার মাতৃহৃদয় হাহাকার করে উঠলেও চাঁদসদাগর পুত্রের মৃত্যুতে হাহাকার করে ওঠেননি। চাঁদসদাগর দৃঢ়চিত্তে অটল থেকেছেন। এই সময়ে তাঁর উক্তিতে দ্বিজ বংশীদাস নতুনত্ব দেখিয়েছেন। যা অন্যকোনো মনসামঙ্গল কাব্যে আমরা দেখতে পাইনা। লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যুতে চাঁদ সদাগর বলেন–

'চান্দ বলে মরা পুত্র সাগরে ভাসাও।
পুত্র মৈল তার সঙ্গে কলা দিব ফাও।।
এক ছড়া কলা বেচিমু নও বুড়ি।
কোন দোষে দিব আমি হেন কলা ছাড়ি।।
লক্ষ্মীন্দর পুত্র মৈল তারে গায়ে সয়।
কলাগাছ কাটাগেলে পরাণ সংশয়।।'[১৯]

শিব চরিত্র অঙ্কনেও দ্বিজ বংশীদাসের যথেষ্ট কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা বিপ্রদাসের কাব্যে দেখা যায়-স্ত্রী মারা যাওয়াতে শিবের কাছে সমাজ-সংসার বাস্তবতা সবকিছু মরীচিকা বলে মনে হয়েছে। স্ত্রীর হারার বেদনায় তিনি সিক্ত। শোক কাটিয়ে ওঠার মানসিকতাটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছেন। তন্ত্রবিভূতির শিবও স্ত্রী হারার বেদনায় মাথায় হাত দিয়ে কান্নায় আকুল হয়েছে। বিজয় গুপ্তের কাব্যেও আমরা একই শিবকে লক্ষ করি। তুলনায় দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে শিব অনেকটা আত্মনির্ভর এবং কৌশলী। তিনি কন্যা মনসাকে মাথার দিব্যি দিয়ে বলেন যদি পিতার প্রতি তাঁর ভালোবাসা থাকে তাহলে শীঘ্রই যেন সৎমাকে জীবিত করে দেন। এত করেও যখন কোনো কাজ হলনা তখন স্বেচ্ছায় নিজের মৃত্যু বরণের ভয় দেখান–

'যদি মোরে জিতে সাধ ক্ষম চণ্ডী অপরাধ
জিয়াও তোমার সত মাতা।।'[২০]

দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে মনসা চরিত্র ততটা ঈর্ষাপরায়ণ নয়। এখানে জরৎকারু মুনি মনসাকে সামান্য দোষে ত্যাগ করে চলে যান। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মনসা একথা ভেবে বারবার অচেতন হয়ে পরেছেন। স্বামী ছেড়ে যাওয়ার কথা শুনে মনসা নানান ভাবনায় ভাবিত হয়েছেন–

'পতি ধন পতি প্রাণ পতি সে নারীর দেষ
পতি বিনে নাহিক উপায়
তুমি প্রভু সুপুরুষ অবলা নারীর দোষ
একবার ক্ষমিতে যোয়ায়।।'[২১]

অপরদিকে বিপ্রদাস, তন্ত্র বিভূতির কাব্যে মনসা স্বামীর কথা ভেবে এত আকুল নয়। বরং এদের সৃষ্ট মনসা স্বামী পরিত্যাগের পর সমাজ– সংসারের কঠিন দিনগুলি কীভাবে কাটাবেন সেই ভাবনায় মশগুল থেকেছেন। বিজয় গুপ্তের মনসা নিজের দুঃখময় জীবনের কথা নিজেই বর্ণনা করেছেন এইভাবে–

'পূর্বজন্মে করিলাম পাপ তে কারনে এত তাপ।
প্রভু মরে ছাড়িয়া যায় বনে।।'[২২]

দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে বেহুলা চরিত্রও তেজস্বিনী। মনসা ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে বেহুলাকে অভিশাপ দিলে, বেহুলা প্রত্যুত্তরে বলেন–

'আপনি বিধবা হৈলা নিজ কম্ম দোষে।
অন্যে শাপ দিতে মুখে লজ্জা নাহি আসে।।'[২৩]

তাছাড়া তাঁর বেহুলা চরিত্রও অন্য কাব্য থেকে পৃথক। তাঁর কাব্যে বেহুলা পরীক্ষা দিতে রাজি হয়ে প্রথমে পটের শাড়ি পরে জ্বলন্ত আগুনের মধ্য দিয়ে হাঁটে। তারপর মুনিদের সামনে গরম ঘিয়ের পাত্র থেকে সোনার আংটি তুলে নিয়ে আসে। এমনকি মুনি ঋষিদের কথা মত লোহার উত্তপ্ত খণ্ড হাতে নেয়। তারপর চাঁদসদাগরের আদেশে বেহুলা তুলা পরীক্ষা করেন। তুলা পরীক্ষা দিয়ে তিনি উপরের দিকে চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে পদ্মার রথ বেহুলাকে

নিতে মাটিতে অবতীর্ণ হয়। তখন বেহুলা সেই রথে চেপেই মনসার সঙ্গে স্বর্গে গমন করেন।

সনকা চরিত্রটিও মানবরসে সমৃদ্ধ। মনসার পূজা করলে সনকাকে চাঁদ প্রায়শ্চিত্ত করান। সনকা কোনো প্রতিবাদের ভাষা পাননি। এমনকি ছয় পুত্রের মৃত্যুতেও সনকা চাঁদকে মনসার সঙ্গে বিবাদ করতে নিষেধ করেন।

৫.গ. ভাষা ব্যবহার

ভাষা ব্যবহারেও বংশীদাস অভিনবত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। মনসামঙ্গলের অনেক কবিই অনায়াসেই অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছেন। সেই সব স্থানেই দ্বিজ বংশীদাস অতিসুন্দর ভাবে ভাষা পরিবেশন করেছেন। যেমন- 'শিবের পুষ্প বাটী প্রস্থান ও মহামায়ার মায়া' অংশে ডোমনীকে শিব ঘরে নিয়ে গেলে, আলোচ্য অংশের বর্ণনা নারায়ণ দেব দিয়েছেন–

'কামে হত সিব তবে আর নাহি মন।
হাতে ধরি ডুমুনিরে দিলা আলিঙ্গন।।
উনমত হইয়া দুই জনের আরতি।
কোলি কলা কুতুহলে ভুঞ্জিল ছুরতি।।'[২৪]

বিজয় গুপ্তের কাব্যে আছে-

'ব্যাঘ্র্যচর্ম্ম পাতে শিব ডিঙ্গার উপর।
ঘন চাব দেয় শিব গায়ে করি জোর।।'[২৫]

আর এই ঘটনাটিকেই দ্বিজ বংশীদাস সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন, তা দেখা যেতে পারে–

'পাপ কম্মের ফলে প্রভু মোরে ছাড়ি গেলে
কোন দেশে কিছুই না জানি।।
যদি জানি হেন হৈব আমা ছাড়ি শিব যাইব
বলদ রাখিতু যত্ন করি।।'[২৬]

দ্বিজ বংশীদাসের এই সহজ সরল সুন্দর ভাষা ব্যবহারের জন্যই জনপ্রিয়তার অভাব ছিলনা। তাইতো আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন- 'সহজ নিরলঙ্কার ভাষায় ব্যক্ত মনের গভীর ভাবটি পাঠকের মর্মতলে স্পর্শ করে। ভক্ত সাধকের দৃষ্টির সঙ্গে সহজ কবিত্বের শুচিদৃষ্টি মিলিত হইয়া তাঁহার কাব্যে মণিকাঞ্চন যোগে সৃষ্টি করিয়াছে।'[২৭]

উপসংহার

এইভাবে সার্বিক পর্যালোচনা করে বলা যেতে পারে যে মনসামঙ্গলের ছোট ছোট আখ্যানগুলিকে তিনি নিজের মতো পাল্টে দিয়েছেন। ফলে মনসামঙ্গলের গতানুগতিক কাব্য কাহিনিতেও দ্বিজ বংশীদাস নিজস্বতার স্বাক্ষর রেখেছেন। মূল আখ্যানের মধ্যে থেকেও তিনি সূচনা করতে চেয়েছিলেন মনসামঙ্গল কাব্য ধারায় অভিনবত্ব। আমরা বলতে পারি সে কাজে তিনি অনেকটাই সফল হয়েছেন।

তথ্যসূত্র

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৮
২. শ্রীরামনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত বংশীদাস বিরচিত পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৪
৩. তদেব, পৃ. ১৯৩
৪. তদেব, পৃ. ১১৫
৫. তদেব, পৃ. ১০৩
৬. তদেব, পৃ. ১২৮
৭. তদেব, পৃ. ১২৮
৮. তদেব, পৃ. ১৫৩
৯. তদেব, পৃ. ১৯৭
১০. অক্ষয় কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা), মনসামঙ্গল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত, পৃ. ১৮৭
১১. শ্রীরামনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্তী, সম্পাদিত বংশীদাস বিরচিত পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২৭৬

১২. তদেব, পৃ. ৫৪৩

১৩. তদেব, পৃ. ৫৪৪

১৪. তদেব, পৃ. ৫৯৫

১৫. শ্রী জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত (সম্পা), কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৫৩৫

১৬. অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা), বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল, পৃ. ৪৭২

১৭. অক্ষয় কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা), মনসামঙ্গল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত, পৃ. ২৯০

১৮. শ্রী রামনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্তী, সম্পাদিত বংশীদাস বিরচিত পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৬৪৫

১৯. তদেব, পৃ. ৫৫২

২০. তদেব, পৃ. ১৩০

২১. তদেব, পৃ. ১৫৬

২২. শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত (সম্পা), কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৫৩৫

২৩. শ্রীরামনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত বংশীদাস বিরচিত পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪৬০

২৪. শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত (সম্পা), সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১২

২৫. শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত (সম্পা), কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৩৯

২৬. শ্রীরামনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত বংশীদাস বিরচিত পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১০৪

২৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, পৃ. ২৮১

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থ

১. শ্রীরামনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত বংশীদাস বিরচিত পদ্মাপুরাণ, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স, বৈশাখ, ১৩১৮

২. অক্ষয় কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা.), মনসামঙ্গল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত, লেখাপড়া, কলিকাতা, ১৩৮৪

৩. শ্রী জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত (সম্পা.), কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯

৪. অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা.), বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল, রত্নাবলী, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০১৫

৫. শ্রী তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত (সম্পা.), সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১

সহায়কগ্রন্থ

১. অমিতাভ গোস্বামী, মঙ্গলকাব্যে লোক জীবন ও লোক ভাবনা, সোপান পাবলিশার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০০

২. শেখর দেবরায়, মনসাকথা, নবচন্দন প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০০২

৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড), মডার্ন বুক এজেন্সি প্রা: লি: কলকাতা, পুনমুদ্রণ, ২০১৪-২০১৫

৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা: লি:, প্রথম যৌথ প্রকাশ, মে ২০১৫

৫. নারায়ণ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ধারা, হাউস অফ বুকস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৭

৬. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা (২য় খণ্ড), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, মার্চ ১৯৬৫

৭. জয়া সেনগুপ্ত, মনসামঙ্গলকাব্যে সামাজিক পটভূমি ও নারী, বড়াল প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০

৮. গোপাল হালদার, বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (১ম খণ্ড), অরুণা প্রকাশনী, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৪৯৯

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-2, December 2020
pp· 67-82

পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় জন-জ্ঞান বা এলাকাবাসীর ঐতিহ্যিক ধারণা

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের নিম্নাংশ-বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকাবাসীর প্রথাগত ধারণা ও চর্চা

গৌরাঙ্গ নন্দী

গৌরাঙ্গ নন্দী
ব্যুরো প্রধান
দৈনিক কালের কণ্ঠ, খুলনা ব্যুরো
বাংলাদেশ
e-mail : gouranga.nandy@gmail.com

সারসংক্ষেপ

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকায় ব-দ্বীপ হিসেবে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের নিম্নাংশ বলা হয়। এখানে জনবসতির ইতিহাস বেশিদিনের নয়; আবার এই এলাকার ভূমিগঠন প্রক্রিয়া সমাপ্ত না হওয়ার আগেই এখানে বসতি শুরু হয়। এলাকাটিতে ছিল অসংখ্য নদী। স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে উত্তর-দক্ষিণমুখীর পরিবর্তে পশ্চিম-পূর্বমুখীও নদী ছিল। মূলত এগুলো জোয়ারের নদী বা সাগর থেকে উঠে আসা বা সাগরের পানি প্রবাহিত নিয়ন্ত্রিত নদী। এই নদীর পানি নোনা, তবে বছরের বারো মাস নদীর পানি নোনা থাকে না। সাধারণত ডিসেম্বরের শেষের দিক হতে জুন-জুলাই মাস পর্যন্ত নদীতে নোনা থাকে, যা বর্ষা এলে কমতে থাকে এবং এক পর্যায়ে একেবারে কমে যায়। এপ্রিল-মে মাসে নদীর পানিতে লবণাক্ততার মাত্রা সর্বোচ্চ পর্যায়ে ওঠে। এই অঞ্চলে মিষ্টি পানির উৎস গঙ্গা, পদ্মা ও গড়াই প্রবাহ। মিষ্টি ও নোনা পানির এই সংমিশ্রণের ফলে এখানে ঈষৎ নোনা-ভূমির অঞ্চল, ইংরেজিতে যাকে ব্রাকিশ ওয়াটার জোন গড়ে তোলে। এই ভূ-তত্ত্বীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে এখানে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট বাদাবন গড়ে উঠেছে। অঞ্চলটিকে তাই ম্যানগ্রোভ ইকোলজির এলাকাও বলা হয়। পলি অবক্ষেপিত হয়ে নদীর পাড়ে জমা হতো বিধায় এখানকার নদীর পাড় উঁচু, নদী অপেক্ষা দূরবর্তী এলাকা ক্রমান্বয়ে নীচু, যেখানে বৃষ্টির পানি জমা হতো, বিল এলাকা বলে চিহ্নিত ছিল। নদী-পাড়েই এখানকার বসতি গড়ে ওঠে। বিলভূমিতে মাছ ও ধান চাষই ছিল এখানকার প্রধান জীবিকা। যেহেতু বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় নদীতে নোনার আধিক্য দেখা দিতো এবং ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের দাপট ছিল, তাই মানুষ ওই সময়ে নদীর পাড় ঘেঁষে বাঁধ দিতো, যা ষষ্ঠ বা অষ্টমাসী বাঁধ নামে পরিচিত ছিল। এই বাঁধ এলাকাবাসী সম্মিলিত চেষ্টায় দিতো, রক্ষণাবেক্ষণ করতো। ধীরে ধীরে বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণে একটি অভিজ্ঞ গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, যাদেরকে সানা বলা হতো। পরে ওইসব দক্ষ মানুষদের পদবী সানা হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই অস্থায়ী বাঁধের সবচেয়ে বড় সুবিধা ছিল নোনা পানি প্রতিরোধ, জলোচ্ছ্বাস হতে বসতি রক্ষা পেতো, আবার নদী দিয়ে আসা পলি নদী-খাল দিয়ে বিলে প্রবেশ করে নীচু ভূমিতে

অবক্ষেপিত হয়ে ভূমি গঠনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি বজায় থাকতো। ১৯৬০এর দশকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় স্থায়ী মাটির বাঁধ তৈরি করা হলে নদী সংকুচিত হয়, অবাধ জোয়ার-ভাটা, পলি অবক্ষেপন বাধাপ্রাপ্ত হয়। অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে পলি বিলের মধ্যে যেতে না পেরে নদীতে জমা হয়ে নদীর বুক উঁচু হতে বা শুকিয়ে, মরে যেতে শুরু করে; বিপরীতে বিল এলাকার পানি নিষ্কাশিত হতে না পেরে জলাবদ্ধতা দেখা দিতে শুরু করে। সময়ের সাথে সাথে জনবসতি বেড়েছে, রাস্তা-ঘাট হয়েছে, অবাধ পানি চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে খুলনা-যশোর-সাতক্ষীরা এলাকার বিশাল এলাকার স্থানে স্থানে জলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান বা পাউবো (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড) প্রকৌশলগত ধারণার উপর ভিত্তি করে একের পর এক প্রকল্প রূপায়িত করছে; কিন্তু জলাবদ্ধতা মুক্ত হচ্ছে না। মানুষের দুর্ভোগ দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হচ্ছে। দুর্ভোগে পড়া মানুষেরা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বলছে, প্রকৌশলগত (বাঁধ, স্লুইস গেইট প্রভৃতি) জ্ঞানের আলোকে নেয়া কার্যক্রমগুলো এই অঞ্চলের সমস্যা সমাধান করতে পারবে না; এই অঞ্চলের জলাবদ্ধতা দুর্যোগ সমাধানে জোয়ারের পানি ব্যবস্থাপনা বা টিআরএম (টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্ট)-এর মাধ্যমে নদীকে কাজে লাগিয়ে পলি বিল-ভূমিতে অবক্ষেপিত বা জমতে দিতে হবে; যে প্রক্রিয়ায় ভূমি উঁচু হবে, এলাকা জলাবদ্ধতা মুক্ত হবে। এই প্রবন্ধে এলাকার বসতির ইতিহাসের আলোকে জনগণের এই দাবি (টিআরএম) ও প্রকৌশলগত ধারণা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মূলশব্দ

পলি, অবক্ষেপন, বিল-ভূমি, নদী-বাঁধ, টিআরএম (টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্ট), পোল্ডার

১. ভূমিকা

উপকূলীয় ব-দ্বীপ হিসেবে বাংলাদেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ঐতিহাসিক পরম্পরা হতে বিচ্ছিন্ন নয়। পাশ্চাত্যের বহু পণ্ডিত ও গবেষক বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশকে এককথায় Hydraulic State হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই ধারণার পিছনে তাঁদের যুক্তিগুলোর অন্যতম হচ্ছে, স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনার ধারাটি গড়ে ওঠেনি; বিপরীতে কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীর মাধ্যমে সৃষ্ট আমলাতন্ত্র বা বড় ভূস্বামীর (জমিদার বা জায়গীরদার) মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনার ইতিহাস মোঘল আমল থেকে বিনা বিতর্কে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়েছে। মোগল আমলে প্রাদেশিক সরকারের তত্ত্বাবধানে বাঁধ, জলমহল, নদী ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয়েছে। এজন্য প্রাদেশিক সরকারের আলাদা বরাদ্দও ছিল। সাধারণ ভাষায় এই প্রক্রিয়ায় ফুলবান্দি দপ্তর ও পুস্তাবান্দি বলে দুটি শাখা চিহ্নিত করা হয়। ফুলবান্দি দপ্তরের সকল কাজ স্থানীয় জমিদার শ্রেণির হাতে ন্যস্ত ছিল। জমিদাররা ইচ্ছা করলে স্থানীয় পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য রায়তের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করতে পারতেন। সড়ক ও বাঁধ সংরক্ষণের পাশাপাশি সেচ সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্যোগও ছিল।[১] কালজয়ী দার্শনিক কার্ল মার্কস ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সেচ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। তার এই

পর্যবেক্ষণ চূড়ান্ত বিশ্লেষণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভূমি ও অন্যান্য সম্পদের মালিকানার পার্থক্য তুলে ধরে।[২] বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ভূমি ও পানির কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। অন্যকথায়, ভূমি ও পানি কোনো বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে চালু ছিল না। পানি একটি প্রাকৃতিক সম্পদ হলেও তার মালিকানার দাবিদার ঐতিহাসিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকার। এই সত্যের সবচেয়ে নিকটতম উদাহরণ হচ্ছে সাম্প্রতিককালে জাতীয় পানি নীতি বা National Water Policy. জাতীয় পানি নীতিতেও বাংলাদেশের পানির উৎস প্রাকৃতিক হলেও তার উপর সার্বভৌম মালিকানার দাবিদার রাষ্ট্র।[৩]

মোগল আমলে পানি ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের অংশগ্রহণ। যদিও এই গ্রাম পঞ্চায়েত উচ্চবর্ণের ও উচ্চ শ্রেণির মানুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত, তথাপি কাল পরম্পরায় অর্জিত লোকজ জ্ঞান প্রয়োগের সুযোগ মোগল আমলে রায়তের জন্য উন্মুক্ত ছিল কিন্তু পানির উপর জনগণের কোনো মালিকানা ছিল না।[৪]

ব্রিটিশরাজ পানি ব্যবস্থাপনার তৃণমূল পর্যায়ে এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত করে। হাজার বছরের ঐতিহ্যে অর্জিত পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে লোকজ জ্ঞানের পরিবর্তে ইউরোপে পরিচালিত ধ্যান-ধারণার প্রয়োগে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র তাই নয়, তারা বাংলাদেশে রেল যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে যদিও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল, কিন্তু তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনায়।[৫] তবে ব্রিটিশরাজ নদীসমূহের পানি নিষ্কাশনের ও নাব্য বজায় রাখার জন্য কিছুটা সচেষ্ট ছিল।

বলাই বাহুল্য যে, পানি, ভূমি ও মানুষ এই তিন সম্পদের সমন্বিত সময়োপযোগী উন্নয়ন কৌশল বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। ব্রিটিশরাজের আমলে যেমন মহাজন শ্রেণির দৌরাত্ম প্রকট ছিল, তেমনি ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের ইস্পাতকঠিন আমলাতন্ত্র। এই আমলাতন্ত্র পানি ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে বিস্তৃত ছিল। ফলে, প্রাকৃতিক সম্পদ তথা পানি ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তি বা সাধারণ নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণকে অস্বীকার করা হয়েছে।

১. উদ্দেশ্য

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তিনটি। এগুলো নিম্নরূপ:

ক. এলাকার দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা সমস্যার কারণ খোঁজা।

খ. জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে সরকারি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের গৃহীত ও বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড এবং পরবর্তী প্রভাব বিশ্লেষণ করা।

গ জনগণ উদ্ভাবিত টিআরএম সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া ও এর কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা।

২. পদ্ধতি

এটি একটি উদঘাটনমূলক গবেষণা। বর্তমান প্রবন্ধে গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ প্রবন্ধের তথ্য-উপাত্তের জন্যে প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি (দ্বৈতয়িক) দুটো উৎসই ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে উপকূলের মানুষের সাক্ষাৎকার ও তাদের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ এবং সেকেন্ডারি উৎস হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ, স্বীকৃত জার্নাল, ম্যাগাজিন, দৈনিক পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদন, গবেষণা প্রতিবেদন, সেমিনার/কনফারেন্স-এর প্রতিবেদন প্রভৃতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩. বিশ্লেষণ

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ, যার পশ্চিম, উত্তর, আর পূর্ব সীমান্তজুড়ে রয়েছে ভারত। পশ্চিমে রয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। উত্তরে ভারতের

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয় রাজ্য। পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম। তবে পূর্বদিকে ভারত ছাড়াও মিয়ানমারের (বার্মা) সাথে সীমান্ত রয়েছে। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ভূতাত্ত্বিকভাবে দেশটি থেকে উত্তর দিকে রয়েছে সুউচ্চ হিমালয় পার্বত্যাঞ্চল, যেখান থেকে বরফগলা পানির প্রবাহে সৃষ্ট বড় বড় নদী (গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ইত্যাদি) বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রবহমান এবং নদীগুলো গিয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।[৬] বর্ষাকালে নদীবাহিত পানির প্রবাহ বেড়ে গেলে নদী উপচে পানি লোকালয়ে পৌঁছে যায়, এবং দেশটি এভাবে প্রায় প্রতি বছরই বন্যায় আক্রান্ত হয়।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিচিতি-অবস্থান

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উত্তরে পদ্মা নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে গড়াই-মধুমতি-বলেশ্বর নদী এবং পশ্চিমে মাথাভাঙ্গা-ইছামতি-কালিন্দি নদী বা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রেখার অবস্থান। এ অঞ্চলের সর্বদক্ষিণে পৃথিবীর বৃহত্তম একক ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন অবস্থিত। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল মূলত সমতল হলেও উত্তর হতে দক্ষিণ পূর্ব বরাবর ক্রমশ ঢালু। উত্তরাংশের নদীগুলি মৃতপ্রায় হলেও দক্ষিণের জোয়ার-ভাটার নদীগুলি সাগরের কাছে বড় মোহনার সৃষ্টি করেছে। এ অঞ্চলের জেলাসমূহ হলো: খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, যশোর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মাগুরা মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া।[৭]

আবহাওয়া ও জলবায়ু

বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মতো দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলবায়ু মৌসুমী ভাবাপন্ন, তবে গ্রীষ্মকালে মাটি, পানি ও বায়ুর অধিক লবণাক্ততা (বিশেষ উপকূলীয় এলাকায়) এ এলাকাকে অন্য এলাকা থেকে পৃথক করেছে। সামুদ্রিক ঝড় জলোচ্ছ্বাস, জোয়ার-ভাটা, অধিক বৃষ্টিপাত এবং লবণাক্ততা এ এলাকার (বিশেষ করে দক্ষিণ অংশের) বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য এলাকার মতো এখানে চারটি ঋতু সুস্পষ্টভাবে ঘুরে ফিরে আসে। শুষ্ক শীতের মৌসুম, বর্ষার আগের মৌসুম, বর্ষা মৌসুম এবং বর্ষা পরবর্তী মৌসুম।

দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের তাপমাত্রা উচ্চে ৪০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হতে ২৯.১ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং নিম্নে .০৫ ডিগ্রী সেন্ট্রিগ্রেড হতে ২৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মধ্যে উঠানামা করে। এখানে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৭৫০ মিলিমিটার। আপেক্ষিক আর্দ্রতা শুষ্ক মৌসুমে ৭৫% হতে ৬৪% এর ভিতর এবং বর্ষা মৌসুমে ৭৫% হতে ৮৭% মধ্যে উঠানামা করে।[৮]

জনবসতি

অসংখ্য নদ-নদী এবং তাদের অবক্ষেপনের মাধ্যমে পলিবিধৌত দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল ঐতিহ্যবাহী সুন্দরবন নিয়ে ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশের মানচিত্রে যেমন একটি অনন্য অবস্থানে রয়েছে তেমনি বহু নরগোষ্ঠীর আবাস স্থল হিসেবেও ভূখণ্ডটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। খৃষ্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে গ্রীক বীর আলেকজান্ডার ভারত অভিযানে এসে অভিযানের এক পর্যায়ে গঙ্গারীডদের ভয়ে আর পূর্বদিকে অগ্রসর হননি। ধারণা করা হয়, এই গঙ্গারীডই ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসী। মূলত সুদূর প্রাচীনকাল থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বিভিন্ন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে বিভিন্ন নরগোষ্ঠী এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে বসতি গড়ে তোলে বা বসতি স্থাপনের জন্য আসে এবং তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ধরে রাখে। এসব জনগোষ্ঠীকে বুনো, সংখ্যালঘু, অস্পৃশ্য বা নিচু শ্রেণির লোক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এসব জনগোষ্ঠীর ভাষা, ধর্ম, পেশা, দৈহিক আকৃতি, আচার আচরণ ও ধ্যান-ধারণার সাথে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর যথেষ্ট অমিল দেখা যায়।[৯]

ভূ-প্রকৃতি

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এই এলাকা মূলত গঙ্গা এবং তার শাখা নদীর পলি অবক্ষেপনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। ভূমি গঠন অনুসারে (ফিজিওগ্রাফিক্যালী) এই অঞ্চলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। উত্তরের পুরাতন গাঙ্গেয় প্লাবনভূমি, মধ্যের জোয়ার-ভাটা প্লাবনভূমি ও দক্ষিণের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল।

পুরাতন গাঙ্গেয় প্লাবনভূমি : পুরাতন গাঙ্গেয় প্লাবনভূমির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এলাকাটি গঙ্গা/পদ্মার প্রবাহ থেকে বর্তমানে বিচ্ছিন্ন। ভূমি মোটামুটি সমতল হলেও নদী বরাবর কিছুটা উঁচু। সময়ের সাথে সাথে নদীগুলি তার প্রবাহ ও দিক পরিবর্তনের ফলে এখানে অসংখ্য বাওড় ও নিম্নভূমির (বিল) সৃষ্টি হয়েছে।[১০]

জোয়ার-ভাটা প্লাবনভূমি : পুরাতন গাঙ্গেয় প্লাবনভূমি ও ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের মধ্যবর্তী অংশ জোয়ার-ভাটার প্লাবন ভূমি। এলাকাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে প্রতিদিন দু'বার জোয়ার ভাটায় প্লাবিত হয়। জোয়ারের পানির উচ্চতা স্থানভেদে ৩ হতে ৮ ফুট হয়ে থাকে। ভূমি অপেক্ষাকৃত সমতল, তবে নদী ও তার শাখা-প্রশাখা জালের মতো ছড়িয়ে আছে। এলাকাটি সাগর পৃষ্ঠ হতে ৩ থেকে ১০ ফুট উচ্চতার মধ্যে অবস্থিত। সাগরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় এলাকাটি খুবই সক্রিয়, বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস প্রায়শই আঘাত হানে; ক্ষয়ক্ষতিও হয় ব্যাপক। নদী ভাঙ্গন, নদীর গতিপথ পরিবর্তন, ভূমির নিম্নগমন ও নদী ভরাট উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়া যা এলাকার সক্রিয়তা প্রমাণ করে।[১১] ভূতত্ত্ববিদগণ মনে করেন, এখানে ভূমি নিম্নগমনের হার অপেক্ষাকৃত বেশি হলেও অব্যাহতভাবে নদীর পলি জমায় ভূমি গঠনে তা সাহায্য করে চলেছে। তবে নদীর দুই তীর বরাবর বাঁধ নির্মাণের ফলে ভূমিতে পলি অবক্ষেপন প্রক্রিয়া অনেক স্থানে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে নদীতেই পলি অবক্ষেপন হয়ে নদী ক্রমাগত ভরাট হচ্ছে। উত্তরের নদীগুলোর সঙ্গে দক্ষিণের নদীগুলোর সংযোগ অনেক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সাগর থেকে উঠে আসা নদীগুলোর দাপট এখন অনেক বেশি, যে কারণে এ অঞ্চলে মাটি ও পানির লবণাক্ততা অপেক্ষাকৃত বেশি।

ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সর্ব-দক্ষিণে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের অবস্থান। এটা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ একক ম্যানগ্রোভ বন, যা সুন্দরবন নামে পরিচিত। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এলাকাটি বিভিন্ন প্রজাতির চিরসবুজ ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদে পূর্ণ। অসংখ্য নদী এখানে জালের মত ছড়িয়ে আছে। সাগরের কাছে নদীগুলো বেশ চওড়া হয়ে মোহনার সৃষ্টি করেছে। ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনও জোয়ার-ভাটার প্লাবনভূমির মত দিনে দুই বার প্লাবিত হয়। এখানকার মাটি এবং পানির লবণাক্ততা খুব বেশি। ভূমি সমতল এবং সাগর পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ৩ ফুটের মধ্যে। এখানে জোয়ারের পানি ৮ হতে ১২ ফুট উঁচু হয়। এলাকাটি জোয়ার-ভাটা প্লাবনভূমির মত খুবই সক্রিয়। ভূমি নিম্নগমনের হারও এখানে বেশি, তবে তা পলি অবক্ষেপনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১২]

ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাস বা ভূতত্ত্ব

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল মূলত গঙ্গা এবং এদের শাখা নদীর অবক্ষেপনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞানীরা দু'দলে ভাগ হয়ে এই অঞ্চল তথা গাঙ্গেয় বদ্বীপ গঠনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছেন। এক দল (ওল্ডহ্যাম, ১৮৭০, বাগচি, ১৯৪৪ এবং হক ১৯৮২) মনে করেন যে, গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে মূল ধারা ভাগিরথী থেকে মাথাভাঙ্গা, গড়াই, আড়িয়াল খাঁ প্রভৃতি নদীর মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানের পদ্মা দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার ফলে যে অবক্ষেপন হয়েছে তার মাধ্যমে। অন্য দল (চৌধুরী ১৯৯৬ এবং হোসেন ১৯৮৬) মনে করেন যে, প্রথম থেকেই গঙ্গার দুটি ধারা ছিল। একটি ভাগিরথী, অন্যটি পদ্মা। আদিকাল

থেকে গঙ্গার প্রধান ধারা ছিল আজকের পদ্মা, ভাগিরথী নয়। ভাগিরথী এবং পদ্মা নদীর শাখা-প্রশাখার অবক্ষেপনের মাধ্যমে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। তবে আজ থেকে আনুমানিক ২০০ বছর আগে পদ্মা হরিণঘাটা নদীর মোহনা বরাবর প্রবাহিত হত। পরে বিভিন্ন কারণে দিক পরিবর্তিত হয়ে পূর্ব দিকে সরে গিয়ে পদ্মা বর্তমান গতিপথে প্রবাহিত হচ্ছে।[১৩]

ভূতাত্ত্বিকদের মতে, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভূ-গঠন প্রণালী কোয়াটারনারি (অনুর্ধ্ব বিশ লক্ষ বছর) পলল দ্বারা আবৃত। এখানে আদি শিলার উপর পললের পুরুত্ব ৩ হাজার থেকে ৯ হাজার মিটারের বেশি এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ বরাবর এই পুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। ১৮ হাজার বছর আগে অর্থাৎ বরফ যুগে পৃথিবীব্যাপী সাগরের পানির উচ্চতা বর্তমানের তুলনায় ১২০ ফুট নীচে নেমে গিয়েছিল। এর ফলে গঙ্গা এবং তার শাখাসমূহের গভীরতা ছিল খুব বেশি এবং নদীগুলোও ছিল অত্যধিক খরস্রোতা। মাত্র তিন থেকে চার হাজার বছর আগে সমুদ্রপৃষ্ঠ ও গাঙ্গের ব-দ্বীপ বর্তমান কাঠামোতে ফিরে আসে বলে ধারণা করা হয়। সুন্দরবনের ইতিহাসও আনুমানিক চার হাজার বছরের। প্রাচীন গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ আট থেকে দশ হাজার বছর আগে পলি জমে সৃষ্টি হয়েছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলি গঙ্গার প্রধান ধারার পূর্ব দিকে পদ্মা বরাবর প্রবাহিত হওয়াতে এখানে স্রোত কমে যায়। এতে এ অঞ্চলে খুব পুরুস্তরের সূক্ষ্মদানায় পলল অবক্ষেপিত হয়। এখানে ভূমির নিম্নগমনের হারও বেশি।

নদ-নদী

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে জালের মত ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নদ-নদী। যার অধিকাংশই এখন মৃতপ্রায় অথবা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। অথচ এই নদীগুলো এক সময়ে পলি অবক্ষেপনের মাধ্যমে নতুন নতুন ভূমি সৃষ্টিতে বিশেষ অবদান রেখেছে। এখনও উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই নদীগুলো দ্বারা নতুনভাবে ভূমিগঠন করা সম্ভব। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলোকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

প্রথমত, পাহাড়ী নদী অর্থাৎ পদ্মার শাখানদীসমূহ এবং দ্বিতীয়ত, জোয়ার ভাটার নদী।

পদ্মার শাখানদীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলি হচ্ছে ভৈরব, মাথাভাঙ্গা এবং গড়াই নদী। ভৈরব, মাথাভাঙ্গা এবং এদের শাখানদীসমূহ বর্তমানে মৃতপ্রায়। অনেক স্থানে নদীগুলি ভরাট কিংবা জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ হয়ে আছে। বর্ষাকালে কোনো কোনো স্থানে কিছুটা পানি থাকলেও শুকনো মৌসুমে কোনো পানি থাকে না। গড়াই নদী পদ্মার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এর মুখে (উৎপত্তিস্থল) পলি জমা হওয়ায় শুকনো মৌসুমে এটি পদ্মার প্রবাহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে বর্ষা মৌসুমে প্রচুর পানি পদ্মা হয়ে গড়াই দিয়ে প্রবাহিত হয়।[১৪]

উত্তরাংশে নদীগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য মৃতপ্রায়, খুবই আঁকা-বাঁকা এবং শুধুমাত্র বর্ষাকালে কিছু পানি প্রবাহিত হয়। দক্ষিণাংশের জোয়ার-ভাটার নদীগুলি এলাকায় জালের মত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। নদীগুলিতে সারা বছরই প্রবাহ থাকে। যা সাগরের দিকে ক্রমশ চওড়া হয়ে বড় বড় মোহনার সৃষ্টি করেছে। নদীগুলোয় ২৪ ঘন্টায় দু'বার জোয়ার এবং দু'বার ভাটা হয়। জোয়ারে গোটা এলাকা প্লাবিত হয় আবার ভাটায় পানি নেমে যায়। পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে গুরুত্বপূর্ণ জোয়ার-ভাটার নদীগুলো হচ্ছে হাড়িয়াভাঙ্গা, রায়মঙ্গল, মালঞ্চ, কুঙ্গা, পশুর, ভাংরা ও হরিণঘাটা বা বলেশ্বর নদী।

পাহাড়ী এবং জোয়ার-ভাটা নদী বিধৌত এলাকাকে সহজভাবে সরলরেখার মাধ্যমে পৃথক করা খুবই কঠিন। কিছু কিছু নদীর উত্তরাংশ পাহাড়ী হলেও দক্ষিণাংশে জোয়ার ভাটার নদী (যেমন গড়াই নদী)। দক্ষিণাংশে গড়াই নদী বলেশ্বর নামে পরিচিত।

একইভাবে কপোতাক্ষ উত্তরে পাহাড়ী হলেও দক্ষিণে জোয়ার-ভাটার নদী। দক্ষিণাংশের প্রধান প্রধান নদীগুলি হচ্ছে : গড়াই, মধুমতি, বলেশ্বর, ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, কুমার, নবগঙ্গা, চিত্রা, কপোতাক্ষ, বেতনা, মুচিখালী, বেংগ-ফটকি, ভদ্রা, হরিহর প্রভৃতি।

এক কথায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলোর প্রধান সমস্যা হচ্ছে :

- উত্তরের নদীগুলোর নাব্য ক্রমাগত কমছে;
- পোল্ডার ব্যবস্থার ফলে দক্ষিণের নদীগুলি ভরাট বা শুকিয়ে যাচ্ছে এবং
- লবণাক্ত পানি দিন দিন আরও উত্তরের মিষ্টিপানির এলাকাকে গ্রাস করছে।

বাংলাদেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার পটভূমি

বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অবলম্বন পানি। আবার এদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের অন্যতম কারণও পানি। ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের কৃষি, মৎস্য, গৃহস্থালী কাজে ও কলকারখানার জন্য পানি ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে বৃষ্টি ও নদীর পানির উৎসের উপর। আধুনিক পানি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ধরনের পাম্প, গভীর নলকূপ এবং পানি প্রবাহের নালা তৈরি করে কৃষি কাজে শুষ্ক মৌসুমে এমনকি অতি সাম্প্রতিক বর্ষা মৌসুমেও পানি ব্যবহার করা হচ্ছে। আধুনিক এই ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও বাংলাদেশের কৃষি উৎপান বৃদ্ধির প্রধান অন্তরায় হচ্ছে, শুষ্ক মৌসুমে ভূ-উপরস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির অভাব। বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনার ইতিহাসকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি। এগুলো হচ্ছে ঃ ১) বৃটিশ পূর্ব সময় ২) বৃটিশ আমল ৩) বৃটিশ পরবর্তী পাকিস্তান আমল ও ৪) বাংলাদেশ সময়।[১৫]

বৃটিশ-পূর্ব সময়

মোগল শাসন আমলের আগে আজকের বাংলাদেশ অংশে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কেমন ছিল তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। তবে মোগল আমলের বিভিন্ন নথিপত্র থেকে তখনকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য জানা যায়। মোগল প্রাদেশিক সরকারের একটি স্বাধীন দপ্তর ছিল, যাদের কাজ ছিল এলাকার বাঁধ, সড়ক, সেতু, নদী খনন ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। এই দপ্তরকে তখন ফুলবান্দি দপ্তর বা পুস্তাবান্দি বলা হত। স্থানীয় জমিদারদের তত্ত্বাবধানে ফুলবান্দি দপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হত। জমিদাররা তাদের কাজের জন্য সরকার থেকে বাজেট বরাদ্দ পেত। সাধারণত এই বাজেট ছিল জমিদারদের সংগৃহীত খাজনার একটি অংশ, যা পরে জমিদারদের সংগৃহীত খাজনার সঙ্গে সমন্বয় করা হত। অধিক অর্থ প্রয়োজন হলে জমিদাররা স্থানীয়ভাবে নতুন করে প্রজাদের উপর কর আরোপ করে অর্থ সংগ্রহ করত। রাস্তাঘাট সংস্কার কিংবা নতুন করে নির্মাণ, খাল পুনঃখনন, জমি এবং জমির ফসলকে বন্যা ও খরা থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব ছিল এলাকার জমিদারদের।[১৬] এ সকল দায়িত্ব ছাড়াও প্রয়োজনে জমিদাররা বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য নিত। এ সময়ে রাস্তাঘাট, সেতু, বাঁধ ইত্যাদি সার্বক্ষণিক রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। এ সকল অবকাঠামোর অবস্থা সার্বক্ষণিক নজরদারীর জন্য স্থায়ীভাবে লোক নিয়োগ করা হত। নিয়োগপ্রাপ্তদের অষ্টপ্রহরী বলা হত। কোথাও কোনো স্থানে বাঁধ ভেঙ্গে গেলে অথবা রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হলে অষ্টপ্রহরীরা সঙ্গে সঙ্গে জমিদারকে জানাতো। জমিদার তখুনি গ্রামের ফুলবান্দি দপ্তরকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য নির্দেশ দিতেন। আর গ্রাম পঞ্চায়েত তথা গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পরামর্শে ফুলবান্দি দপ্তর কাজ করত। প্রয়োজনে ফুলবান্দি দপ্তরের এ সকল কাজে অনেক সময় গ্রামের মানুষ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করতো। জমিদারের তত্ত্বাবধানে গ্রাম

পঞ্চায়েত মৌজাভিত্তিক বন্যা এবং কৃষি ব্যবস্থাপনার কাজ করত। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে জমিদাররা নৌ-পরিবহণ এবং নৌ-পরিবহণের নিরাপত্তার জন্য নদীর পাশে চৌকি স্থাপন করত। চৌকিদাররা নৌ-পরিবহণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করত। এ কাজে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হত বলে যারা নদীতে চলাচল করত তাদের নিকট থেকে বিশেষ করে ব্যবসার কাজে নিয়োজিত নৌকা থেকে টোল আদায় করা হত।

বৃটিশ আমল

বৃটিশ শাসনামলে দেশের ফুলবান্দি দপ্তরকে বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। জমিদাররা চৌকি স্থাপন করে নৌ-পরিবহণ এবং পরিবহণের নিরাপত্তার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, তাও বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে দেশের বিভিন্ন খাল খনন-পুনঃখননের বিষয় এবং খাল সংলগ্ন বেড়িবাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি অবহেলিত হয়ে পড়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অবহেলার জন্য বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, নদী ভরাট, নদীর গতিপথ পরিবর্তন ঐ সময়ে এলাকার প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। দুর্বল পানি ব্যবস্থাপনার জন্য এ সময় প্রায়শঃই দেশে বন্যা দেখা দিত। বৃটিশ আমলে ১৮৯৭ সালে এই এলাকায় রেলপথ স্থাপনের কাজ শুরু হয়। তখন থেকে মালামাল পরিবহণের ক্ষেত্রে নৌ-পথের গুরুত্ব দিন দিন কমতে থাকে। শুধুমাত্র নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বৃটিশরা কিছু কিছু নদী খননের কাজ করে আসছিল। কিন্তু রেলপথ স্থাপনের পর ঐ সকল নদী রক্ষণাবেক্ষণের কাজও স্থগিত হয়ে যায়।[১৭] উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যতদিন পর্যন্ত কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গে যাওয়ার রেলপথ তৈরি হয়নি ততদিন বৃটিশরা শুধুমাত্র মালামাল পরিবহণের জন্য মাথাভাঙ্গা নদীকে খনন করে উন্মুক্ত রেখেছিল। রেলপথ তৈরির পর মাথাভাঙ্গা নদীর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বন্ধ হওয়াতে নদীটি পলি জমে ভরাট হয়ে যায়। উপরন্তু, রেলপথ তৈরির জন্য অসংখ্য নদীনালা বন্ধ করে ফেলা হয় এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত হওয়াতে বিভিন্নস্থানে বন্যা দেখা দিতে থাকে। যেমন সিলেটে কুলাউড়া-সিলেট রেলপথ স্থাপনের পর বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা এবং বন্যা দেখা দেয়।

পাকিস্তান আমল

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হওয়ার পর প্রথম এ দেশে কৃষি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর আগে ঢাকার কাছে ইছামতি নদী, উত্তরবঙ্গের করোতোয়া ও ইছামতি নদী, পাবনার গজনা বিল এবং বরিশালের শাতলা বিল পলি জমে ভরাট হয়ে যায়। ধলেশ্বরী এবং ব্রহ্মপুত্র সংযুক্তি খালও চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। তখনকার সরকার ঐ সময়ে দেশের মজে যাওয়া নদী নালা খালবিল পুনঃখননের দিকে মনোযোগ দেয়। ১৯৪৭ সালের পর সরকার খাল পুনঃখনন ও রাস্তাঘাট নির্মাণে কিছুটা মনোযোগী হলেও ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালের বন্যার পূর্ব পর্যন্ত দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নের বিষয়টি অবহেলিত থেকে যায়। ঐ সময় প্রলয়ঙ্করী বন্যার পর ইউএনডিপি-র সহায়তায় ১৯৫৭ সালে ক্রুগমিশন দেশে বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে। ক্রুগমিশন বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাবনা পেশ করে। ১৯৫৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন অথরিটি (EP-WAPDA) গঠিত হলে তারা ক্রুগমিশনের দেয়া পরামর্শ অনুযায়ী চলতে থাকে। ১৯৬৪ সালে (EP-WAPDA) দেশের ভূমি ও পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম একটি দীর্ঘমেয়াদী (১৯৬৫ থেকে ১৯৮৫) পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন। এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। এ পরিকল্পনায় ৫১টি বৃহত্তর উন্নয়ন প্রকল্প এবং পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর উপর ব্যারেজ নির্মাণ অন্তর্ভূক্ত ছিল।[১৮] এছাড়াও উপকূলীয় বাঁধ ও ব্রহ্মপুত্র নদীর

ডান পাড়ে বেড়িবাঁধ নির্মাণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বাংলাদেশ সময়

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর EP-WAPDA পরিবর্তিত হয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (BPDB) গঠিত হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড -পাউবো পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম হাতে নেয়। বাংলাদেশ সরকার পাউবোর মাধ্যমে ছয় শতাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এরমধ্যে ২৪টি সেচ প্রকল্প।

বাংলাদেশে শুধুমাত্র কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে পানি ব্যবস্থাপনার উপরে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। রাস্তাঘাট নির্মাণের ফলে নদী পথ অবহেলিত হওয়ার কারণে দিন দিন নদীগুলি পলি জমে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে, নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে দেশের উত্তর অঞ্চলের প্রায় সকল নদ-নদী পলি জমে ভরাট হয়েছে। ১৯৮৭-১৯৮৮ সালে দেশে প্রলয়ঙ্করী বন্যার পর বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠির সহায়তায় এ দেশের ইতিহাসে পানি ব্যবস্থাপনা ও বন্যার উপর সর্ববৃহৎ এক প্রকল্প গ্রহণ করে। এ প্রকল্প ফ্লাড এ্যাকশান প্লান (FAP) প্রকল্প নামে পরিচিত।[১৯]

পোল্ডার ব্যবস্থা প্রবর্তন ঃ ভূমিগঠনে চূড়ান্ত হস্তক্ষেপ

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় বহু আগে থেকেই জমিদার অথবা ভূ-স্বামীদের তত্ত্বাবধানে অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করে চাষাবাদ করা হতো। বছরের আট বা দশ মাস মেয়াদী এই বাঁধ তীব্র লবণাক্ত সাগরের পানি থেকে ওই সময়ের জন্য ফসলকে রক্ষা করত। বাঁধের মেয়াদের ওপর ভিত্তি করে একে অষ্টমেসে বা দশের বাঁধ বলা হত। সাধারণত বর্ষা মৌসুমের শুরুতে পানির লবণাক্ততা কমে গেলে বাঁধ ভেঙ্গে দেওয়া হতো। এইভাবে প্রতি বছর বাঁধ নির্মাণ করা ছিল বেশ ঝামেলা এবং ঝুকিপূর্ণ কাজ। অন্যদিকে বাঁধ অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও নীচু হওয়াতে বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে (ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি) বাঁধ ভেঙ্গে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতো।[২০]

বৃটিশ শাসনের শেষ পর্বে খুলনার ডুমুরিয়াসহ নানাস্থানে বাঁধ তৈরির জন্যে আন্দোলন হয়েছে। পাকিস্তান পর্বে ১৯৫১ সালে দেশ থেকে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়। জমিদারদের তত্ত্বাবধানে যে ব্যবস্থাপনা ছিল তা অকার্যকর হয়ে পড়ে। তখন বারবার ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে থাকে। ১৯৫৯ সালে পূর্ব-পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বিভাগের (ইস্ট পাকিস্তান ওয়াটার এন্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অথ রিটি বা ইপি-ওয়াপদা) জন্ম হয়। এই বিভাগ দেশের পানি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ১৯৬১ সালে এই সমস্যার সমাধান কল্পে উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব করে। যা উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প (Coastal Embankment Project-CEP) বা সিইপি নামে পরিচিত। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পোল্ডার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়।

উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প (১৯৬১)

১৯৬২ সালে ইপি-ওয়াপদা এই প্রকল্পের নক্সা, অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সাহায্যের জন্য বিদেশী সংস্থা Leedshill-DeLeuw কে বিশেষ পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেয়। প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্প দুই অংশে বিভক্ত ছিল। প্রথম ধাপের কাজ জুন ১৯৭১ সালের মধ্যে শেষ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

প্রথম অংশের কাজের অংশ হিসেবে ১৯৬৭ সালের মধ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ৩৭টি পোল্ডার, ১৫৬৬ কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধ এবং ২৮২ টি স্লুইসগেট নির্মাণ করা হয়। এই অবকাঠামো নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য ছিল উপকূলীয় এলাকার ফসল এবং জনবসতিকে সামুদ্রিক লবণাক্ত পানি থেকে রক্ষা করে অধিক ফসল ফলিয়ে দেশকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করা। যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা USAID-

এর সহায়তায় এই উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়। এর কারিগরি জ্ঞানটি ছিল নেদারল্যান্ডের।[২১]

উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রাথমিকভাবে ১০-১৫ বছর কৃষক প্রচুর ফসল ফলাতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষাবাদ শুরু হয়। আপাতদৃষ্টিতে, ঐ সময়ে এলকার মানুষ কিছুটা উপকৃত হলেও বাঁধ নির্মাণের ফলে পলিমাটি প্লাবনভূমিতে অবক্ষেপিত না হয়ে নদীর তলদেশে জমে নদীর নাব্যতা হ্রাস পেতে থাকে। দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার উত্তরাংশে অবস্থিত পোল্ডার বিশেষ করে ২৫ ও ২৪ নং পোল্ডারে প্রথমে পানি নিষ্কাশন সমস্যা দেখা দেয়। ১৯৮২ সালে ২৫নং পোল্ডারের বিল ডাকাতিয়া এলাকা জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে। জলাবদ্ধতা এলাকার মানুষের ভয়ানক দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তৎকালীন সরকার ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত মানুষের দুর্দশার প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়ে বরং উদাসীন থাকেন।

পোল্ডার

পোল্ডারকে বিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণভাবে কোনো এলাকার চারদিক বাঁধ দিয়ে ঘিরে ভূ-উপরিস্থিত পানি ব্যবস্থাপনা কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে এলাকাটিকে পোল্ডার বলে। অর্থাৎ কোনো এলাকার প্রাকৃতিক পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে বাঁধ, স্লুইচ গেট ইত্যাদির মাধ্যমে ওই এলাকাকে সংলগ্ন এলাকা থেকে পৃথক করে, ভিতরের পানির অবস্থা ও উচ্চতা কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হলে ঐ এলাকাকে পোল্ডার বলে। অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে পানি নিয়ন্ত্রিত এলাকাকে পোল্ডার বলে। অন্য কথায়, উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণ এবং নদী, নিষ্কাষণ ব্যবস্থা ও বঙ্গোপসাগর সংক্রান্ত কার্যাবলীকে একত্রে পোল্ডার বলে (The protection is being produced by construction of earth embankments along rivers, drainage channels, tidal estuaries and the Bay of Bengal to form individual areas called 'polder'.)[২২]

পোল্ডারের বিরূপ প্রভাব

এলাকায় পোল্ডার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে ভূমি ও ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল দেশের সবচেয়ে ক্রিয়াশীল অংশ। এখানে ভূমি নিম্নগমনের হারও দেশের অন্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি। পোল্ডার তৈরির আগে ভূমির এই নিম্নগমনের পাশাপাশি ভূমির উপর নদীর পলি অবক্ষেপিত হয়ে ভূমির ভারসাম্য বজায় রাখত। পোল্ডার তৈরির ফলে ভূমির নিম্নগমন প্রক্রিয়া চলছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে এই নিম্নগমনের হার বেড়ে গেছে। কিন্তু পলি অবক্ষেপিত না হতে পারায় পোল্ডারের ভিতরের অংশ দিন দিন নীচু হচ্ছে এবং অন্যদিকে পোল্ডার সংলগ্ন নদীগুলি পলি জমে ক্রমান্বয়ে ভরাট হচ্ছে।২৩ এমতাবস্থায় বৃষ্টির পানি নিস্কাশিত না হতে পেরে পোল্ডারের মধ্যে জলাবদ্ধতা দেখা দিতে শুরু করে। বর্তমানে গাঙ্গেয় প্লাবনভূমির অনেক নদী বিশেষ করে জোয়ার-ভাটার নদীসমূহের উত্তরের প্রান্তসীমায় পলি জমে ভরাট হয়ে গেছে এবং নদী সংলগ্ন ভূমিতে জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। জলাবদ্ধ এলাকার পরিমাণ বাড়ছে। কোনো কোনো এলাকা বছরের পর বছর জলাবদ্ধ থাকছে।

সুন্দরবনের ওপর প্রতিক্রিয়া

ভূমি ছাড়াও পোল্ডার ব্যবস্থার ফলে পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবনের ওপর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া পড়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের দক্ষিণ এই বনাঞ্চলের অবস্থান। বর্তমানে নদী ভরাট, অধিক লবণাক্ততা, জলমগ্নতা ইত্যাদি সুন্দরবনের অন্যতম সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। বনের পূর্বপ্রান্তে বসতি ও বনাঞ্চল একাকার। অথচ সকলেই জানি, সংরক্ষিত সুন্দরবনাঞ্চল নদী দিয়ে ঘেরা। নদী

পার হয়েই বনের মধ্যে যেতে হয়। ইতোমধ্যে এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যেতে বসেছে।[২৪]

চাঁদপাই রেঞ্জের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত প্রশস্ত শেলা নদীর একটি শাখা খরমা, দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৪ কিলোমিটার। এ নদীতে আগে প্রচুর ইলিশ মাছ পাওয়া যেত। বর্তমানে পলি জমে ভরাট হয়ে গেছে। এখন বৈদ্যমারি বাজারের কাছে খরমা নদীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। খালটি মরে যাওয়ায় বন এবং লোকালয়ে একাকার হয়ে গেছে। জিউধরা থেকে ধানগড়া পর্যন্ত ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ভোলা নদীর অবস্থাও একই রকম। ১৯৯৬-৯৭ সালে এই নদীর নাব্য ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগও নেয়া হয়েছিল; কিন্তু কোনো সুফল হয়নি। শুধুমাত্র খরমা এবং ভোলা নদী নয়, সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত অর্ধশতাধিক নদী-খালের অবস্থা এখন খরমা ও ভোলা নদীর মতো। সুন্দরবনের উল্লেখযোগ্য খালগুলো যা প্রায় শুকিয়ে গেছে, সেগুলো হচ্ছে- বগা খাল, কাগা খাল, বিন্দু কোটা, চড়া খাল, জংরা খাল, মরাপশুর, ঢাংমারী, ঝাপসি, পদ্মাবতী, ভদ্রকল, হ্যাতালবাড়িয়া, শরবতখালী প্রভৃতি। এই খালগুলোয় শুকনো মৌসুমে আর পানি থাকে না। পলি পড়ে খাল-নালা-নদী শুকিয়ে যাওয়ায় এখন জোয়ারের পানি বনাঞ্চলকে ভাসিয়ে নেয়। অনেক বেশি সময় নোনা পানি বনের উদ্ভিদরাজির গোড়ায় আটকে থাকে। অনেক জায়গায় পলির নীচে ঢাকা পড়ে গেছে ম্যানগ্রোভের বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শ্বাসমূল, যাকে স্থানীয় ভাষায় শুলো বলা হয়। জোয়ার-ভাটার স্বাভাবিক পানির প্রবাহ না থাকায় প্রাকৃতিক উপায়ে ম্যানগ্রোভের প্রজনন-বিকাশও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

জলাবদ্ধতা কী এবং কেন?

১৯৮৫ পরবর্তীকালে এই এলাকায় ধীরে ধীরে পানির বন্দীদশা দেখা দেয়, যাকে জলাবদ্ধতা বলা হচ্ছে। জলাবদ্ধতা একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। প্রকৃতি বিরূদ্ধ। তাই পরিবেশ ও প্রতিবেশের ওপর এটি বিরুপ প্রভাব ফেলে। বিপরীতে, জলাভূমি স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক কোনো এলাকা যা নিচুভূমি, যার আংশিক বা সম্পূর্ণ অংশ জলমগ্ন থাকতে পারে। নদী-নালা-খাল-বিল-ঝিল-দীঘি সবই জলাভূমি। জলাবদ্ধতাকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এর একটি প্রাকৃতিক জলাবদ্ধতা; অন্যটি মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা। কোনো নদী সংলগ্ন অঞ্চলের বিল বা হাওড়ের প্রবাহ পথে পলি জমে প্রবেশমুখ বন্ধ হয়ে প্রাকৃতিক জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, নদীর সঙ্গে সংযুক্ত খালের মুখে পলি জমাতে বিলগুলোয় স্থায়ী জলাবদ্ধতার ঘটনা ঘটে। এছাড়া, অপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য খাল বা নদীর মুখে কাঠামো গড়ে তোলার জন্য মানুষ সৃষ্ট জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। কাঠামোর (স্লুইসগেট, রেগুলেটর, বাঁধ) আশপাশে পলি জমার ফলে পানি চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। ভবদহ, বিল ডাকাতিয়া বা আশেপাশের সকল বিলের জলাবদ্ধতা এই কাঠামোকেন্দ্রিক জটিলতা। যা এই অঞ্চলের পানি ব্যবস্থাপনার একটি বিষময় ফল।

ভৌগোলিক গঠনের দিক দিয়ে এই এলাকার বিলগুলো প্লেটের মতো। প্লেটের চারপাশ যেমন উঁচু, বিলগুলোর চারপাশেই তেমনি উঁচু, যেখানে বসতি গড়ে উঠেছে। গাঙ্গেয় পলল দ্বারা গঠিত এ ভূমিতে বসতি সম্পূর্ণই নদী তীরবর্তী অঞ্চল দিয়ে গড়ে উঠেছে। সাধারণত যেসব এলাকা প্রায় সারা বছরই জলাবদ্ধ থাকে, সে সব এলাকা বা এলাকাসমূহকে জলের সঙ্গে বসতি এলাকা বলে। সিইপি'র আওতায় পোল্ডার ব্যবস্থা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে নদীতীরের উভয় পাশে মাটির বাঁধ দেয়া হয়। আর নদীকে স্থানে স্থানে বেঁধে, সরু করে মুখে স্লুইস গেইট, ফ্লাস গেইট দিয়ে কৃত্রিম এক আবহ তৈরি করা হয়। বলা হয়,

গেইটগুলোর কাজ হলো ভিতরের বিলের পানি বের করে দেয়া এবং নদীর নোনা পানি ভিতরে প্রবেশ করতে না দেয়া। ফলে নোনা ফসল তৈরিতে বিঘ্ন ঘটাতে পারবে না। পাশাপাশি উঁচু বাঁধের কারণে জলোচ্ছ্বাসে জনবসতি ভেসে যাবে না। প্রকল্প বাস্তবায়নের পর পর কৃষিতে এর তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ধরা পড়ে, তবে পানি ব্যবস্থাপনার গোটা কাঠামোটি ভেঙ্গে পড়ে। নদীর জোয়ারে আনা পালি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গেইটের মুখে, নদীগর্ভে জমা হতে থাকে। অব্যাহত এই প্রক্রিয়াটি বিশ বছরের ব্যবধানে এখানকার নদীগুলো শুকিয়ে মেরে ফেলে। নদী হারিয়ে যেতে থাকে। অন্যদিকে, প্লেটের ন্যায় বিলগুলোয় পানি জমতে থাকে। স্লুইস গেইটগুলো অকার্যকর হয়ে পড়ে। দেখা দেয় জলাবদ্ধতা।

খুলনা-যশোরের এই এলাকায় জলাবদ্ধতা তীব্র হয়ে দেখা দেয় ডুমুরিয়া-ফুলতলার বিল ডাকাতিয়ায়, সেই ১৯৮৬ সালের দিকে। দশ বছরেরও বেশি সময়ে এই জলমগ্ন দশা বজায় ছিল।[২৫] অভয়নগর ও মণিরামপুর উপজেলার ২৬টি বিলের পানি নিষ্কাশিত হওয়ার নির্ভরযোগ্য স্লুইস গেইট হচ্ছে ভবদহের ২১ ভেন্টের গেইট। পাশেই ৯ ভেন্টের আর একটি স্লুইস গেইট। টেকা ও শ্রী-হরি নদীর সংযোগ স্থলে পায়রা ইউনিয়নে এই নিষ্কাশন গেইটটির অবস্থান। গেইটের দক্ষিণে শ্রী-হরি নদী আরও দক্ষিণে খুলনার ডুমুরিয়ায় ভদ্রা নদীতে গিয়ে মিশেছে। আবার, কেশবপুর থেকে বুড়িভদ্রা ডুমুরিয়ার চুকনগরে এসে ভদ্রার সঙ্গে মিশেছে। ভবদহ থেকে খর্ণিয়ার ব্রীজ এলাকা পর্যন্ত শ্রী-হরি-ভদ্রা প্রবাহটি দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে। বিপুল পরিমাণ পলি জমা পড়ে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে এই অবস্থা তৈরি হয়েছে।

এছাড়াও জলাবদ্ধ এলাকাগুলো হচ্ছে : কেন্দুয়া-মৌভোগ-কাতলী-বিল এবং এর আশেপাশের এলাকা; বিল ডাকাতিয়া এবং এর আশেপাশের এলাকা; ভবানিপুর-পায়রা-ইফতারপুল বিল; কাপালিয়া আড়পাতা বিল এলাকা; কেদারিয়া, সুজাতপুর, হাটগাছা; খুকশিয়া-ভরতভায়না বিল এলাকা; বিল বকর এবং এর আশেপাশের বিল এলাকা; গুনালী, পাথ রা-বুরুলিয়া এবং এর আশেপাশের এলাকা; শিংগার বিল ও মাধবকাঠি বিল এলাকা; বয়রা বিল এবং এর আশেপাশের এলাকা। এর কিছু কিছু এলাকা সারা বছরই জলাবদ্ধ থাকে। কিছু কিছু জলাবদ্ধ এলাকা বছরের কিছু সময়ের জন্য (৩ মাস) শুকিয়ে যায়।

জলাবদ্ধতা নিরসনে সরকারের উদ্যোগ ঃ ব্যর্থতার সাতকাহন

জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা এবং পাউবো একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তবে কোনোটিরই কার্যকর কোনো ফলাফল পাওয়া যায়নি। প্রকল্পগুলো হচ্ছে:

- South West Regional plan (1980)
- উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প (1986)
- উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প- ২ (CERP-II, 1993)
- ফ্যাপ- ৪ : ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ সালের প্রলয়ংকরী বন্যার পর বন্যা প্রতিরোধ, কৌশলের একটি অংশ হচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (Southwestern area water resources management project)। এই প্রকল্প সংক্ষেপে ফ্যাপ-৪ নামে পরিচিত।
- KJDRP (কেজেডিআরপি), খুলনা-যশোর ড্রেনেজ রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট। ১৯৯৪ সালে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুরু হয়। এতে খুলনা ও যশোর জেলার ১,০০,৬০০ হেক্টর এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় ২২৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। বলাইবাহুল্য, এটি এককভাবে এই এলাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ প্রকল্প। পাউবো ছয় বছর মেয়াদী এ প্রকল্পটি কৃষি সম্প্রসারণ ও মৎস্য বিভাগের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল, জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে কৃষি এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।[২৬] দুঃখজনক হলেও সত্যি, এই প্রকল্পের মাধ্যমে আশাপ্রদ কোনো ফল পাওয়া যায়নি।

জনগণ উদ্ভাবিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা : টিআরএম (টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্ট)

পোল্ডার ব্যবস্থা প্রবর্তনের এক দশকের মধ্যেই বিভিন্ন নদী ভরাট হতে শুরু করে। ১৯৭৩ সালে ভদ্রা অববাহিকার বাদুরিয়া স্লুইস গেইট সংলগ্ন এলাকায় প্রথম জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। ১৯৭৫ সালে সাতক্ষীরা এলাকার চরসহ বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। পাউবো প্রথম দিকে এই সমস্যাকে গুরুত্ব দেয়নি; পরবর্তীতে একের পর এক প্রকল্প নেয়। প্রকল্পগুলো কাঙ্ক্ষিত কোন ফলাফল দেয়নি। এতে জনগণ উপলব্ধি করতে পারে যে, নদীতে পলি রেখে এই সমস্যার সমাধান হবে না। শুধুমাত্র ভাবনার মধ্যে ধারণাটি সীমাবদ্ধ থাকেনি। জনগণ নিজ নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকার বাঁধ কেটে নদীর সঙ্গে বিলের সংযোগ ঘটাতে শুরু করে।

এই অঞ্চলে ১৯৮৬ সালে ভবদহ এলাকায় প্রথম বাঁধ কেটে দেয়ার ঘটনাটি ঘটে। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে ডহুরী, ১৯৮৯ সালে বুড়ুলী-পাতরা, ১৯৯০ সালে বিল ডাকাতিয়া এবং ১৯৯৩ সালে বিল ভায়নায় জনতা বাঁধ কেটে বিলের সাথে অবাধ জোয়ার-ভাটা চালু করে। কিন্তু পাউবো সবসময়ই জনগণের এই কর্মকাণ্ডকে খারাপ চোখে দেখছিল। অনেক জায়গায়ই পাউবো পুলিশ প্রশাসন দিয়ে জনগণের এই ভাবনা বাস্তবায়নে বাধা দেয়। জনগণের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। অথচ জনগণের ভাবনাটি যাচাইয়ের জন্যে পাউবোকে বারবার অনুরোধ জানানো হয়। জনগণের দাবির মুখে পাউবো ১৯৯৭ সালে বিল ভায়নায় জোয়ার-ভাটার কার্যক্রমটিকে তাদের মনিটরিং ও সমীক্ষা (স্টাডি)র আওতায় নেয়। সমীক্ষা প্রতিবেদনে জনগণের এই উদ্যোগকে টিআরএম নাম দিয়ে এর কার্যকারিতার পক্ষে মত পোষণ করা হয়।[২৭] কিন্তু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পাউবো অপকৌশলের আশ্রয় নেয়। জনগণের ধারণার সাথে সঙ্গতি রেখে সুষ্ঠুভাবে তারা টিআরএম বাস্তবায়ন করেনি। ফলে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই অঞ্চলে মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রধান দ্বন্দ্ব নিরসন না হয়ে দীর্ঘায়িত হয়। যদিও পাউবো পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা তথা যেকোনো প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণের কথা জোরেশোরে বলে, কিন্তু জনগণের অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণাটি গ্রহণ করছে না।

অথচ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম-সিইজিআইএস জনগণের এই ভাবনাকে অত্যন্ত উঁচুমানের এবং বিজ্ঞানসম্মত বলে আখ্যা দিয়ে বলেছে : 'জোয়ার-ভাটা কার্যক্রম অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক, পরিবেশ বান্ধব, প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে বাস্তবায়নযোগ্য এবং জনগণের কাছে অতিমাত্রায় গ্রহণযোগ্য।' সিইজিআইএস-এর এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পাউবো জনগণ উদ্ভাবিত জোয়ার-ভাটা কার্যক্রমকে টিআরএম নাম দেয়।

৪. উপসংহার

একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, পোল্ডার ব্যবস্থা এই অঞ্চলে জলাবদ্ধতার মতো মানবিক বিপর্যয়ের জন্যে দায়ী। পোল্ডার ব্যবস্থার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফল হিসেবে জলাবদ্ধতার মতো অভিশাপ-দুর্ভোগ লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে নেমে এসেছে। যা থেকে মুক্ত হওয়ার আপাত কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অবস্থাদৃষ্টে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, বর্তমানের জলাবদ্ধতা আরও বাড়বে। হয়তো এক সময়ে গোটা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে জলাবদ্ধতা দেখা

দেবে। হাজার বছরের মানুষের জীবন-জীবিকা, বসবাসের ধরণ, অভ্যাস-সংস্কৃতি সবকিছু পাল্টে যাবে। মানুষকে হয়তো নতুন ধরনের জীবন-যাপন প্রণালী বেছে নিতে হবে। বিপর্যয়ের কবলে পড়বে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন। সুন্দরবনের অভ্যন্তরীণ নদী-নালা-খাল শুকিয়ে সেখানকার ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে। লবণাক্ততার মাত্রা বেড়ে গিয়ে নোনাকেন্দ্রিক প্রতিবেশের জন্ম দেবে। ফলে হারিয়ে যাবে ম্যানগ্রোভ জীববৈচিত্র্য। ভয়াবহ এই অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পাউবো তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী নানা কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। কিন্তু তাদের প্রকৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মপন্থায় জলাবদ্ধতা নিরসনতো হচ্ছেই না, বরং বাড়ছে। বিষয়টি এমনি দাঁড়িয়েছে যে, পাউবো যেন জনগণের প্রতিপক্ষ। জনগণের ভাবনা পাউবো কর্তাদের পছন্দ হয়না, তাঁরা জনগণের জ্ঞানটিকে কাজেও লাগাতে চায় না। একারণে মানুষের সকল অভিযোগের লক্ষ্যবস্তু পাউবো। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ পাউবোকে আর পছন্দ করেনা, এমনকি পাউবোকে এলাকার সকল দুর্ভোগের জন্যে দায়ী করে। অথচ এমনটি হওয়ার কথা নয়।

সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, যে পোল্ডার ব্যবস্থা নেদারল্যান্ডের মতো দেশকে স্বস্তি দিল; সেই পোল্ডার-ব্যবস্থা আমাদের জন্যে কেন দুর্ভোগ বয়ে আনলো? এই প্রশ্নের জবাব খোঁজার জন্যে আমাদেরকে বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ড -এই দুটি দেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে ওঠার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

আমরা সকলেই জানি, বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ। বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে পৃথিবীর অন্যতম বড় দু'টি নদী -গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রকে ঘিরে এর জনপদ গড়ে উঠেছে। পাহাড় বাহিত নদীগুলো যেমন পলি বয়ে এনেছে, তেমনি সাগর থেকে ওঠা অসংখ্য নদীও বিপুল পরিমাণে পলি বয়ে এনেছে। আমাদের আলোচিত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলটির ভূমি গঠনের অসমাপ্ত পর্বেই এখানে জনবসতি শুরু হয়। প্রকৃতিকে নিজের মতো করে মানুষ তাঁর আবাস গড়ে তুলেছিল। নোনা পানি ঠেকাতে মানুষ বাঁধ দিতো, প্রয়োজন না হলে বাঁধ কেটে দিত। বিলের পাড়ের উঁচু ভূমিতে মানুষের বসবাস ছিল। মানুষ বিলে ফসল ফলাতো, মাছ ধরতো, সবজির চাষ করতো। প্রাচুর্য ছিল সবকিছুরই।

মনে রাখতে হবে, ভূমি গঠনের অসমাপ্ত পর্বেই নেদারল্যান্ডের প্রযুক্তিতে সিইপি বাস্তবায়িত হয়। নেদারল্যান্ড দেশটি সমুদ্রপৃষ্ঠের তুলনায় নীচুতে অবস্থিত। সাগরের পানিকে তারা বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে মানুষের বসতি গড়ে তুলেছে। ওই প্রযুক্তি এখানে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসংখ্য নদ-নদী-খাল-নালা, দিনের ২৪ ঘন্টায় চারবার জোয়ার-ভাটা, জোয়ারের পানিতে বিপুল পরিমাণ পললের উপস্থিতি যথাযথভাবে বিবেচনায় নেয়া হয়নি বলে মনে হয়। নেদারল্যান্ডের নদীতে জোয়ার-ভাটার সময়কাল এতো বেশি নয় এবং সেখানকার নদীতে পললও নেই। নেদারল্যান্ডের নদীগুলো একমুখী স্রোত, আমাদের মত টাইডাল রিভার বা জোয়ার-ভাটার নদী নয়। উপরন্তু নেদারল্যান্ডে পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। সেখানকার মানুষের জ্ঞানকে ধারণ করে তাদের পানি ব্যবস্থাপনা, নদী ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে। আর আমাদের দেশে পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষত সিইপি বাস্তবায়ন ও অন্যান্য নদী শাসন বিষয়ক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বিদেশী প্রযুক্তি অন্ধের মতো অনুসরণ করা হয়েছে। এবং সকল কার্যক্রমগুলোই হচ্ছে পানি নিষ্কাশন করা বা বৃত্তাকার ভূমি থেকে পানি বের করে দেয়ার পরিকল্পনা। পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোনোভাবেই লোকজ জ্ঞানকে বিবেচনায় আনা হয়নি। অথচ নদীকে ঘিরে এখানকার বসতি, জীবন-ধারণ ও হাজার বছরের

সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। নদীকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করা হয়। বলা হয় নদীমাতৃক দেশ। সেখানে পানি বা পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নামে রাষ্ট্রযন্ত্র তথা পাউবো মানুষের অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করে চলেছে।

তথ্যসূত্র

১. বদরুদ্দীন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৭৪, পৃ. ৩৩

২. ইরফান হবিব, মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭০৭), কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৫, কলকাতা, পৃ. ১৭

৩. http://nda.erd.gov.bd/en/c/publication/national-water-policy-1999, p. 7

৪. ইরফান হবিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৫. গৌরাঙ্গ নন্দী, জালের ফাঁদে, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও খাদ্য নিরাপত্তায় প্রতিক্রিয়া, ২০০৭, পৃ. ২০

৬. Coastal Environmental Management Plan for Bangladesh; Volume Two: Final Report United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Bankok, Thailand. ST/ESCAP/618

৭. গৌরাঙ্গ নন্দী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৯. Statataicstical Year Book of Bangladesh, 1981 Bangladesh Bureau of Statatics Stablishement Division Cabinet Sectretariet Government of the republic of Bangladesh

১০. Angeles (1996) : Overview of Water Management in On-farm Water Management Manual, Development of Agriculture Engineering, Munoz Nueva, Ecija, Phillippines, p. 5

১১. H.E. Rashid, (1991) : Geography of Bangladesh. University Press Limited (UPL), Dhaka, p. 17-18

১২. এ এফ এম আবদুল জলীল, সুন্দরবনের ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, ঢাকা, পৃ. ৩২

১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম দে'জ সংস্করণ, পৌষ ১৩৯৪, জানুয়ারি ১৯৮৮, প্রথম প্রকাশ ১৩২৪, পৃ. ৩৮

১৪. A.A. Huq Rahman, S. and Conway, G.R. (1990) : Environmental Aspects of Surface Water Systems of Bangladesh. University Press Limited (UPL). Dhaka, p. 43

১৫. গৌরাঙ্গ নন্দী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮

১৬. Angeles (1996) : Overview of Water Management in On-farm Water Management Manual, Development of Agriculture Engineering, Munoz Nueva, Ecija, Phillippines

১৭. A. Ghani, (1987) : Improved Water Management for Rice Irrigation System in Bangladesh.D.Phil Thesis, Agriculture and Irrigation Engineering. Utah State University, Lugan, Utah, USA, p. 3

১৮. A. A. Bishop, (1974) : On-farm Water Mnagement Paper Present at Seminar on Soil Management and the Development Process in Tropical America, Cali, Colombo, p. 9

১৯. Atiur Rahman, Beel Dakatia, University Press Limited (UPL), 1995, Dhaka, p. 4

২০. সমীক্ষা প্রতিবেদন, খুলনা-যশোর পানি নিষ্কাশন পুনর্বাসন প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ সংক্রান্ত সমীক্ষা (সার সংক্ষেপ), সমীক্ষা সংক্রান্ত চূড়ান্ত কর্মশালা, বিডি হল যশোরে ২০ মে ১৯৯৮-এ সিইজিআইএস কর্তৃক উপস্থাপিত

২১. Atiur Rahman, Ibid, p. 9

২২. সমীক্ষা প্রতিবেদন; খুলনা-যশোর পানি নিষ্কাশন পুনর্বাসন প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ সংক্রান্ত সমীক্ষা (সার সংক্ষেপ); সমীক্ষা সংক্রান্ত চূড়ান্ত কর্মশালা, বিডি হল যশোরে ২০ মে ১৯৯৮-এ সিইজিআইএস কর্তৃক উপস্থাপিত

২৩. সুকুমার মিত্র, সুন্দরবনের ভাঙ্গাগড়া, সংহতি কেন্দ্র, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ২৮

২৪. Atiur Rahman, Ibid, p. 21

২৫. শশাঙ্ক মন্ডল, ব্রিটিশ রাজত্বে সুন্দরবন, জনসংহতি কেন্দ্র, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৩৩

২৬. গৌরাঙ্গ নন্দী, বিল ডাকাতিয়ার জলাবদ্ধতা এবং; সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২২ বর্ষ ৫০ সংখ্যা ১৩ মে ১৯৯৮

২৭. সমীক্ষা প্রতিবেদন, খুলনা-যশোর পানি নিষ্কাশন পুনর্বাসন প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ সংক্রান্ত সমীক্ষা (সার সংক্ষেপ), সমীক্ষা সংক্রান্ত চূড়ান্ত কর্মশালা, বিডি হল যশোরে ২০ মে ১৯৯৮-এ সিইজিআইএস কর্তৃক উপস্থাপিত।

ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-2, December 2020

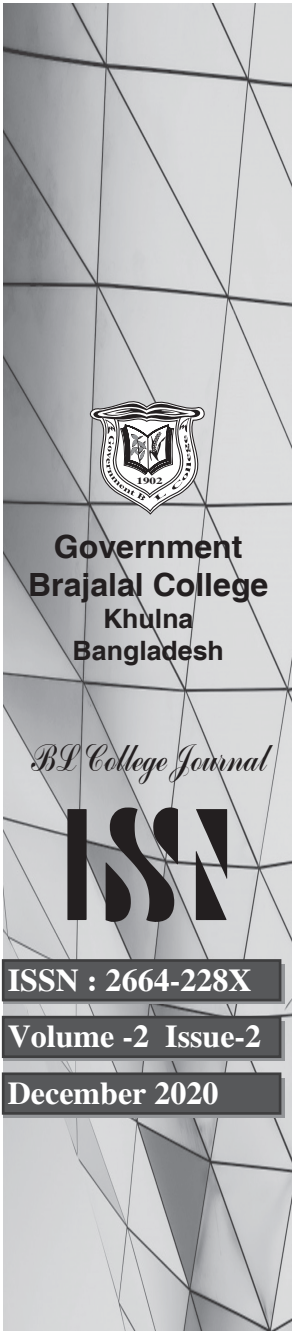

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

English Section

Contents

English Section

- Understanding Philosophy as a Rational World Outlook
  Haroon Rashid 85-100
- A Sociological Study on Violence against Married Women in Bangladesh Society
  Dr. Selina Ahmed 101-112
- A Numerical Simulation of the Nested Logistic Population Model for the Classified Population of Bangladesh
  Md S Hossain & L S Andallah 113-121
- Reflections of the City of Kabul: Pre and Post-Taliban in Khaled Hosseini's *A Thousand Splendid Suns*
  Dr. Sabreen Ahmed 122-129
- Effect of Music on Human Mind and Emotion
  Dr. Sudarshana Baruah 130-141
- The Collision of Human Emotions and Money-Logic in The Merchant of Venice
  Oindrila Ghosh, PhD 142-148

Volume -2, Issue-2, December 2020

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-2, December 2020
PP· 85-100

Understanding Philosophy as a Rational World Outlook

Haroon Rashid

Abstract

Philosophy, as the most ancient world outlook, is the first form of theoretical formulation of thoughts and principles of life and the world. Fundamental problems of life and the world were first formulated in mythology or religion in the consciousness of primitive man. According to the primitive conception, there is a supernatural or spiritual power behind nature. Mythology or religion, although the most ancient form of world outlook, does not provide rational grounds for its principles and conclusions. Philosophy arose out of the struggle against mythical and religious consciousness and attempted to provide a rational explanation of life and the world. Philosophical problems were first formulated and took a definite shape by ancient Greek thinkers who attempted to show that objects and phenomena of the world could be understood without the idea of supernatural beings. There were natural causes for natural events. So, the emergence of man, the earth, and the entire universe could also be explained by natural causes. This is how rational thinking began, and the fundamental concepts of philosophy took definite shape. Explaining the nature and problems of philosophy, this paper would show that philosophy, as a rational world outlook, formulates the basic principles of nature, society, and man and offers rational (theoretical) grounds for its principles and conclusions.

Haroon Rashid
Professor
Department of Philosophy
University of Dhaka
e-mail: haroonrashid57du@gmail.com

Keywords

Philosophy, Rational, Theory, Outlook, Thought, Wisdom

Introduction

Philosophy, as the most ancient discipline of human knowledge, is the first form of conceptualization, i.e., formulation of thoughts and principles of life and the world. Philosophical problems, i.e., problems concerning life and the world, were first formulated in mythology or religion, an imagined reflection of the reality that arose in the consciousness of primitive man. According to this primitive conception, there is a supernatural or spiritual power behind nature. Mythology or religion, although the most ancient form of world outlook, can't be considered to be rational knowledge because of its way of interpretation. It does not provide any rational interpretation of the basic questions of life and the world. Philosophy arose as a struggle against the mythical and religious consciousness and attempted to provide a rational explanation of life and the world.

Philosophical problems were first formulated and took a definite shape by ancient Greek thinkers. The accumulation of knowledge through practical activities showed ancient Greek Philosophers that many phenomena could be understood without the so-called idea of supernatural beings. There were natural causes for natural events (Like floods, falling of rain or hail, or natural calamities). So, the emergence of man, the earth, and the entire universe could also be explained by natural causes. This is how the fundamental concepts of Philosophy were taking definite shape in ancient Greek. There is no denying the fact that 'Philosophy arose at the dawn of civilization in ancient India, China, and Egypt, but it first achieved classical form in ancient greek'.[1] There remains a controversy as to whether Philosophy had its beginning in Greece or India. Western Philosophers maintain that, although Indian Vedic systems are older than Greek philosophy, they are theological rather philosophical in character. As Bertrand Russell says, 'Philosophy, as distinct from theology, began in Greece in the 6th century BC."[2] This view is not tenable. Indeed, the basic question of life and the universe was first raised by the Greek Philosophers[3], and philosophy took a definite shape with a systematic enquiry and achieved a classical form in ancient Greece. But that does not mean that Indian philosophy is theological rather than philosophical. There is no doubt that the Greek thinkers, as the first system-builders of Philosophy, formulate the basic principles of life and the universe with a rational investigation, but it would be unfair to consider Indian Philosophy as theology. Almost all the issues of philosophy were discussed by the Indian thinkers and all the branches

of philosophy were emerged in Indian thinking.

Theoretical Inquiry

The early Greek Thinkers (Thales, Anaximenes, Anaximander, Parmenides, Heraclitus, and others) were mainly interested in understanding the origin of the diverse phenomena of nature. Thus, the philosophy of nature or natural philosophy emerged as the first historical form of philosophical thought. Philosophy emerged out of the need for a theoretical inquiry, and it is the first historical form of theoretical knowledge. Initially, philosophy attempted to answer the questions that had already been posed by the mythological and religious view of the world. But philosophy had a different way of answering these questions. While the basis of mythology and religion was imagination and faith, a philosophy based its theoretical analysis on the rational investigation.

Philosophy is a world outlook that offers theoretical (rational) grounds for its principles and conclusions. This is what distinguishes philosophy from religious or mythological world outlook based on faith in the supernatural. As a world outlook, philosophy is a system of highly formulating the basic principles of nature, society, and man. It seeks to work out the basic principles of social, political, moral, and aesthetic spheres of life. Everybody forms his own particular view of the surrounding world, but this view consists of fragments of various contradictory ideas without any theoretical basis. Philosophy, on the other hand, is a system of ideas, opinions, and conceptions of nature, society, and man. It does not merely formulate principles (theoretical basis), but it provides rational (or logical) arguments for these principles.

Very often, it is said that the main function of philosophy is to form general concepts, to formulate theories, and in this sense, it is a theoretical activity that has nothing to do with our practical life. This is true that philosophers emphasise theory rather than practice, but that does not mean that philosophy is merely a theoretical activity apart from our practical life. However, philosophy is a theoretical activity of practical life, and in this sense, it is both a theory and a practice. As a theory, it explains basic concepts and forms general ideas, and as a practice, it relates these concepts to practical life and finds the way of making life meaningful by conducting good life. In fact, philosophical theories arise out of man's practical activities. The misconception that philosophy is merely a theoretical activity is because most of the philosophers from Plato to Hegel emphasised theory rather than practice. It was Marx who first broke

this philosophical tradition by clearly declaring that "Philosophers have only interpreted the world in various ways, however, the point is to change it".[4] Max's thesis emphasises the practical role of philosophy and reflects that the function of philosophy is not only to make generalizations or formulate theories but also to relate those to practical activities for finding the way of changing the world.

There can be no doubt that philosophy is always, in one way or another, linked with the theoretical assimilation or formulation of the world, but theory, apart from practice, cannot be emerged. Theory emerges out of practice and on its basis, and its goal is to serve practice. Man formulates theories based on practice, and he uses these theories for practical purposes. This is how theory and practice are interrelated.

Philosophy arises out of man's curiosity to know about the world. Man is curious to know the answers to certain fundamental questions like- What is the basic substance of the universe out of which everything arises? What is the essence of nature? What is the relation between consciousness and nature, between the spiritual and the material, between the ideal and the real? What is a man, and what is his place in the world? Is he capable of knowing the world, and if so, how is it possible? Will nature survive, or will it be annihilated as a result of scientific and technical progress? Will oppression and social injustice disappear from the world, or will they persist forever? These and many other similar general questions are of profound concern to every thinking man. To give the correct answer to these questions, one should know philosophy. From time immemorial, man has attempted to find answers to these questions, which make up the content of philosophy.

Pursuit of Wisdom

Literally, philosophy means love of wisdom. Generally, love implies a pursuit. In this sense, philosophy is called the pursuit of wisdom. 'Philosophy is the love of wisdom' does not mean that anybody who knows how to take appropriate steps in life can be called a philosopher. There is a difference between a man who has worldly wisdom and a philosopher who is concerned with fundamental problems, i.e., who is busy tackling problems that are of vital importance to man. To avoid false steps or to take the right steps in life is worldly wisdom. A common man is concerned with such type of worldly knowledge, while a philosopher is concerned with rational knowledge. The main feature of wisdom was understood by ancient Greek philosophers who define wisdom as a search for the truth (Plato),

as the knowledge of ultimate principles (Aristotle). Ibn Sina (Avicenna) says: "In our mind, wisdom can be of two kinds: First, it is perfect knowledge... Second, it is a perfect action."[5] Hence a distinctive feature of wisdom is the unity of knowledge and behaviour, that kind of knowledge that helps man to choose which path to take in life, not that which is abstract from vital human needs. Ancient Indian philosophers aimed to provide man with a guide to an enlightened life. Modern Indian philosophers write in the same view that "The aim of philosophical wisdom is not merely the satisfaction of intellectual curiosity, but mainly an enlightened life led with far-sight, foresight and insight."[6] Thus, wisdom always implies a practical philosophy and that it is always connected with man's interests, requirements, and goods.

Nobody would object to this that wisdom is a practical philosophy. Yet, some think that real wisdom consists only of the truth, and others argue that knowledge serves no purpose when man's personal fate is at stake. Quite the contrary, knowledge brings doubt, disillusionment, and grief in its wake. The pragmatists say that it is much more important to enjoy comfort and peace of mind. From this position, a genuinely wise man will not engage in a search for the truth. But in the world we live in, true wisdom consists in each man's ability to see the need for a struggle for peaceful coexistence. The wisdom which conflicts with the knowledge of the real world is more often used to justify the most inhuman actions. Such kind of wisdom is worldly wisdom and is contrary to the main progressive trends in society's development.

Philosophical knowledge (or wisdom), however, is distinct from so-called worldly wisdom. As a form of theoretical knowledge, its principles and main concepts are a result of the generalisation of a vast number of facts of the most diverse spheres of man's life and activity. Each man consists of two persons: a "little Ego" (individual ego), in which the unique nature of his life circumstances is reflected, and a "big Ego" (collective Ego), which makes him part of mankind as a whole. Philosophy is concerned with the problems facing man's "big Ego", i.e., the general problems of human existence.[7]

Thinking about Thinking

In a general sense, philosophy is an outlook of life and the universe. Every Thinking man has an outlook of his life and the world he lives in. In this sense, every man is a philosopher. However, a philosopher is one who is not satisfied with mere thinking, he is one who thinks about thinking, who evaluates patterns of thinking. Philosophy, in this sense, is

a 'thinking about thinking'[8], i.e., rational and critical thinking. Philosophers have often tried to find a pattern of thinking which will certainly give about the world. Philosophical arguments are a way of going from one belief to another, a belief that is certain; while Philosophical doubt is a way of finding out what beliefs are not certain. Many Philosophers have doubted beliefs (for example, the existence of God) that others have thought certain, and other philosophers have tried to find logical arguments to support these beliefs. Rationalist philosophers are optimistic that we can get certainty about the world by using logical arguments. Can we have certain beliefs about the world around us? Many of our beliefs about the physical world cannot be supported just by logical arguments. Our evidence for them depends on induction, not on deduction. But thinking about induction suggests that very few beliefs about the physical world can be completely certain. Thus our beliefs about the world around us can never be completely certain. If so, then our reason becomes powerless. But that is not the case. Since some uncertain beliefs are more reasonable than others, so we can live without certainty, not without reason (rational thinking). This is what we may call the philosophical way of thinking, or in other words, 'thinking about thinking'.

The philosophical way of looking at the world revolutionized human thinking because it radically rejected the mythical and traditional approaches. The philosophical way of looking at the world means the rational interpretation of the world. This rational way of understanding reality contrasts with the primitive mythical and religious approach. Myths and religions explain reality in terms of supernatural beings or God beyond nature. Different primitive cultures, however, developed quite different and inconsistent views about the nature of God and the origin of the world. Mythical thinking is not rational in the sense that it is based on beliefs unwarranted by available evidence, violates basic rules of logic, stresses unquestioning loyalty to its central beliefs, and is a closed system of ideas that resists new ideas. Philosophy, on the other hand, is rational and critical, recognizes no authority except reason, and is open to constant questioning and rational criticism of beliefs with the intent of acquiring new knowledge. This rational and critical aspect of philosophy serves as an important check against false beliefs.[9] To attain true knowledge and beliefs, the mind must get rid of falsehood and prejudice, and it is the philosophy that provides us with true knowledge through its rational approach.

Philosophy, from the Marxist point of view, is a rational world outlook, a view of the world- of nature, society, and man's

place in it. Ancient Greek philosophy had been the first to rise to the level of the rational world outlook. Marx has repeatedly underlined the creativity and originality of ancient Greek philosophers. As he says, "The Greek will forever remain our teachers"...[10] "Recent philosophy has only continued the work begun by Heraclitus and Aristotle".[11] The historical importance of Greek philosophy lies in the materialist trend that explains nature from nature itself, from the laws inherent in matter, and in its unique contribution to the development of dialectics that explains nature under the laws of motion in matter. Greek philosophy, in this sense, is a grand monument of human culture. 'Its manifold forms', wrote Engels, 'contain in embryo, in the nascent state, almost all later modes of outlook on the world.'[12]

From of Social Consciousness

Philosophy is the reflection of social reality and social reality is reflected through social consciousness. In this sense, philosophy is a form of social consciousness. Philosophy, as a form of social consciousness, belongs to the sphere of human culture and is closely connected with its different fields. It is born of their interaction and their internal contradictions. By culture is meant the dynamic totality of the result of human activity. Material production is the most important form of human activity, whereas all other forms, including artistic, religious, and theoretical are secondary and subordinate to it. But that does not mean that they merely reflect man's material (practical) activity. Arising from practice, they themselves become part and parcel of objective reality and make a powerful impact on all aspects of social life. Material (productive) and spiritual (artistic and religious) appropriation of the world is different from its theoretical comprehension.

Philosophy emerged as the first historical form of the theoretical comprehension of the world. The difference between theoretical and practical attitude to the world is relative. It arises in the process of social development when philosophy turns into an important spiritual tool (consciousness) for transforming the world, an instrument for the practical transformation of society and man. The philosopher in fact represents but the culture of his time, his people, his class. The world outlook he expounds is not only a cognitive but also axiological and ideological attitude to reality in the form of social, political, aesthetic, and ethic. He approves or disapproves, justifies, or denounces theoretical thought from the position of reason.

Philosophy, as a form of social

consciousness or intellectual culture, is an expression of man's theoretical mastery of the world. There are different stages of the development of society, called socio-economic formulations.[13] Each formulation develops its own world view that reflects, in the final analysis, the social being and social consciousness of the epoch. The world-view of primitive communal society was mainly represented by mythology. Philosophy, as a world-view, comes into being in a slave-owning society. The first world-view systems that may be termed philosophical emerged almost simultaneously in three centres-Ancient Greece in the late seventh-early sixth century BC., India in the sixth century BC., and China in the sixth-fifth centuries BC. Both the West and the East were passing at that time from an early slave-owning society to a developed slave-owning society. It was a transition from a system of slavery providing the slave-owners with the means of bare subsistence to a system based on the production of surplus-value. The entire social structure was undergoing radical transformation: cities were rapidly turning into centres of economic and political activity. All these changes made for the spread of slavery and heightened the struggle between landed aristocracy and warlords on the one hand, and the free population of cities, on the other. The basic contradiction underlying all social developments was the class contradiction between the slave-owners and the slaves. Such was the background for the emergence of philosophy.

Ancient philosophy is the philosophy of a slave-owning society and the pivotal contradiction of this society is one between domination and slavery, master and slave. It is an expression of man's alienation since the slave is reduced to a thing. According to Marx, one part of this society (the slave owners) treats the other part as a means of production. The slave master relation permeates through the entire life of society and cannot but tall on the relations between its free members. Any of them, in principle, can lose his personality and turn into a slave (a "thing", "body", "speaking tool"); he can be taken prisoner, go bankrupt, find himself in bondage, and fall into poverty. The seventh-fifth centuries B.C. were marked by a radical change in the life of society. The development of productive forces opened up a possibility for a transition to a new type of slave labour as a means of profit extraction. This brought about an essential shift in social relations and, even to a great extent, in social consciousness (ideology).

Philosophy and Science

In the ancient world, philosophy was the 'science of sciences', but the various

specialised branches of scientific knowledge – astronomy, physics, chemistry, biology, sociology, ethics, and so on, having evolved historically out of philosophy, broke away from it and began to develop independently. But this view is quite wrong concerning scientific philosophy. On the other hand, the disassociation of philosophy from the specialized sciences undoubtedly encouraged the formation of specific subject-matter of philosophical inquiry. On the other hand, the development of the specialised sciences helped to identify certain problems of world outlook, which cannot be solved within the framework of specialised science. To solve these problems, we need a generalised science, which is philosophy.

Every particular science deals with the particular department of nature and investigates definite laws about it; for example, physics deals with matter, biology with living beings, and so on. However, there is no science which studies laws that apply equally to the phenomena of nature, the development of society, and human thought. It is these universal laws that form the subject-matter of philosophy. Philosophy, in this sense, cannot be the science of sciences, rather it may be called the science of the more general laws of nature, society, and human thought.

The problems of the world can be classified as particular and general, while science deals with particular problems and discovers laws about those, philosophy is concerned with general problems and formulates general laws about those. Every science, however, uses certain general concepts or categories, for example, the concepts of "causality', "necessity", "law", "form", "content" and so on. Particular or specilised sciences naturally do not study these categories but use them as readymade forms of thinking. Thus, chemistry investigates the laws of the chemical process, and biology, the laws of life. It is the philosophy that studies these categories and investigates law as the essential connection between phenomena, a university in all its varied forms. No scientist can do without such categories (most general concepts) as law, regularity, contradiction, essence and phenomena, cause and effect, necessity and chance, content and form, possibility, and reality. The philosophical categories, as the instruments of thought, express the most general connections between the phenomena and generalise the historical experience of man's investigation of the world.

The study of philosophical categories, however, is no substitute for studying specific processes. Neither it offers

readymade solutions to the questions that are studied by the specialised sciences, Nor rather it arms them with a scientific–philosophical world outlook, a general method of science. This scientific–philosophical method is based on the application to cognition of the most general laws of development of nature, society, and thought. Scientific philosophy like dialectical materialism, as the Marxists claim, provides us with knowledge of these laws. Pre- Marxist philosophy divorces the science of thinking (logic) from the theory of knowledge (epistemology) and separates both of these from the theory of beings or existence (ontology). Marxist philosophy rejects this metaphysical opposition and provides grounds for the principle of the unity of dialectics, logic, and epistemology. That is to say, the laws of cognition (epistemology) and thinking (logic) are reflections of the general laws of being (reality) in human consciousness.

All spheres of present-day life are changing. Man himself is changing. Now, what causes these changes? Or in other words, what are the causes that transform all aspects of human life? What are its directions and motive forces? What may be the consequences of the scientific and technological revolution? Are social oppression and economic exploitation eternal? Where is mankind heading? Specialised sciences cannot answer these vitally important (basic) questions. These are philosophical questions, i.e., questions of how we look upon the world, and the answers to them are to be found in philosophy.

In the early stage of mankind's development, philosophy was the "science of sciences" because scientific knowledge was weakly developed and rudimentary. Gradually, as human knowledge expanded, particular sciences began to spring up, first natural sciences (mathematics, physics, chemistry, etc.)- and then social sciences (such as history, economics, etc.). Throughout its history, philosophy has tackled the same set of questions, while each concrete science, having solved a problem, never returns to it but poses and elaborates new ones. In this sense, philosophy may not be considered to be a science. Philosophical problems, however, are called "eternal" not because they cannot be solved, but because each epoch poses them in its own way. As changes occur in society, life conditions, scientific knowledge, relationships between man and the world around him also change. Philosophers have always wondered about the sources of all changes that are taking place in the world, which causes the diversity of things, events, and phenomena.

Fundamental Problems

Philosophy, as we know, started its journey with the fundamental problems of life and the world. What shall we begin with? What lies at the basis of any world outlook? First of all, what one must find out whether one is to determine one's attitude to the world. In terms of the philosophical world-view, the material world (nature) exists outside of and independently from man, of which man is part of this world. But man as a part of it can think and cognise the whole of which he is a part and can transform it with the level of knowledge acquired. The relation between this "part" and "whole" determines, in the final analysis, the entire specificity of philosophical problems: the relation between being and thinking, between object and subject, matter and consciousness, nature and spirit, nature and society, society and man, etc.

Immanuel Kant, founder of classical German idealism-beliefs that a philosopher must answer three questions: "What can I know"? "What must I do"? "What can I hope for"?[14] However, these questions imply a more general and fundamental one. In fact, man learns things, indulges in hopes, and sets himself goods only because he is endowed with a mind, consciousness, and will, and is capable of knowing and interpreting the world around him. Man is not only muscles and nerves, not only a body; he is also endowed with a "soul".[15] The answers to all particular questions depend on the fundamental question: What is the "soul", the spirit, or the ideal or consciousness; where does it come from; and how is it connected with inanimate nature, matter, or the material world?

Now the fundamental problem of philosophy is that of the relation of consciousness to being (or matter), of mind to nature. To understand the relation between man and the world around him, it is necessary to explain the nature of the fundamental question, i.e., Whether mind or nature appears first, whether consciousness can exist by itself outside of the human brain, and Whether nature can emerge and exist without the spiritual principle. Let us consider one of the questions Kant regarded as fundamental for philosophy: "What must I do"? In other words, what should be the rules and norms of human conduct or behaviour? This is a question of man's morals. But to understand how to behave, one should first find what morals or ethics are? Why do men defend his honour and dignity? Why does he obey his conscience, and do his duty? In answering these questions, we have to explain how and why the sense of duty, justice, virtue, and honour emerged in man. We have evidently

returned to the question of the relationship between the spiritual and the material, the consciousness, and being. Hence it is the most general and fundamental question in philosophy, and one cannot tackle specific problems without solving them.

Philosophers, in solving this fundamental issue, take different positions and are occupied with different questions. However, they turn to the same problem- The interrelations between man and the world, the mind, and nature. Can man cognise the world? In what way does reality reflect his feelings and thoughts? Is he able to change the world? Is art just a means for an artist to express himself, or a reflection of the world? - all these questions are particular aspects of one general (fundamental) issue. The answer to the question, whether the mind or the external world, is primarily determined by the evolution of philosophical thought. It was Engels who substantiated the fundamental question of philosophy and revealed its role in the formulation of philosophical theories. As he says: "The great basic question of all philosophy, especially of more recent philosophy, is that concerning the relation of thinking and being."[16]

The fundamental issue of philosophy lies in the question – which is primary or which is the determinant in the complex "being-thinking" or "matter-consciousness" relationship. Without resolving this issue, it is not possible to answer other questions. Consequently, any philosophical study begins with resolving this basic issue. This issue is of great importance for everyone because the solution of all vital problems depends on it. This, however, is true not only of the philosophical investigation but also of scientific investigation, of arts, politics, and so on. Each scientist, in investigating a scientific problem, for example, to solve the riddle of the universe by discovering a new celestial body, is quite positive that the body in question is not just a play of his imagination but exists in reality, independently of his consciousness (i.e., objectively). If he believed the opposite, he would rely on the power of his imagination only (i.e., subjective faculty). An artist, in the first instance, sees the real world (objective) as a source of his own art; in the second, he regards his inner life, his mood, and emotions that are (subjective) not in any way connected with the world of real things. The fundamental issue is important for a politician and a statesman as well. For example, can society be changed by influencing the human mind alone, by enlightening and educating man, or should the conditions under which he lives also be transformed?

The fundamental question of philosophy

is no figment of the imagination; it lies in the fundamental facts of our lives. There are material phenomena (such as physical and chemical phenomena), but there are also spiritual or mental phenomena (such as consciousness and thought). This distinction between being and thinking enters into any act of human consciousness and behaviour. Every individual distinguishes himself from that which surrounds him and is aware of himself as something different from everything else. No matter what phenomena we are considering, it can always be placed in the sphere of either the material (the objective) or the spiritual (the subjective). So the question of the relationship between the material and the spiritual is rooted in the basic facts of our lives.

The fundamental question of philosophy was formulated based on the study of the entire history of philosophical thought and human activity. Any act of human consciousness involves a delimitation between the subject (the Knower) and the object (that which is known); that is the relations between the material (nature of the surrounding world) and the spiritual (consciousness or thinking) exist in real life (objectively) regardless of human consciousness. These relations, however, are realised and interpreted by the man in different ways- either materialistically or idealistically. Materialists assert that reality is material and the spiritual is the product of the material, while idealists assume that reality is spiritual and the material is the product of the spiritual. So the basic philosophical question is that of how the spiritual is related to the material, how consciousness is related to the objective world. It becomes evident in Engels writing that the answers, which the philosophers gave to this question, split them into two great camps-idealism and materialism.[17]

Conclusion

All the diverse philosophical schools and trends, in the final analysis, leads either to materialism or to idealism. Materialism and idealism are the two rival theories of explaining the world. While materialism explains the world in terms of matter, idealism does it using spirit or consciousness. Every question or issue of the world has either a materialist or an idealist way of interpretation. It becomes evident if we look at the history of philosophy. The entire history of philosophy is a history of conflict between materialism and idealism. As Lenin says, "Recent philosophy is as partisan as was philosophy two thousand years ago. The contending parties are essentially... materialism and idealism".[18] This is why the relationship of the spiritual to

the material is the basic philosophical question.

We may think that the fundamental question of philosophy does not exist and the distinction between the spiritual and the material is relative. it is not clear whether "matter" and "spirit" actually exist, rather they are merely logical constructs (as Bertrand Russell thought). But it is not possible to ignore the distinction between thinking and the object of thought (a philosophical process, for example), between sensation and the object of sensation, that which is sensed or perceived by the eyes, by the ear, and so on. The notion of an object is one thing, but the object itself, existing independently of that notion, is quite another. This distinction between the spiritual and the material, the subjective and the objective, is registered by the fundamental question of philosophy.

If we understand the meaning and significance of the fundamental question of philosophy, we will be able to find that materialism and idealism are two main streams amid the diversity of philosophical doctrines and trends. That is a philosophical doctrine, no matter how original, is ultimately either materialist or idealist in essence. However, it is not the Marxists who divide philosophers into materialists and idealists. From time immemorial philosophers have divided themselves into two camps and the division has remained in force to this day. It was Engels, who discovered this division by pointing out the fundamental question of philosophy, and it was Lenin who considered this division as the conflict between materialism and idealism.

Human experience, natural science, and scientific philosophy (like dialectical materialism) have proved the primacy of the material world or nature concerning the spiritual world and consciousness. Relying on the knowledge of objective laws, it is possible to transform the surrounding world, introduce changes into nature, and to rebuild society. Scientists provide tangible evidence in support of the primacy of nature, of being. Relying on scientific research, we can assert that the psyche (mind) of a man cannot exist by itself but is closely associated with brain processes. There is a very close link between the content of our thoughts and reality. Everything that makes up our spiritual world and consciousness is formed as a result of contact with the surrounding world.

The fundamental issue of philosophy, therefore, has been resolved in favour of the real world (material world) for consciousness. In answering the basic question, one does not have to offer new

evidence. The materiality of the world is proved by a long development of philosophy and natural science. Depending on the answer to the fundamental question of philosophy, one will either decide that a revolutionary change of society is needed or make the conclusion that it is impossible; one will either try to fight man's diseases and physical sufferings and prolong man's lifetime, or regard the human body as a temporary abode of one's soul, and not attempt to make it better. This is why, even though man's practical activity has confirmed the primacy of the objective world or the primacy of matter for consciousness, the opposite answers to this question continue to exist.

Thus we must, again and again, turn to the fundamental issue of philosophy, and again and again, prove that which has long been proven. For this reason, just as two thousand years ago, depending on the basic issue being solved, philosophers are divided into two large groups- the materialist and the idealists. This division seems to be an oversimplification. But that is not the case. What is simple that should not be made complex. It is evident from the history of philosophy that materialism and idealism are the two general as well as opposite world views of explaining the problems of life and the world.

References

1. F.V. Kanstantinoved, *The Fundamentals of Marxist-Leninist Philosophy*, Eng. Trans by Robert Daglish, Progress Publishers, Moscow, 1982. p. 15
2. Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*, George Allen and Unwin, Great Britain, 1961, Intr., p. 14
3. It was Thales who first raised the most fundamental question: what is the basic substance of the universe out of which everything arises? With this very question, philosophy started its journey systematically; and Thales is considered the father of philosophy for raising such a basic question.
4. Karl Marx, "Theses on Feuerbach", in Marx-Engels, Selected Works in Three Volumes, Progress Publishers, Moscow, 1973, Quoted in the Fundamentals of Marxists Leninist Philosophy, p. 49
5. Ibn Sina, Danim-Name, Dushanbe, 1957 (in Russian), Quoted in Galina Kirilenko and Lydia Korshunova, What is Philosophy?, Progress Publishers, Moscow, 1985. p. 38
6. Satischandra Chatterjee and Dhirendramohan Datta, *An Introduction to Indian Philosophy*, University of Calcutta, 1950, Quoted in What is Philosophy? p. 38

7. Galina Kirilenko and Lydia Korshunova, *What is Philosophy*?, Progress Publishers, Moscow, 1985. p. 40-41

8. Adam Morton, *Philosophy in Practice: An Introduction to the Main Questions*, Blackwell Publishing, USA, 2004, p. 4

9. Joseph Grčić, *Moral Choices: Ethical Theories and Problems*, West Publishing Company, New York, 1989, p. 2

10. Karl Marx, "Notebooks on Epicurean Philosophy" in Karl Marx, Fredrick Engels, Collected Work, Progress Publishers, Moscow, Vol. 1, 1976, Quoted from A.S. Bogomolov, History of Ancient Philosophy, Progress Publishers, Moscow, 1985, p. 5

11. Karl Marx, "The Leading Article in No. 179 of the Kolmische Zeitung", Ibid.

12. Fredrick Engels, *Dialectics of Nature*, Progress Publishers, Moscow, 1982, p. 46, Quoted in A.S. Bogomolov, History of Ancient Philosophy, p. 6

13. Marxist historians define five basic stages or socio-economic formations: Primitive communal, slave, feudal, capitalist, and communist.

14. "Soul" is a very ancient concept. Primitive people think of the soul as a "spirit" that resides in the body but which can come out of it and lead to an independent existence. As part of this primitive conception of the soul there arises the conception of the survival of the soul after death (The idea of the immortality of the soul).

15. Immanuel Kant, *Kritik der reinen Vernunft, Verlag Philipp Reclam jun*, Leipzig, 1971, p. 818, in: What is Philosophy, p. 43

16. Fredrick Engels, "Ludwig Feuerbach and the End of the Classical German Philosophy", in Karl Marx and Fredrick Engels, Selected Works in Three Volumes, Vol. 3, Progress Publishers, Moscow, 1973, p. 345

17. Ibid., p. 346

18. V. I. Lenin, Collected Works, Vol. 14, Progress Publishers, Moscow, p. 358

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-2, December 2020
pp. 101-112

A Sociological Study on Violence against Married Women in Bangladesh Society

Dr. Selina Ahmed

Dr. Selina Ahmed
Professor
Sociology Discipline
University of Khulna
e-mail: selinaahmed@soc.ku.ac.bd

Abstract

Violence against married women, the most persuasive human rights violation, is a great concern for the present time. Domestic violences are of various types in different cultures and societies. The common types of them include beating, verbal abuse, mental torture, forced sex, etc. The present study has been conducted to examine socio-economic and demographic factors responsible for violence against married women to know the consequences of violence against married women, and to suggest measures to minimize it in Bangladesh society. The study was conducted in two villages of Sirajganj district among 328 married women following the social survey method with the help of a structured interview schedule. The study reveals that the majority of respondents are mentally violated. Some also go through physical and sexual violence. Due to the socio-cultural and religious atmosphere, many of them are hesitant either to open their mouth regarding domestic violence or to file an official complaint against it. It is hard to eradicate domestic violence from society but it can be minimized through avoiding child marriage, arranging educational and economic opportunities for women, changing the patriarchal mental setup of the society and making aware of people the harmful effect of domestic violence, enactment of a law providing strong punishment for violence against women and its proper implementation, etc.

Keywords

Violence, Consequence of Violence, Married Women, Dowry, Husband

Introduction

The women constitute about half of the population of Bangladesh. Despite constitutional guarantees that all citizens are equal before the law and are entitled to equal protection of the law as well as the state shall not discriminate against any citizen on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth,[1] there are examples of discriminations against women in Bangladesh society. The situation of violence against women in the country is terrible. From the point of violence against women, Bangladesh placed the fourth position in the world in 2006.[2] In recent years cruelty against women has grown enormously and violence in the family especially is an everyday affair in the country.

Statement of the Problem

Violence against women is a great concern for the present time. Over the past few decades, it has emerged as a global social problem regardless of any distinction as to geography, culture, or wealth. The highest number of violence against women usually occurs at home in every society, ranging from low-income countries to highly developed ones. "Around the world, at least one woman in every three has been beaten, coerced into sex, or otherwise abused in her lifetime. Most often the abuser is a member of her own family."[3]

But violence against women is said to be an issue particularly relevant for South Asia. Reviewing data on wife-beating and battering from 14 societies around the world and grouping them into four levels, from essentially none to high it is found that South Asia falls in the high category. Not only in terms of physical violence South Asia has been repeatedly identified to have the highest rates of different forms of violence against women.[4]

As a part of South Asia Bangladesh is a glaring example of gender-based violence. According to a report of the Bangladesh National Women Lawyers' Association, the rate of violence against women is increasing by the rate of 1.5%.[5]

A WHO multi-country study reported that more than 50% of the women in Bangladesh are subjected to physical or sexual violence by intimate partners.[6]

A population-based survey on women of reproductive age in urban and rural areas of Bangladesh shows that 60% of women have reported ever being physically or sexually abused during their lives and their husbands are the most common perpetrator in these cases.[7]

Among ever-married women, 40% of those in the urban area and 42% in the rural area have been reported physical violence by their husbands, and 37% of the urban and 50% of the rural women reported sexual violence by their husbands.[8]

A study included women from all socio-economic strata reveals that 42% of the violence is perpetrated by the husband or the in-laws.[9]

According to Bangladesh Demographic and Health Survey 2007, nearly one-half of ever-married women (49%) have ever experienced some form of physical violence by their husbands in their current marriage. Eighteen percent have reported ever having been physically forced to have sex by their husbands when they did not want to.[10]

The situation is so worse that even pregnant women also face domestic violence. A study conducted by Bhuiya et. al. shows 50.8% of the women are battered by their husbands, 2.1% by other family members, and 5.2% by both their husbands and other family members as well.[11]

Though domestic violence includes child abuse, sibling abuse, parent abuse, in-law abuse but available information indicates that wife abuse is the most serious type of domestic violence that occurred in the Bangladesh context.[12]

According to the Violence against Women (VAW) Survey 2011 conducted by the Bangladesh Bureau of Statistics, 87% of married women of the country have faced violence by their husbands at a time or the other.[13]

According to a 2015 survey by the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) and the United Nations Population Fund (UNFPA), almost two thirds (72.6%) of ever-married women have experienced one or more such forms of violence by their husband at least once in their lifetime, and 54.7% experienced violence during last 12 months.[14]

Bangladesh human rights group Ain o Salish Kendra (ASK) reported that at least 205 women were murdered by their husbands in just the first ten months of 2020.[15]

According to another prominent Bangladesh human rights group, Odhikar, between January 2001 and December 2019, over 3,300 women and girls were murdered over dowry disputes. These numbers, however, are based on media reports and are likely only a fraction of the real levels of such violence.[16]

Domestic violence in Bangladesh is kept largely hidden and widely denied by society due to the fear of an assault on the integrity of the family.[17]

Barakat et al. (2007) estimate that 99% of women never report violent acts against them.[18]

Women in Bangladesh live throughout their life under a patriarchal, patrilineal and patrilocal social system, which ensure

that the male in the household will occupy the position of authority and descent and the place of residence will be determined by the male line. Such a system upholds a rigid gender division of labor and a subordinate position of women in the household. The usual manifestations of women's subordination in such a patriarchal society may be identified in early marriages, polygamy, unilateral divorce, seclusion, dowry, and violence against women. Women in Bangladesh are thus subordinated within an intensely hierarchical system of gender relations which constantly attempts to deny women not only access to social power and control over their own lives but also granted rights to which they are entitled.[19]

Actually, the material basis of patriarchy is men's control of property, income, and women's labor which assists to make women powerless and subordinate.[20]

And the subordinate status of women has made them the appropriate victims of marital violence.[21]

Jahan (1988) also argues that domestic violence in the Bangladesh context is the outcome of gender-inequity.[22]

Certain aspects of Bangladeshi society, such as restrictions on women's movement outside their homes, unequal access to education, and restricted employment opportunities, limit women's ability to exercise their human rights and make them more vulnerable to domestic violence.[23] Women's own submissiveness also contributes to domestic violence.

Objectives of the Study

The objectives of the present study are as follows:

1. To examine socio-economic and demographic factors responsible for violence against married women in Bangladesh society;

2. To study the consequences of violence against married women in Bangladesh society and;

3. To suggest measures to minimize violence against married women in Bangladesh society.

Methodology

A social survey method was adopted for the study. A total of 656 households from the two villages namely Sonakhara and Rupakhara under Roygonj Upazila of Sirajganj district were taken purposely as the universe of the study. Then 50% of households from the two villages i.e. 328 households have been selected as a sample systematically, through the sampling fraction method, and data were collected through a structured interview-schedule from the selected married woman from each household.

Results and Discussions

Socio-economic and Demographic Characteristics

The study shows that out of 328 women, 17.1% of women belong to the age group of (15-24) years, whereas the majority 56.4% of women belong to the age group of (25-34) years and 26.5% of women fall in the age group of (35 and above) years. In terms of marital status, women are divided into four major groups in the study. Out of 328 respondents, 90.2% of women are married, 3% are remarried, 2.1% are separated, 3.7% are divorced and the rest 0.9% is a widow. The study reveals that 19.8% of women are illiterate whereas the majority (51.2%) have learned to sign through mass education. A remarkable portion (20.7%) have received education up to the primary level, while 7.3% have studied up to the secondary level and the rest 0.9% women have studied up to higher secondary level and above. Among the respondents, the majority (95.4%) of women are housewives, whereas only 0.6% are engaged in teaching and the rest 4.0% are involved in different occupations like agriculture labour, health worker, and seamstress. Out of the respondents, the husbands of 32.6% of women is illiterate; whereas the husbands of 47.3% of women has learned to sign their name through mass education. Again, the husbands of 10.7% respondents have received education up to the primary level, while 5.2% has studied up to the secondary level, 2.4% have studied up to the higher secondary level and only 1.8% have studied up to graduation and above. Out of 325 women currently living with husbands, the husbands of the majority are engaged in agriculture (67.1%) either as the owner of agricultural land or as agricultural labour. There are rickshaw puller or van puller (9.2%), petty businessmen (4.9%) and carpenter (3.4%), sawmill labour (4%), teacher (0.9%), and barber (0.9%). The rest 9.6% fall in other categories which include weaver, mechanic, driver, muezzin, etc. Out of 328 respondents, the majority (78%) belonged /belong to the nuclear family. The number of a family member in the majority of the cases (68.9%) ranges within (2-4), whereas for 26.5% the number ranges within (5-7) and for 4.3% ranges within (8-10). The number of family members of the rest 0.3% of respondents is more than 10. It indicates that out of 328 respondents, the total monthly family income of the majority (65.5%) is BDT 4000. or below, 29.3% ranged/ranges within BDT (4001-7000), 3.4% ranged/ranges within BDT (7001-10000). and the rest 1.8% is above BDT 10000. Out of 328 respondents, the marriage of the majority (87.2%) was arranged by their families and the respondents had no role behind mate selection. Besides, 1.2% of respondents

selected their mates through their own choice, got married on their own self and their families did not support their decision. The marriage of the rest 11.6% also commenced through love affairs but in these cases, concerned respondents obtained support from their family despite selecting their mates by their own choice, and the marriage was arranged by their families. Out of the respondents, the majority (97%) was/ is married to her husband for the first time, whereas 2.4% for the second time and the rest 0.6% for the third time. The study reveals that the marriage of 16.2% respondents commenced when they were below 13 years of age, whereas the marriage of the majority (67.7%) commenced in the age ranges between (13-15) years, 13.1% ranges between (16-18) years, and only 3% respondents in their age of above 18 years. It indicates that the majority of the women are the victim of early marriage. Out of 328 women, dowry was given to the bridegroom or his family in the marriage of the majority (93.3%), whereas dowry was not given in the marriage of only 6.7% of respondents. Besides, dowry was demanded after the marriage in the case of only 2.4% of respondents whereas dowry was not demanded in the case of the majority (97.6%). Among them, only 1.8% of respondents had/has clashed with husband regarding dowry. It depicts a situation totally different from the prevailing conception in the country that requires further research.

Information Regarding Violence Whether Faced/ Faces Violence : Out of 328 respondents, 14.3% of women have ever faced violence whereas the majority (53.7%) have recently faced violence and the rest 32% of women have never faced violence in married life. Among 223 respondents (who faced/faces violence), the majority (80.7%) of women were/ are oppressed by their husband, whereas 24.2% were/are oppressed by father-in-law/mother-in-law and 15.7% by brother-in-law/sister-in-law in their married life. The number of total respondents here exceeds the actual number of respondents because of multiple responses.

Type of Violence : The study indicates that out of 223 violated respondents, 60.1% faced/face physical violence, whereas the majority (90.6%) faced/face mental violence and the rest 9.4% faced/face sexual violence in married life. Among 134 physically violated respondents, 94.8% were /are beaten through hand and foot, 38% through bamboo/stick/ iron rod, and 29.8% by the slipper. Regarding the nature of beating 22.4% of women are the victim of pinching, whereas the majority (89.5%) are grabbed and pulled by the hair and 33.6% are pushed, 70.9% are the victim of chucking, 76.9% is the victim of kicking and 38% are the victim of beating with stick/bamboo/iron rod.

Again, the head is banged against wall/ furniture/ tree of 20.9% of respondents, objects are hurled towards 82.1% of respondents, and 6.7% of respondents are hit in private parts in their married life. Here the number of total respondents exceeds the actual number of respondents because of multiple responses. It also reveals that out of 202 mentally violated respondents, 22.3% faced/face rebuke, 69.8% faced/face abuse and 5.9% faced/ face disinterest in talking in their married life. Again, 60.9% and 38.6% of women were/are the victim of mental pressure and negligence respectively in their married life. And only a few respondents told about forced sex but they were still hesitant to say in detail. Here the total respondents exceed the real number of respondents due to multiple responses.

Degree of Violence: The study indicates that out of 223 violated women, 18.4% faced/face violence regularly and openly, 4.0% faced/ face violence regularly but secretly, 65.0% faced/face violence irregularly and openly and 12.5% faced/ face violence irregularly and secretly in their married life.

Cause of Violence: It shows that out of 223 violated respondents 3.6% faced/face violence in married life due to refusal to bring a dowry, 5.4% due to drug or gamble addiction of husband, 12.5% due to maladjustment with in-laws, 32.7% due to failure to perform household work or care of children, 6.3% due to make hindrance in the way of husband's adultery, 16.6% due to husband's frustration over the poor economic condition, 9.4% due to failure to fulfill the sexual desire of husband, 7.2% due to contentious nature of wife, 15.7% due to instigation of others against wife, 14.3% due to questioning of husband and 3.1% due to disliking as a wife. The total number of respondents here exceeds the actual number of respondents because of multiple responses.

Is Violence against Married Women an Instrument of Ensuring Maintenance of Patriarchal Social Order?: The study reveals that 24.1% of women are strongly agreed, whereas the majority (68.3%) is agreed with the statement "violence against married women is an instrument of ensuring maintenance of patriarchal social order." 2.4% of respondents do not know whether violence against married women is an instrument of ensuring the maintenance of patriarchal social order. Again, 3.7% of women have disagreed and 1.5% are strongly disagreed with the statement.

The Inability of Man to Economically Support his Wife and to Maintain Control is the Main Factor of Violence against Married Women: The study indicates that out of total respondents, the majority (66.5%) of women is strongly agreed, whereas 21.3% is agreed to the statement "Inability of man to

economically support his wife and to maintain control is the main factor of violence against married women." 4% of respondents do not know whether the inability of a man to economically support his wife and to maintain control is the main factor of violence against married women. Again, 6.4% of women have disagreed and 1.8% is strongly disagreed with the statement.

Has Husband the Right to Beat His Wife?: From the study, it is revealed that out of 328 respondents, 12.5% of women has a positive attitude towards the right of a husband to beat his wife and opined that it can occur, whereas the majority (81.1%) has a flexible attitude and opined that the husband should conscious to apply his right to beat his wife, and the rest 6.4% of women believe that the husband has no right to beat his wife.

Hypothesis-1: With the Increase in age of Married Women Violence against them in Bangladesh Society Decreases Considerably.

Contingency Table 1

Violence against married women	Age structure of married women			Total
	Low	Medium	High	
Yes	40 (38.07)	173 (125.78)	10 (59.15)	223
No	16 (17.93)	12 (59.22)	77 (27.85)	105
Total	56	185	87	328

As the calculated value of Chi-square (X^2) (183.27) is greater than its table value at 2df and 0.05 level of significance (5.99), therefore the working hypothesis "With the increase in age of married women violence against them decreases considerably" is accepted. The relationship as indicated by the value of contingency coefficient (C) (0.599) is moderately significant.

Hypothesis-2: With the Increase in Husband's Education Violence against Married Women in Bangladesh Society Decreases Considerably.

Contingency Table 2

Violence against married women	Level of education of husband			Total
	Uneducated	Semi-educated	Educated	
Yes	69 (72.75)	138 (105.38)	16 (44.87)	223
No	38 (34.25)	17 (49.62)	50 (21.13)	105
Total	107	155	66	328

As the calculated value of Chi-square (X^2) (90.15) is greater than its table value at 2df and 0.05 level of significance (5.99), therefore working hypothesis "With the increase in husband's education violence against married women decreases considerably" is accepted. The relationship as indicated by the value of contingency co-efficient (0.464) is moderately significant.

Hypothesis-3: With the Increase in Age at Marriage of Women Violence against them in Bangladesh Society Decreases Substantially.

Contingency Table 3

Violence against married women	Age at marriage of women			Total
	Low	Medium	High	
Yes	12(36.03)	198 (150.93)	13 (36.03)	223
No	41(16.97)	24 (71.07)	40 (16.97)	105
Total	53	222	53	328

As the calculated value of Chi-square (X^2) (141.88) is greater than its table value at 2df and 0.05 level of significance (5.99), therefore the working hypothesis "With the increase in age at marriage of women violence against them decreases substantially" is accepted. The relationship as indicated by the value of contingency co-efficient (0.549) is moderately significant.

Hypothesis-4: With the Increase in Age Difference between Women and their Husband Violence against Married Women in Bangladesh Society Increases Considerably.

Contingency Table 4

Violence against married women	Age difference between women and their husband			Total
	Low	Medium	High	
Yes	103 (106.06)	98 (74.79)	22 (42.15)	223
No	53 (49.94)	12 (35.21)	40 (19.85)	105
Total	156	110	62	328

As the calculated value of Chi-square (X^2) (52.86) is greater than its table value at 2df and 0.05 level of significance (5.99), and the working hypothesis "With the increase in age difference between women and their husband violence against married women increases considerably." is accepted. The relationship as indicated by the value of contingency co-efficient (0.372) is fairly significant.

Consequence of Violence

The study shows that out of 223 violated respondents, 65% of women have mentioned household crisis as the consequence of violence against married women, whereas 60.1% suffer from bleeding and pain, and 100% of women suffer from continuous tension and frustration. Besides, 12.1% of women have mentioned losing their self-esteem and 8.1% felt/feel insecure in their life. Again, 10.7% of women have mentioned that the integration of their household has lost, 15.7% of women have attempted suicide and 3.6% of women have taken divorce from their husbands or lives separately with children due to violence occurred in their married life. The total number of respondents here exceeds the actual number of respondents because of multiple responses.

Measures to Minimize Violence against Married Women

The study reveals that out of 328 respondents, 22.2% of women give importance to abolishing early marriage and to be educated, whereas 19.8% gives importance to attaining economic independence and 14% opine in favour of trying to change the patriarchal mental setup of the society to minimize the violence against married women. Besides, 19.8% of women give importance to collective protest and resistance to violence, 15.8% on not taking children more, 19.5% on living in a nuclear family, and 7% is of the view of maintaining tactful

behaviour in day to day life. Again, 13.7% of women opine to arrange programs by government and NGOs to make people aware about the demerits of violence against married women, another 19.5% of women give importance to enacting special law regarding violence against married women and ensuring proper employment of that law and 5.2% women think violence against married women is decided through fate and nothing to do to minimize the problem.

Conclusion

Violence against married women at the household level is perhaps as old as the family itself. Generally, it is said that patriarchal society itself is the bearer of unequal power distribution between man and woman which largely creates men's domination over women, and as it's aftereffect violence against married women takes place.

Under patriarchal society it is very much tough to eradicate it; especially for uneducated, poor, and distressed rural women, it is totally impossible. Married women are mainly oppressed by their husband and his family members due to failure in performing household duties, husband's frustration over the poor economic condition, and instigation of others against wife. This can occur easily as the social system expects perfect role-playing from married women regarding household duties irrespective of age, religion, social and economic status, etc. Again, in the first few years of marriage, a wife may feel herself an outsider in the husband's family, especially when maximum members of the family show disinterest in her. As result maladjustment among family members may come into existence, which may subsequently lead to violence against married women. But over time when the new wife becomes a mother is slowly able to establish an authority in the family that sometimes may lessen violence against her. Besides, education makes the husband more conscious, more tolerant, and more real-sensed. That's why he can prove himself considerate to his wife avoiding violence against her. Again, women married below 15 years of age face violence more than the women whose age at marriage is comparatively high. The women with an early age at marriage due to their age are either unaware or not so conscious about marital responsibilities. As a result, conflict arises and subsequently, they are oppressed by husband and other family members. On the other hand, a higher age difference between husband and wife sometimes serves as a purpose of violence against married women. If there is more difference of age between husband and wife, there is a great chance of having a different mentality of them, which may turn into maladjustment among them

that can lead to violence against married women.

Besides, dowry, more number of children, ensuring maintenance of patriarchal social order, the inability of a man to economically support her wife and the wish to control her are some main factors of violence against women in Bangladesh society. The majority of the women being influenced by our society always admit the supremacy of men over women and believe in the right of man to beat his wife. This type of thinking of women inspires the oppressor to oppress them easily. Under the circumstances, it is not so easy to eradicate violence against married women from our society. But some measures can be taken to minimize it through abolishing early marriage and being educated, protesting and resisting violence collectively, attaining economic independence and enacting special laws regarding violence against married women, and ensuring proper employment of that law.

References

Article 27 and 28 (1) of Bangladesh Constitution

UNICEF, quoted in The Jai Jai Din, Dhaka, 3 November 2006

Population Reports : Ending Violence Against Women, Baltimore : Population Information Program, Center for Communication Programs, The Johns Hopkins University School of Public Health in Collaboration with The Center for Health and Gender Equity (CHANGE), Vol. XXVII, No. 4, December 1999

Ruchira Tabassum Naved, "A Situational Analysis of Violence against Women in South Asia," A paper commissioned by UNFPA Country Support Team for South and West Asia. Kathmandu, for the Regional Workshop on Parliamentary Advocacy for the Prevention of Violence Against Women in South Asia, Dhaka, 18-19 March 2003, p. 1

The Daily Jai Jai Din, Dhaka, 3 November 2006

C. García-Moreno et.al, WHO Multi country Study on Women's Health and Domestic Violence Against Women, Geneva: WHO, 2005

ICDDR, B, "Domestic Violence against women in Bangladesh", Health and Science Bulletin, Vol. 4 No. 2 June 2006, ICDDR, B: Centre for Health and Population Research, 2006, p. 1

Ibid. p. 3

M. A. Koenig et.al, "Women's Status and Domestic Violence in Rural Bangladesh: Individual and Community Level Effects," *Demography*, 40 (2): 269-288, 2003

*Bangladesh Demographic and Health Survey 2007***,** NIPORT, Dhaka, Bangladesh, Mitra and Associates Dhaka, Bangladesh, Macro International, Calverton, Maryland USA, March 2009, p. 201

A. U. Bhuiya, T. Sarmin and S. M. Hanifi, "Nature of Domestic Violence against Women in a Rural Area of Bangladesh: Implication for Preventive Interventions," *Journal of Health, Population and Nutrition*, 21 (1):48-54, 2003

The *Observer Magazine*, Dhaka, July 14, 2000

The *Prothom Alo*, 23 January 2014, p. 1

https://asiapacific.unfpa.org/en/publications/2015-report-bangladesh-violence-against-women-survey

http://www.askbd.org/ask/2020/11/05/violence-against-women-domestic-violence-jan-oct-2020/

https://www.hrw.org/report/2020/10/29/i-sleep-my-own-deathbed/violence-against-women-and-girls-bangladesh-barriers

Ishrat Shamim, "Women Facing Violence: Birds in a Case" in Shamim, Ishrat and Salahuddin, Khaleda (eds.), *Towards Beijing and Beyond: Women Shaping Policies in Areas of Concern*, Dhaka: Centre for Women and Children Studies, 1995, p. 45

A. Barakat et al., *Budget Allocation in a Gender Perspective: Issues on tuberculosis, Safe Delivery, Sports, Science Education in Secondary School, Violence against Women, Women's Access to Commercial Bank Loan*, Paper presented at Seminar on Budget Allocation in Gender Perspective, BEA and Action Aid, Dhaka, Bangladesh, 21 April 2007

Naila Kabir, "Subordination of Struggle: Women in Bangladesh," *New Left Review*, No. 168, March-April 1988:95-121, p. 101

Mead Cain, Syeda Rokeya Khanam and Shamsun Nahar, "Class, Patriarchy and Women's Work in Bangladesh," *Poulation and Development Review*, Vol. 5, No. 3, September 1979, 405- 438, p. 406

R. E. Dobash and R. Dobash, "Love, Honour and Obey: Institutional Ideologies and the Struggle for Battered Women," *Contemporary Crisis*1.1, 1977:403-415

Roushan Jahan, "Hidden, Wounds, Visible Scars: Violence Against Women in Bangladesh," in Bina Agarwal (ed.) *Structure of Patriarchy: State, Community and Household in Modern Asia*, London: Zed Books, 1988: 199-226

L. R. Bennett and L. Manderson, "Introduction: Gender inequality and technologies of violence", in L. Manderson and L.R. Bennett (ed.), *Violence against women in Asian societies*, New York : Routledge Curzon, 2003

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-2, December 2020
pp. 113-121

A Numerical Simulation of the Nested Logistic Population Model for the Classified Population of Bangladesh

Md S Hossain[1] & L S Andallah[2]

Abstract

This paper makes an attempt to articulate the nested logistic population model and fit it with real data of classified population of Bangladesh for better understanding the model characteristics, stability and continuous dependence on initial data. The paper also presents a technique of finding the values of necessary parameters which are essential for the articulation process. The values calculated from the model equations are also compared with the actual data for testing the accuracy of the model and shows that the model is capable to handle the real situation in an efficient manner. Furthermore, the article also gives a prediction table of future data of the classified population of Bangladesh.

Md S Hossain[1] & L S Andallah[2]
[1]Department of Mathematics
Govt. Brajalal College, Khulna
[2]Department of Mathematics
Jahangirnagar University
Savar, Dhaka
e-mail: dr.md.sarwar@gmail.com
andallahls@gmail.com

Keywords

Nested Logistic Population Model, Numerical Simulation, Classified Population, Initial Value Problem, Regression Line, Projection.

AMS-MSC 2020 No.: 92-10, 92D25

1. INTRODUCTION

The widely used model in Population Dynamics was developed by Belgian mathematician *Pierre Verhulst (1838)* who suggested that the rate of population increase may be limited. In a dense situation, the population fights among themselves for limited resources which creates a negative impact in the population growth. Verhulst modified the Malthusian model mentioned in *Thomas Robart Malthus (1798)* by adding a negative quadratic term in the form

$$\frac{dp}{dt} = ap(k-p) \qquad (1)$$
$$p(0) = p_0$$

This is known as *logistic population model*.

We have modified the well-known logistic population model described in (1) for the study of classified population and termed it as *nested logistic population model* in *Hossain (2013)*.

Here we recall the nested logistic population model from *Hossain (2013)*, which is-

$$\frac{dx}{dt} = ax(k-x), \frac{dy}{dt} = by(x-y), x(0) = x_0, y(0) = y_0 \quad (2)$$

Where, the two sets X and Y are such that $Y \subseteq X$ and each of which has a separate logistic growth and the sizes of X and Y are measured in terms of x and y respectively.

The Model has the following analytic solution-

$$\left\{\left\{x[t] \to \left(1+\frac{1}{(-1+e^{k(at+C[1])})}\right)k\right\},\right.$$
$$\left.\left\{y[t] \to \frac{a\left(1-e^{-k(at+C[1])}\right)^{\frac{b}{a}}\left(1-e^{k(at+C[1])}\right)^{\frac{b}{a}}k}{-b\left(-1+e^{-k(at+C[1])}\right)^{\frac{b}{a}} Beta\left[e^{-k(at+C[1])}, -\frac{b}{a}, \frac{a+b}{a}\right] + a\left(1-e^{-k(at+C[1])}\right)^{\frac{b}{a}} kC[2]}\right\}\right\}$$

From the data we first calculate the parameters used in the model and use this value to find the analytic & numerical solutions of the model. We also compare the numerical results obtained from the model to the actual data and to the analytic solution. Moreover, in each of the cases, we compute the extent of errors occurred in the calculation process. Finally, using the existing data, we make some predictions for the near future.

2. AN OVERVIEW OF THE CLASSIFIED POPULATION OF BANGLADESH

Population growth is a vital issue for Bangladesh. Moreover, study shows that the female population rather than male is more responsible for the growth of total population. Therefore the knowledge of the future female population after a particular period of time may be required. For this purpose, we have collected some data of total populations of Bangladesh which are classified into Male and Female Populations in Million in equal intervals of time. The data starting from 2000 and ending at 2007 are tabulated in the following table.

POPULATION (IN MILLION) BY SEX OF BANGLADESH

Year	Both Sex	Male Population	Female Population
2000	129.3	66.3	63.0
2001	131.1	67.1	62.9
2002	132.9	68.2	64.7
2003	134.8	69.1	65.7
2004	136.7	70.1	66.6
2005	139.8	72.0	67.8
2006	140.6	72.0	68.6
2007	142.6	73.1	69.5

Source: Bangladesh Bureau of Statistics, Bangladesh.

Since the male and female population is two distinct non-overlapping subsets of total population, the male population can be found instantly by deducting female population from the total. Moreover, the effect of the increase in one of the species on the other species can be neglected. Thus, we should proceed with only total and female population for simplicity.

3. THE GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DATA

If the Total and Female Population together is represented graphically with respect to time, the actual situation can be depicted as in the following figure.

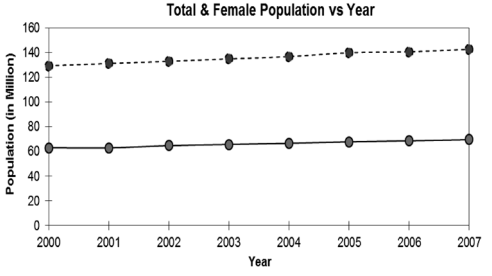

We shall now examine whether this data fits with our constructed model or not. Because the first step of applying a model to a real life problem is to verify the consistency of the data with the model. If the model does not seem to be consistent with the data then we shall go for further modification of the model. Otherwise, we shall proceed with the unaltered form of the model to make a projection for the future years. For the verification of the projection method we have collected few more data from the year 2008 to 2011.

Year	Total Population	Male Population	Female Population
2008	144.6	74.1	70.5
2009	146.6	75.0	71.6
2010	148.1	75.9	72.2
2011	150.1	76.9	73.2

Source: Statistical Pocket Book-2012, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)

We shall judge the prediction procedure comparing these four data and if our approximation passes through this test then we may say that approximations for the next ten or fifteen years will be more or less appropriate.

4. CALCULATION OF THE NECESSARY CONSTANTS

The Model we have constructed, involves three unknown constants which need to be determined from the given data. The constants are k, a and b. We shall now proceed to determine the value of these constants from the data provided in the section 2.

4.1. Determining the value of *k*

We are interested to predict only ten or fifteen year forward from the present. According to "Sectoral Need Based Projection" published by BBS (Bangladesh Bureau of Statistics), the projected population for 2051 is 218.64 Million approximately. Thus we assume that the population of Bangladesh will never cross 250 million. As mentioned earlier k describes the maximum size of the larger set and hence describes the maximum size of the total population in this perspective. The actual value of k depends on numerous factors and may require a huge calculation. But our aim is here to illustrate our model only. Keeping this point in mind we set $k = 250$ million.

4.2. Determining x_0 and y_0

If we start our calculation from the year 2000 then the initial total population x_0 and the female population y_0 may be taken as the same of that year respectively. i.e. we may take $x_0 = 129.3$ million and y_0 = 63.0 million.

4.3. Determining the constant *a*

We have so far derived the formula for determining the necessary constant '*a*'. The general formula for a is:

$$a = \frac{1}{kt}\log\frac{x\,(k - x_0)}{x_0\,(k - x)} \qquad (5.1)$$

Substituting these values i.e. k = 250 and x_0= 129.3, we have

$$a = \frac{1}{250t}\log\frac{x\,(250 - 129.3)}{129.3\,(250 - x)}$$

$$a = \frac{1}{250t}\log\frac{120.7\,x}{129.3\,(250 - x)} \qquad (5.2)$$

Now we are ready to calculate the value of a from any given value of x. Before proceeding in this manner we have indexed the given data from 0 to 7 for the convenience of calculation process.

The values of a obtained by the use of different values of t and x are listed in the following table.

Year	*t*	*x*	*a*
2000	0	129.3	-
2001	1	131.1	0.000115402
2002	2	132.9	0.000115483
2003	3	134.8	0.000117727
2004	4	136.7	0.000118922
2005	5	139.8	0.000135271
2006	6	140.6	0.000121387
2007	7	142.6	0.000122661

From the above mentioned table we can easily visualize that it is not an easy task to make a choice of a because of its variability in the tabulated observations. But according as the theories described earlier, a must be a constant.

To make an accurate choice of a, here we plot the fitted regression line using the values of a mentioned in the previous table.

Regression Plot

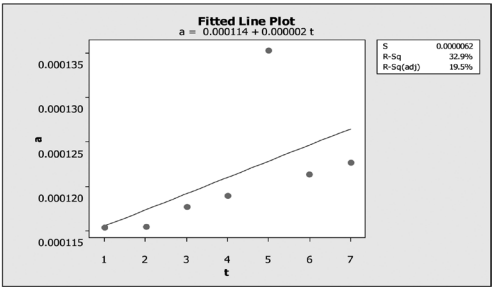

We have used "MINITAB For Windows Release 16 32 Bit" for the purpose of drawing the above line.

The equation of the regression line is

$a = 0.000114 + 0.000002\ t$

We may take the mid-value of the fitted line as the constant value of a and which can be obtained instantaneously by setting $t = 4$ in the equation above. Doing so we get

$a = 0.000114 + 0.000002 \times 4$. That is, $a = 0.000122$.

Therefore, we shall use this value a = 0.000122 in further calculations.

4.4. Determining the constant *b*

We recall the analytic solution for the model as mentioned earlier.

$$\left\{\left\{x[t] \to \left(1+\frac{1}{\left(-1+e^{k(at+C[1])}\right)}\right)k\right\},\right.$$
$$\left.\left\{y[t] \to \frac{a\left(1-e^{-k(at+C[1])}\right)^{\frac{b}{a}}\left(1-e^{k(at+C[1])}\right)^{\frac{b}{a}}k}{-b\left(-1+e^{-k(at+C[1])}\right)^{\frac{b}{a}}Beta\left[e^{-k(at+C[1])},-\frac{b}{a},\frac{a+b}{a}\right]+a\left(1-e^{-k(at+C[1])}\right)^{\frac{b}{a}}kC[2]}\right\}\right\}$$

A simple observation is required to make the decision that it is very difficult to find the value of b from the above solution. Though it not impossible to find the value of b from $y(t)$, it requires a huge calculation. Thus to minimize the calculation process here we numerically find different values from the given data. We use Mathematica 7.0 commands to obtain the value enlisted in the following table.

Year	*t*	*y*	*b*
2000	0	63.0	-
2001	1	62.9	-0.0000236037
2002	2	64.7	0.000197641
2003	3	65.7	0.000206249
2004	4	66.6	0.000203301
2005	5	67.8	0.000213751
2006	6	68.6	0.000204892
2007	7	69.5	0.000200993

To make an accurate choice of b, here we plot the fitted regression line using the values of b mentioned in the previous table.

Regression Plot for *b*

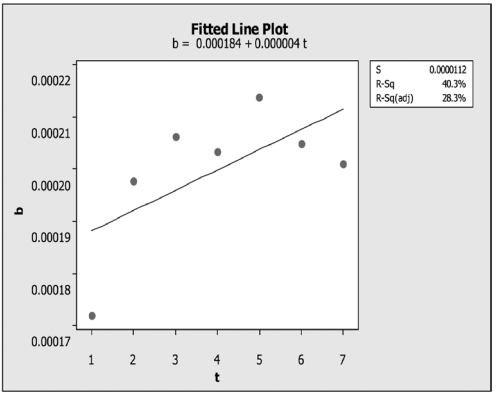

We have used "MINITAB For Windows Release 16 32 Bit" used for the purpose of drawing the above line. The equation of the regression line is

$b = 0.0001842 + 0.0000039\,t$

We may take the mid-value of the fitted line as the constant value of b which can be obtained instantaneously by setting $t = 4$ in the equation above. Doing so we get

$b = 0.0001842 - 0.0000039 \times 4$. That is, $b = 0.0001998$.

Therefore, we should approach with b = 0.0001998.

5. Obtaining *x(t) & y(t)* by Numerical Schemes

By using the Mathematica 7.0 commands for determining the numerical solution by Runge-Kutta Method or regular NDSolve command of Mathematica 7.0 we solve the equation (2) with k = 250, a = 0.000122, b = 0.0001998, $x_0 = 129.3$ and $y_0 = 63$ The result obtained for different values of t has been listed in the following table

t	Year	Observed x(t)	Calculated *x(t)*	Observed y(t)	Calculated *y(t)*
0	2000	129.3	129.3	63.0	63.0000
1	2001	131.1	131.203	62.9	63.8469
2	2002	132.9	133.103	64.7	64.7186
3	2003	134.8	134.999	65.7	65.6155
4	2004	136.7	136.891	66.6	66.5379
5	2005	139.8	138.777	67.8	67.4862
6	2006	140.6	140.657	68.6	68.4605
7	2007	142.6	142.529	69.5	69.4613

Proceeding a few step forward, we get

t	Year	Observed x(t)	Calculated *x(t)*	Observed *y(t)*	Calculated *y(t)*
8	2008	144.6	144.394	70.5	70.4888
9	2009	146.6	146.250	71.6	71.5431
10	2010	148.1	148.096	72.2	72.6246
11	2011	150.1	149.932	73.2	73.7334

6. Validation of the Formulated Model

Here we attempt to find whether the model formulated so far fits with the current data or not. We also make an attempt to take decision about the prediction process. The table below lists the observed value and the calculated value obtained numerically. The extra columns in the table calculate the extent of error occurred.

t	Year	Obs. x(t)	Calc. *x(t)*	Obs. y(t)	Calc. *y(t)*	Abs. Error in *x(t)*	Abs. Error in *y(t)*
0	2000	129.3	129.3	63.0	63.0000	0.00%	0.00%
1	2001	131.1	131.203	62.9	63.8469	0.08%	1.51%
2	2002	132.9	133.103	64.7	64.7186	0.15%	0.03%
3	2003	134.8	134.999	65.7	65.6155	0.15%	0.13%
4	2004	136.7	136.891	66.6	66.5379	0.14%	0.09%
5	2005	139.8	138.777	67.8	67.4862	0.73%	0.46%
6	2006	140.6	140.657	68.6	68.4605	0.04%	0.20%
7	2007	142.6	142.529	69.5	69.4613	0.05%	0.06%

Miraculous! That's the miracle what mathematics does! Almost all of the errors in the observations lie under 1%.

Now we are interested to test the prediction process of our model. If we continue the

calculation of the previous table for next few steps, we get the following results.

t	Year	Obs. x(*t*)	Calc. *x(t)*	Obs. y(*t*)	Calc. *y(t)*	Abs. Error in *x(t)*	Abs. Error in *y(t)*
8	2008	144.6	144.394	70.5	70.4888	0.14%	0.01%
9	2009	146.6	146.250	71.6	71.5431	0.24%	0.04%
10	2010	148.1	148.096	72.2	72.6246	0.00%	0.58%
11	2012	150.1	149.932	73.2	73.7334	0.44%	0.72%

It is not a tough task to take a decision in such a case. The errors in these particular observations are also negligible. Which leads us to assume that prediction process is running good and we may go for further prediction using this particular model and the model probably need not to be modified any more.

7. Graphical Representation of the Solution *x(t)* & *y(t)*

So far we have discussed the applicability of our model. Now we represent the solution obtained in a visual manner.

***x(t)* and *y(t)* vs Time**

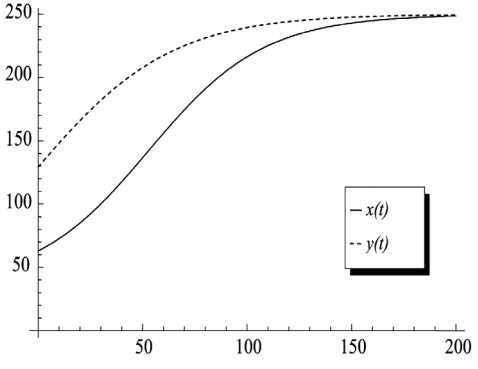

8. Estimating Time to Reach *x(t)* a Particular Value

We have established a formula for the estimation of the time *t*. The formula is

$$t = \frac{1}{ka}\log\frac{x(k-x_0)}{x_0(k-x)}$$

Now we are interested to find the year at which the total population will reach 175 million. It can easily be obtained from the formula by substituting $k = 250$, $a = 0.000122$, $x_0 = 129.3$ and $x = 175$. By simple Calculation we get,

$$t = 25.523634$$

Thus we conclude from the above calculation that after 26 years (approximately) from the initial time (i.e. at the year 2026) the total population of Bangladesh will be 175 million, which can also be verified from the prediction table presented in the next section.

9. The Projection Table

We shall now represents some future values of total population *x(t),*Female Population *y(t)* & male population *x(t)-y(t)* in the same table. The prediction table for the year 2010 to 2030 is presented below.

Year	Total Population x(t)	Female Population y(t)	Male Population x(t) - y(t)
2010	148.096	72.6246	75.4714
2011	149.932	73.7334	76.1986
2012	151.756	74.8697	76.8863
2013	153.569	76.0337	77.5353
2014	155.370	77.2255	78.1445
2015	157.157	78.4452	78.7118
2016	158.930	79.6929	79.2371
2017	160.688	80.9686	79.7194
2018	162.431	82.2722	80.1588
2019	164.158	83.6038	80.5542
2020	165.869	84.9634	80.9056
2021	167.563	86.3507	81.2123
2022	169.240	87.7656	81.4744
2023	170.898	89.2080	81.6900
2024	172.538	90.6776	81.8604
2025	174.159	92.1741	81.9849
2026	175.761	93.6972	82.0638
2027	177.343	95.2465	82.0965
2028	178.904	96.8216	82.0824
2029	180.446	98.4221	82.0239
2030	181.967	100.0470	81.9200

From the above table one may take an idea about the future classified population (Male/Female/Total) without having any major mathematical knowledge.

6. CONCLUSIONS

The nested logistic population model is suitable for the study of classified population. But the data should be collected carefully because of the continuous independence of data. The model can be generalized for higher number of classes. Therefore we very hopeful in successful use of the model in age grouped populations. We have an intention to model age grouped population with some numerical experiments by dint of this model in some of our future work.

REFERENCES

1. Andrews and Mclone (1976). Mathematical Modelling, Butterworths, 1st Edition, p. 1-12.
2. Bangladesh Bureau of Statistics (2001). Bangladesh Population Census Report 2001, Ministry of Planning, Bangladesh, Dhaka.
3. Basher (1985). Modern Population Trends in Bangladesh, Rural Demography, Vol-12, p. 71- 83.
4. Braun, M. (1993). Differential Equation and Their Application, Narosa Publishing House, 2nd Edition.
5. Britton (1999). Essential Mathematical Biology, Springer, 1st Edition, pp1-44.
6. Hoque et al. (1995). An Estimation of future population of Bangladesh, Jahangirnagar University Journal of Statistical Studies, Vol-15, p. 75-78.
7. Hossain et al. (2013). A Nested Logistic Population Model, Jahangirnagar University Journal of Science, Vol-35, p. 45-58.
8. Keshet (1988), Mathematical Models in Biology, McGraw-Hill Inc. 1st Edition, p. 113-209.
9. Mabud (2008). Bangladesh's Population Projection 2001-2101, Organization for Population and Poverty Alleviation (OPPA).

10. Mallick (1980). Implausibility of Attaining Zero Population Growth in Banthin Next 100 Years, Rural Demography, Vol-5, p. 33-39.

11. Malthus, T. R. (1798), An Essay on the Principle of Population, Great Mind Series, Prometheus Books.

12. Obaidullah (1976). "Expo-linear Model for Population Growth", Rural Demography, Vol-3**,** p. 43 -69.

13. Rahman (1993). National Growth Rate Method with Varying Internal Migration Rate, The Bangladesh Development Studies, Vol- 21, p. 73-76.

14. Verhulst, P. F. (1838). A Note on the Law of Population Growth, A. Quetelet, Brussels p. 113-117

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-2, December 2020
pp. 122-129

Reflections of the City of Kabul: Pre and Post-Taliban in Khaled Hosseini's *A Thousand Splendid Suns*

Dr. Sabreen Ahmed

Abstract

Khaled Hosseini, a refined craftsman of realistic fiction, historicises the city of Kabul before, during, and after the tyrannical Taliban in his masterpiece 'A Thousand Splendid Suns' The proposed paper aims to locate the city of Kabul as a troupe that evolves and transforms as a commercial door to the middle-east from South Asia, to an ethnic war zone during Soviet occupation, to an Islamic fundamentalist hub after the fall of the USSR with the rise of the Taliban followed by terrorism and Islam phobia and finally culminates in its existing state as a US protégé. The narrative pitted within the political and social transformations mainly surrounds the life and times of the central characters, mostly female- Mariam, Laila, and Aziza– the three generations of women that bear testimony to the changes in Afghanistan and its capital city. The chief male protagonists Rasheed and Tariq are presented in starkly black and white comparisons respectively as the regressive villain and the progressive hero in terms of their acceptance and resistance to the political turmoil and the personal relationships to the women in their lives. Laila's father Babi encapsulates the idyllic history of Kabul as a centre for poetry and architecture that bears the scars of invasions strategically by the Macedonians, Sassanians, Arabs, Moghuls, the Soviets, and after his death, the Taliban and eventually the US. The paper would finally contend that the narrative holds a positive hope of regenerating peace and reformation for the progeny in the city of Kabul as Laila returns from Pakistan with Tariq and the two children Aziza and Zalmai to find sanctuary in this city rich with its cultural heritage despite the bloodshed caused by the Soviet invasion and the rule of the Taliban.

Dr. Sabreen Ahmed
Department of English
(A Post Graduate Department Affiliated to Gauhati University)
Nowgong College
Nagaon, Assam, India
e-mail : sabreen54321@gmail.com

Keywords

Kabul, History, Taliban, Cultural Heritage, Women

The history of Afghani culture can be traced back to the Achaemid Empire of the 6th century BC. Situated at the important junction on the ancient Silk Road, which has been the cultural crossroads separating the Mediterranean world and Persia to the west from India and China to the east, Afghanistan owes its history to its position on the map. In terms of language and culture, Afghanistan retains a rich heritage that not merely dates back to thousands of years but also charts a transnational trajectory in the form of a Persian literary culture apolitically inclusive of countries like Turkey, Iran, Pakistan, and India. At the end of the 18th century, Kabul became the capital of Afghanistan. However, the war destroyed and traumatized the entire city and its cultural heritage, followed by massive looting of the Kabul Museum and sold on the international black market. During the oppressive Taliban regime, cultural activities like art, poetry, music, kite flying, etc., depicted in the novel were severely restricted and diminished. Currently, the Islamic State of Afghanistan has two official languages in the country–Dari and Pashto. Both Pashto and Dari are Indo-European languages that adopted the Arabic script in the 7th century. About 50% of the Afghans speak Dari, and some 40% speak Pashto. Apart from Dari (Persian), Pashto, the other major languages of Afghanistan, also possesses a wealth of literature, both oral and written. Other languages in Afghanistan include Turkic languages (Uzbek and Turkmen), Baluchi, Pashai, Nuristan, and others spoken by minority groups. Dari and Pashto have a rich array of literature in content and aesthetics much wider in range to those representing the current Afghan diaspora. Some of their greatest poets include Jalaluddin Rumi, Omar Khayyam, Firdausi, Khushal Khan Khattak, and Rahman Baba, and so on. In this ground, my paper seems essentially limited in its dimension of representing the lived reality of the city of Kabul as I look at a selected fiction in English from the Afghan diaspora while missing out on the larger literary scenario that includes not merely Pashto and Dari but also other languages as well. However, the new age Afghan writers from the diaspora write mostly in English. The well-known among them are Tamim Ansary, Khaled Hosseini, Assef Soltanzeda, Nushin Arababzada, Zohra Saed, Shah Mahmoud Hanifi, Mahmoud Tarzi, Mir Hekmatullah Sadat, Shahiq Shamel, Atiq Rehmani, Wajma Ahmadi, and so on who explore issues of marginalization, nostalgia, the futility of war, economic crisis, discrimination, etc. in their works. An article on the cultural heritage of Kabul says:

"Kabul is busy healing its surface wounds. The shelled and bullet-ridden walls that line

the city roads are being repaired. In the Shar-e-naw and Wazir Akbar Khan areas of the city favoured by the 7000 foreigners, the buildings are being renovated so they can be rented". (Nandi 99)

To support Afghanistan in conserving its richness of intangible cultural heritage, a pilot project for the documentation of Afghanistan's traditional music was undertaken by the UNESCO Kabul office in 2006. More than 200 newspapers and magazines have been started in Afghanistan since the fall of the Taliban in late 2001. Almost half of them are published in Dari, while some 30 percent are printed in Pashto. The rest of the publications are officially bilingual.

The novel *A Thousand Splendid Suns* preceded by the international bestseller *The Kite Runner* by the same author, goes a long way in making an effort at post-conflict state-building by a writer from the Afghan diaspora who had to leave his homeland during the Soviet attack and take refuge in the US. In 2006 Khaled Hosseini was honoured by the UN Refugee Agency and named UNHCR. The novel under discussion is a part of the goodwill project. The novel depicts the city of Kabul as a lived reality that perished and survived constant bloodshed and political mayhem erased of its rich culture of poetry and architecture during a dictatorial fundamentalist regime. The trouble started with the coming of the Soviets who, though were instrumental in improvising the condition of women, but created a factional divide amongst the ethnic groups resulting in civil wars where the Afghan majority vested their hopes with the Mujahedeen as restorers of Afghan dignity. The narrative shares information about the reign of the socialists in Kabul in the dialogue between Mariam and Jalil in the initial chapters:

"Anyway, Afghanistan is no longer a monarchy, Mariam. You see, it is a republic now, and Daoud Khan is the president. There are rumors that the socialists in Kabul helped him take power. Not that he is a socialist himself, mind you, but that they helped him. That's the rumour anyway." (Hosseini 23)

The story moves from Herat to Kabul when Mariam, the illegitimate child of Jalil, is given away in marriage against her will to a much elder man Rasheed who lives in Kabul and is trapped in a loveless and childless marriage. Mariam typified the role of a culturally ordained submissive female subject ill-treated at the hands of her husband until she meets Laila and eventually shows a remarkable resistance by killing Rasheed to liberate herself and Laila from his tyranny and resiliently face the consequence of public execution by the Taliban rule of justice. Women are supposed to be as holders of men's honor or Namus; thus, they stay inside the

domestic sphere and are supposed to be silent and voiceless (Kiddie, 2006: 39). The family of the tribe and ultimately the nation are invested in women. Moghadam in this context points out that: The issue of women's rights in Afghanistan has been historically constrained by (a) the patriarchal nature of gender and social relations deeply embedded in traditional communities (b) the existence of the weak central state, that has been unable to implement modernizing programs and goals in the face of tribal feudalism (Ghosh, 2003: 05). The life of Mariam, Laila, and their like that Hosseini portrays in the novel reflect the inhuman picture of rampant gender apartheid under the Taliban regime that denigrated women to inferior beings trapped in a claustrophobic existence under fundamentalism being denied the basic human attributes of freedom and knowledge. However, the novel sets the example of Laila as an exception who fights with destiny with courage and determination and dreams of a peaceful and progressive Kabul till the end of the narrative despite the loss of her brothers, her parents a long separation from her beloved Tariq, and finally Mariam who gave herself away to the Taliban to rescue Laila and her children to have a worth living future with Tariq. Unlike Mariam, Laila was born on the eve of the Soviets invasion of Afghanistan had access to the world of knowledge through schooling and through the intense care of her father, who was a university teacher in Kabul until the civil war devastated her family. Laila's narrative in association with her father Babi depicts an otherwise peaceful Kabul despite the ongoing squad between the Soviet and the Mujahedeen in the provinces of Afghanistan added by the sectarian and ethnic differences between the Tajiks, Pashtuns, Hazaras, and Uzbeks. But moving out of the city, the scene was bleak as pointed out by Babi in one of his visits along with Laila:

"That's called Shahr-e-Zohak. The Red City. It used to be a fortress. It was built some nine hundred years ago to defend the valley from invaders. …Macedonians. Sassanians, Arabs. Mongols. Now the Soviets. But we are like those walls up there. Battered, and nothing pretty to look at, but still standing." (Hosseini 144)

The city of Kabul assumes a character in itself in Hosseini's narrative, and during the initial stage of the war, it gradually turned savage. Hosseini adopts violent imagery to describe the scene of carnage:

"Outside rockets were zipping across the sky as Hekmatyar's and Masoud's forces fought and fought. Laila knew that somewhere in the city, someone had just died, and a pall of black smoke was hovering over some building that had collapsed in a puffing mass of dust. There would be bodies to step around in the morning. Some would be collected. Others

not. Then Kabul's dogs, who had developed a taste for human meat, would feast." (Hosseini 183)

As many families made their plans of leaving Kabul during the Soviet attack, Laila's father recalls a poem on the city by a 17th century Farsi poet Saib-i-Tabrizi and the resonating meaning of the first two lines:

"One could not count the moons that shimmer on her roofs,
Or the thousand splendid suns that hide beneath her walls." (Hosseini 186)

Laila is a war survivor, a girl with a zeal for independent dreams who copulated outside wedlock with her childhood beloved Tariq, who had left for Pakistan before her parents got killed in the Mujahedeen's shelling of Kabul following the fall of Najibullah and the failed attempt at a shared government. However, she miraculously survived the blast and was rescued and later married to old Rasheed, and found a sanctuary of a legitimate father's name for taking the custody of her unborn child. The home of Rasheed, a breeding ground of domestic violence more for the aging Mariam and less for the defiant young Laila, became the succor of feminine bonding for the two women and Laila and Tariq's daughter Aziza served as the elixir for the distressed Mariam. However, Mariam aslo received a little education, though not a formal one, from a friendly Maulana at Herat named Mullah Faizullah. Before meeting Laila, Mariam had no consciousness of being subordinate as she was raised by her mother and other kith and kin to be naturally submissive and believe in one's destiny as a woman to serve and obey. Soon Rasheed fathered a son Zalmai through Laila and became more dictatorial and violent as days passed. Rasheed's affinity for the Taliban allows readers additional insight into his sexist attitudes, and the way he can use the Taliban regime to gain even more power within his household. Mariam's life was bad enough, so was Laila's, but the decrees of the Taliban are harsh, and the penalty of defiance is even harsher as the accounts of Laila's doctor and teacher were disclosed. For the Taliban, women are disgraceful creatures. It is their dressing up, wearing jewellery, painting their nails, and so on that corrupt their men, they cannot be trusted to move alone on the streets, they are to be escorted by men wherever they go, ostensibly to protect them but actually to keep them under surveillance. Rasheed supports all these misogynist stances of the Taliban as the dictates of the Koran. Later in the novel, Laila is repeatedly beaten up by Taliban members when she goes out alone to visit her daughter, who is forced to live in the orphanage. Besides, the descriptions of the inhuman conditions

of the women's hospital and the miserable circumstances there reinforce the conduct of the Taliban. But before the Taliban, the cultural injury done by the Soviet army was no less heinous. The narrative vividly discusses the newsletters and pamphlets of insurgent groups and resistance organizations that presented the Soviet as venom targeting the country's children:

"Children are the intended victims of the Soviet land mine campaign. The article went on to say that the soviets also liked to hide explosives inside brightly coloured toys. If a child picked it up, the toy exploded, tore off fingers or an entire hand. The father could not join the jihad then; he'd have to stay at home and care for his child". (Hosseini 121)

After the Soviets left in 1987, a series of civil wars and a continuous change in governmental leaders swept over Afghanistan until the Taliban came into full power in September of 1996. They took over the main city of Kabul and renamed Afghanistan The Islamic Emirate of Afghanistan. The Taliban, meaning students of Israel, was a militant Islamic movement that ushered hope of bringing reforms after the end of the civil war with the Soviets and the overthrow of the politically corrupt Mujahedeen. But the idea of reform that they wish to bring about did the opposite in their extreme adherence to theocratic principles and corporeal punishment, which they based on Sharia law. The head of the Taliban was Mullah Mohammad Omar, a Sunni Muslim from the rural outskirts of Afghanistan. Hosseini shows tripartite political sabotage to the civilians of Afghanistan in the face of the Mujahedeen, the Soviet, and the Taliban. The time span covered by the novel saw a drastic upheaval in the political terrain of Afghanistan mainly because of the civil war in which the participating parties changed several times, causing terrible political and economic instability, poverty, injuries, and violent death of hundreds of citizens. The stories of armed conflicts, abused teenagers, and orphanages abound in the novel's narrative content. Mariam and Laila reunited after the Kabul attack at the abusive home of Rasheed become a symbol of feminine boding against the sexist nature of the country that denies women the lack of choice in matters of marriage, childbearing, and healthy life in general.

The narrative, however, fosters a ground of political hope in the missions of child rescue. *A Thousand Splendid Suns,* as the writer anticipates, would rise in the heart of each hopeful child of the changed city of Kabul and the country at large in their life-altering journey towards a better future after the fall of Taliban at the hands of the U.S. Though the present political scenario shows signs of peaceful

negotiation between the insurgent Taliban, the present government and the US there is every chance of revival of the unjust gender apartheid meted out to Afghan women in the process of reconsolidating an Islamic state that restricts art, culture, music and an aesthetic sense of living. According to a report by the BBC Kabul, last year shows that the Taliban are now in full control of 14 districts, i.e., 4% of the country, and have an active and open physical presence in further 263, i.e., 66%, significantly higher than previous estimates of Taliban strength. Meanwhile, there is no prospect of an end to the conflict, and a new generation of Afghans, mainly women and children, still live in the shadow of violence reiterated in Hosseini's more than decade-old narrative. Nonetheless, the last chapter of the novel reverberates with the idea of positivity after the partial end of a saga of civil wars. The transition phase is highlighted by the fact that the film Titanic was openly screened for the people of Kabul. In this phase of rebuilding and restoration of culture and aesthetics and human rights, Laila, Tariq, and their team take an active role. The signals of a revival of culture and prosperity are termed as Kabul's "penance" by the writer that Laila hears in the music of Kabul's street corners, in rubab and tabla, in the tones of dootar, harmonium and tamboura, and old Ahmad Zahir songs. The rhetoric of cultural hope for Kabul is fine-lined in the following passage from the novel.

> "The drought has ended. It snowed, at last, this past winter, knee-deep, and now it has been raining for days. The Kabul River is flowing once again. Its spring floods have washed away Titanic City…we need Kabul to be green again, people say". (Hosseini 396)

Hosseini's representation of rebuilding and restoration is often accused of falling prey to the neo-colonial discourse by asserting the right of the western states to impose their values on the rest of the world. However, the discourse of cultural revival through the location of indigenous literary and art forms does away with such a critique by giving the literary artist a chance to paint a picture of peace and progress for a better progeny in times to come.

Works Cited

Abdullah Mohammad Dagamesh and Olga Golubeva. "Khaled Hossenei's *A Thousand Splendid Suns* as a Child Rescue and Neo-Language", CLCWeb : Comparative Literature and Culture 19.4(2017) : https://doi.org/10.7771/1481-4374.3057

Hosseini, Khaled, *A Thousand Splendid Suns*, New York: Bloomsbury, 2007, Print.

Keddie, Nikki R. Modern Iran : *Roots and Results of Revolution,* New Haven : Yale

University Press, 2003. Print.

Nanda, Ratish. *The Cultural Heritage of Afghanistan* India International Centre Quarterly. Vol. 30, No.2 (Monsoon 2003), p. 99-109. Print.

Najibullah, Farangis, *Afghanistan : Status of Dari, Pashto Languages a Sensitive Topic* https://www.rferl.org/a/1104868.html

Stuhr, Rebecca A, *A Thousand Splendid Suns : Sanctuary and Resistance* in Critical Insights: Cultural Encounters, Ed Nicholas Brins et al., MA : Salem Press, 2013. Print.

Sharifi, Shoaib, "Taliban threaten 70% of Afghanistan, BBC finds" BBC World Service, Kabul. 31st January 2018 https://www.bbc.com/news/world-asi-42863116

https://digitalcommons.unomaha.edu/daripashtobooks/

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-2, December 2020
pp· 130-141

Effect of Music on Human Mind and Emotion

Dr. Sudarshana Baruah

Dr. Sudarshana Baruah
Lecturer
Teacher Training (DIET)
Govt. of Assam, India
e-mail : sudarshana.baruah83@gmail.com

Abstract

Psychology is the science of mind and behaviour. It includes the study of conscious and unconscious phenomena, as well as feelings and thoughts. Psychology also studies the mental functions of individual social behaviour and different behavioural changes. The subject is related to our feelings and thought process.

Art is the medium of expression of human thoughts, beliefs, experiences, happiness and sadness, and creative skills which we could learn from our life circle. Among all the art forms, performing arts like music, dance, and playing of musical instruments are related to our thoughts, feelings, and creative skills. Through music, people can express and communicate their feelings. These give immense pleasure and positivity to our minds. Music is therapy through which we can treat the patients of Autism, patients suffering from different diseases like cardiac problems, psychological disorders, speech disorders, disorders related to special children, etc. Music makes us mentally cheerful, enthusiastic, and always keeps our mind fresh. It develops an interest in the study and increases the concentration level. The study will encompass the psychological and behavioral changes in human beings.

Keywords

Psychology of child, Musical benefits, Cognitive development, Functions of the brain, Psychomotor skill

1. Objective of the Study

The objectives of the research endeavour to observe how musical sounds and rhythms or beats work on human psychology, how the brain works, and how the behaviour feelings and thoughts process, etc.

2. Research Design and Methodology

The research is based on analysis and the primary and secondary data collected from journals, books, news papers, published books, web pages, etc.

3. Introduction

Music is embedded in society and across cultures as an organic and dynamic entity. As per as evoking emotions and feelings are concerned, music is far more powerful than language and also powerful than other art forms. In the 19th century, Pt. Sharangadeva wrote in his book 'Sangeet Ratnakara' that 'Geetang Nrityang Vadyang Tranyang Sangeet Murchayate'. (In Sanskrit)

Anecdotes– Geet (Songs), Nritya (Dance), and Vadyas (Instruments) altogether is called Music. Music is a powerful medium for emotional expression in a short time. That is why music is given the highest position among the other arts. In visual arts like painting, sculpture requires a medium (colour, Brass, etc.) to create art and here the audience is not directly related. But in performing arts like music, dance, and drama, the medium is the only human body. Through voice, an artist can create songs, compositions, but through body movements, dancers and dramatists express their feelings. Performing arts are always directly connected with the audience.

Across cultures, music has been characterized as the 'Language of emotions'. This has spurred a heightened interest in how the brain processes music, thereby creating consequent emotions. Be it in films, live orchestras, concerts, or in a simple home stereo, music can be so evocative and overwhelmingly stirring that it can blur the boundary between thought in the head and an event of real life.

Music can be considered objective in nature. If there is a sad melody, then it would sound sad to the majority of the audience and they may cry. Similarly, a particular type of music would have the same effect on the majority of listeners. However, there can be a few people whose perceptions will differ from the majority.

We experience what are called emotions in our hearts. The heart is nothing but our brain reacting to emotional stimuli. The exploration of new frontiers in this way, music affects the brain and elicits physiological emotional responses. It has opened up exciting new possibilities for utilizing music. A scientific study of human behaviour is called psychology.

The subject has been an interest in ancient times. Generally, Psychology means the study of the soul. It is derived from two Greek words 'Psyche', meaning soul, and 'logos' signifying a rational course of study.[1] Music is defined as melodious and harmonic notes which please the ears. What displeases the ear is noise. Through music, people express their emotions and passion. There are two bifurcations of music, *Margi* (classical) and Deshi (folk). *Deshi* music is related to common or folk people. It is derived from common people's emotions and sentiment. People's emotions, lifestyles, eating habits, faith, beliefs, customs, rituals–all have been depicted in the lyrics and the stories of folk songs.

Margi music refers to music which is strictly rule-bound. Bharatha in his book "Natyashastra"(early 2nd century) devoted a few chapters to the psychology of music learning and memory of music.[2]

3.01. Psychology and Music

A scientific study of human behaviour is called psychology. The subject has been an interest in ancient times. It is derived from two Greek words–psyche, meaning soul and logos, signifying a rational course of study. Music seems to be present in all cultures, and it appears to be very deep-rooted in the human psyche. We know that music is a perceptual entity and is controlled by our auditory mechanisms. Music affects emotions and mood. It makes people want to dance. It is intensely connected to memories. People can remember lyrics from decades ago without any effort. The emotional content of music is very subjective. A piece of music may be undeniably emotionally powerful, and at the same time be experienced in very different ways by each person who listens to it.

Music engages much of the brain and coordinates a wide range of processing mechanisms. This naturally invites consideration of how music cognition might relate to other complex cognitive abilities. Music has the tremendous ability to affect and manipulate emotions, and the brain is undeniable, yet largely inexplicable. No serious research had done into the mechanism behind music's ability to physically influence the brain, and even now the knowledge about the neurological effects of music is scarce. The human brain, which is one of the most complex organic systems, involves billions of interacting physiological and chemical processes.

Music is widely regarded as a means of enjoyment and entertainment. However, music has also been used toward improving the well-being of patients. While the brain interprets music, successive biochemical reactions are induced within the body. Many evidence indicate that music plays

a role in activating pleasure-seeking areas of the brain that become stimulated by food, sex, and drugs.

Biological effects of music have mostly been studied with the heart beat variability and blood pressure, which look to explain the cognitive background of musical appreciation, stress relief as well as emotional identification. The messengers within the body which carry the signals vary from small to large molecules which are vital for physiological health. Research on music therapy has shown that it can decrease pain and anxiety in critical care patients. Music has demonstrated effectiveness in reducing pain, decreasing anxiety, and increasing relaxation. Besides, music has been used as a process to distract persons from unpleasant sensations and empower them with the ability to heal from within. Music is an effective adjunct to a pharmacologic anti-emetic regimen for lessening nausea and vomiting, and this study merits further investigation through a larger multi-institutional effort.[3] Listening to music under general anesthesia did not reduce preoperative stress hormone release or upload consumption in patients undergoing gynecological surgery.

3.02. Music Helps Us Exercise

We have seen how music acts upon persons of the different constitutions, and how men susceptible to their influences behave in the world. Music stimulates the nerves of a person very mildly and regulates the flow of blood. It creates a power of concentration in the mind and spreads an agreeable massive sensation all over the body. The person feels under the influence of music, disposed to receive impressions from outside. It tills his frame, and furrows it, and renders it fertile for the reception and growth of ideas. When, for instance, he listens to music while playing cricket, he feels that he has to throw himself heart and soul into the play. When he attends a religious or social ceremony accompanied by music, he feels that the ceremony has begun and that he should be earnest about it. Music makes the funny things serious and invests a sentiment of reality even in imaginary objects. It spreads a charm over the mind, a slight form of intoxication, under which objects appear as if surrounded with an atmosphere of imagination and fancy. Musical stimulation is never too great. The brain is not put to strain. The whole nervous system of the body enters into a state of vibration, which being uniform throughout does not differ much from the normal condition. There is no loss of energy sustained, but only an equal from distribution begins from the nerve which it sets in order. Music is therefore used as a means of curing certain nervous diseases, lunacy, and other similar affection, which will soon disappear. Music can easily set right such disorder using the regularity

of its vibration. In health, it creates a mirthful spirit and acts as a good tonic. In sickness, it acts as a medicine and even better especially in nervous ailments. While medicine acts from the outside, music proceeds from within. Medicine may wrong and produce evil effects, but music does not harm, even if it cannot succeed.[4]

3.03. Music Terminology

Music is nothing but a combination of sound that makes sense. To understand music better, some of its characteristic terms have been described here

Note–A pitched sound itself, there are 7 natural and 5 sharp/flat notes in music.

Octave–Octave is the interval between one musical pitch and another with half or double its frequency.

Scale–A scale is any set of musical notes ordered by the fundamental frequency.

Chord–A chord is three or more notes that combine or agree with each other.

Rhythm–The pattern of regular or irregular pulses caused in music by the occurrence of story and weak melodic and harmonic beats.

Tempo–The speed of the beat of the composition.

Melody–The tune of the composition.

Harmony–The background to the melody.[5]

3.04. Definition of Emotion

Emotion is a complex set of interactions among subjective and objective factors, mediated by neural/hormonal systems, which can

1. Give rise to effective experience such as feelings of arousal, pleasure/ displeasure,
2. Lead to behaviour that is often, but not always, expressive, go at oriented, and adaptive,

According to ancient Indian philosophers, 9 fundamental rasas encompass all emotions.

Sanskrit Term	Principal meanings	Further meanings and related emotions
Shringara	Love	Beauty, Devotion
Hasya	Joy	Humour
Adbhuta	wonder	Curiosity, Mystery
Shanta	Peace	Calmness, Relaxation
Raudra	Anger	Irritation, Stress
Veera	Courage	Pride, Confidence
Karuna	Sadness	Compassion, pity, sympathy
Bhayanka	Fear	Anxiety, worry
Vibhatsa	Disgust	Depression, Self-pity.[6]

3.05. Mood of Music

Music shares a very special relationship with human emotions. We often choose to listen to that song or music which best fits our mood at that instant. Songs with a similar pattern or their similar audio feature range will be grouped to yield a

particular mood as soon as follow :

Mood	**Adjective**
Happy	Cheerful, funny, romantic
Sad	Depressed, frustrated, angry
Exciting	Dance, celebration, party
Silent	Peaceful, calm

Various musical terminologies, which were made famous by numerous music accessories, are commonly associated with human emotions.

Structural Feature	**Associated emotions**
Tempo	Fast Tempo– Happiness, excitement, anger, sadness
Mode	Major Tonality–Happiness, Joy, Minor tonality, Sadness
Loudness	Intensity power
Melody	Happiness, Harmony, etc.
Rhythm	Smooth/Peace/happiness[7]

3.06. Healing Power of Music

The comforting and unified melody is not merely a source of entertainment, but can also be a great stress–buster. Additionally, listening to our favourite music regularly may eliminate soreness, pressure together with improving excellent sleeping and memory power. In short, it is the most effective healer and acts as a medicine for recovery. Music can help patients to fight against pain. One such demonstration has been done at Cleveland Clinic, where surgery patients who listened to recorded music, mentioned up to 4 times decrease in post-surgical pain.

4.00. Effect of Music on the Human Mind and Body

There are seven musical notes S, R, G, M, P, D, N in Indian music. The eight-note is the same as the first and is called its octave. These notes are either Prakrita (natural) or vikrita (accidental). The simplest way of representing the 13 notes of the octave is thus-

S, R1, R2, G1, G2, M1, M2, P, D1, D2, N1, N2, S.

There are three octaves: Mandra (lower), Madhya (middle), Tara (higher). The story is related only to show the phases of the mind produced by musical notes :

S and P are tranquil notes
R1 and D1 indicates the disturbance
R2 and D2 are perceptions
G1 and N1 indicate disagreeableness.
G2 and N2 indicate inquiry.
M1 denotes optimism or egoism.
M2 denotes degradation.[8]

The lower tetrachord refers to the sensual plane of consciousness and the higher to the intellectual. Higher and lower octaves are only reflections of this principal octave. All musical notes in the octave thus represent different kinds of facial expressions and conversely, every calm countenance may be referred to as a musical note. In Indian literature, emotions are divided into nine classes :

Sringara (love), Hasya (ludicrousness),

Tenderness (Karuna), Rudra (anger), Vira (heroism), Bhayanaka (fear), Bhibhatsa (disgust), Adbhuta (wonder), Santa (calmness). In the case of ragas that express pain, sorrow, disappointment, the notes must never be at a great distance from each other. The help of the graces or gamakas is very important. We will take only kampitam, Humpitam, Linum, and Andolitam and show how and when they are to be used for the sake of emotion, kampitam is tremor. The voice trembles only when agitated under certain feelings, such as fear, terror, and pain. When a note is accompanied by kampitam, it expresses strong excitement. Sita was alone in the parnasala when Rama went out in pursuit of the golden deer, and when the giant, Ravana stood before her in all his hideousness, her voice must have been influenced by kampitam. Humpitam is a grace that indicates strength, courage, and heroism. A lion's roar begins with humpitam, the arrow leaves the bow with humpitam, and when two fast going trains cross each other, they produce humpitam. The dholi bearers sing songs with full of humpitam, and humpitam added to a note gives strength and force to its expression. Andolitam is swinging; a baby begins its cry by a series of andolitams. Andolitam gives rise to the mirth. The voice of bashfulness and coquetry is full of andolitam.[9]

Time is also another factor to be considered. The time of a tune in which there is no excitement must correspond to that of the beating of the heart in the human body. For as describe before, it is the heart that has trained the nervous system from infancy in rhythmic principles. Since its beats increase under excitement, the time of music in such a mood must be quick. Hence martial music is always lenders. In grief, the movement as in the march of the high landers must be slow. The circulation of blood is slower. Music, in such a condition, must be of a slow movement, as in the funeral march. Music cannot express courage or excitement without the help of time, timber, and grace. Every raga could be analysed, its emotion could be defined and also embodied through pictorial representation, likewise every mental state has its own characteristics of physical expression.

4.01. Music Therapy

Every person has an instinct for music. Since ancient times, it has been known that the child in the womb adopts an impression from the surroundings and behaviour of its mother and also starts learning things. The Hindu scriptures and Ayurveda prescribe a particular daily practice for pregnant women. The sound of the veena, flute, mridanga, and samvedic mantras gives health to the pregnant women and the child within it. It had been studied that a fetus of about

30 weeks can listen to music and get affected by it. A piece of provoking music can discomfort the fetus but a piece of classical music provides calmness to him. A fetus of 33 weeks can recognize the music. This has been proved by the psychologist by carrying out experiments. Those babies who listened to that music in the mother's womb at once made a reaction to that particular music and became attentive, but the babies who never listened to that particular music before gave no activities. Experts believe that a baby in his mother's womb is influenced by the heartbeat of its mother. In the later years, the grown-up child also gets attracted to the musical rhythm relating it to his mother's heartbeat. Listening to Music during pregnancy helps for a healthy bonding between the mother and the child. Music helps and gives energy to the development of children's mind, soul, and body.[10]

Nowadays, psychology of music is a very important subject for study and research. Music has a very positive effect on our mind, body, emotion, and society. It benefitted us psychologically and physically. The cancer patients, patients with a different muscular sprain, have been treated by the use of music therapy not only in India but in different countries in the world. Music can play an effective role in helping us lead better fruitful live. Listening to specific kinds of music at specific times of the day helps maintain good health. Indian music with its many ragas, is known to be particularly therapeutic value. The curative power of music emanates from the resonance of certain ragas on hormonal and glandular functions which produce secretions that keep the body balanced and infection-free. So it is very necessary to study musical concept and it's different aspects. Music is an art and science as well. So a scientific study of music is necessary. It helps us in our mental development as well as personal growth. Music therapy covers high attention among the masses. The above article encompasses and highlights the psychology of learning music, how memory works in learning music, principles of music, musical notes, and its impacts on our mind and emotion. Music therapy is considered to be the most expressive therapy. It is an interpersonal process in which music is used for the treatment of different physical emotional, mental, social, and spiritual problems. Music therapy not only heals the disabled or ill persons but also improves the quality of normal and healthy persons. Music is a kind of yoga system through the medium of sonorous sound, which acts upon the human organism, awakens and develops their proper functions to extent of self-realization.

Psychology is the science of the mind. It teaches us how to examine our minds

and the changes undergone from time to time under a certain influence. Just as a doctor observes the changes in the physical condition of his patient under the influence of a particular drug, the psychologist observes the changes which the mind presents in different conditions. The process of observing our mental conditions is called introspection. Through introspection and interpretation, we shall examine the changes which the mind experiences under the influence of musical notes. Music has hitherto withdrawn itself from scientific treatment more than any other art. Poetry, painting, and sculpture borrow at least the materials for their delineations from the world of experience. They portray nature and man. Their materials can not only be critically investigated for its correctness and truth to nature, but also scientific art criticism, and aesthetic pleasure is the intention of this art. This study encompasses the use of psychological study in music, its relation, and memory for learning music.

People described music as a catalyst for achieving mood-change, mood-enhancement, and different psychological states of mind. B.L. Wheeler, a psychotherapist divided the practice of music therapy into three levels :

1. Music therapy as an activity therapy, mostly therapeutic activities is used;

2. Insight music therapy with reductive goals, help in changing the behaviour of the person;

3. Insight music therapy with reconstructive goals, help in reorganising the personalities.[11]

Music therapies are nowadays used for improving psychological and physiological issues. It is mainly used for stroke patients, and recent studies have shown that music therapy has delivered results in the case of stroke patients.

4.02. The Three Domains of Learning

Cognitive–Mental skill

Affective– Growth in feeling or emotional area.

Psychomotor–Manual or physical skill.[12]

Cognitive Domain

The cognitive domain involves knowledge and the development of intellectual skills. (Bloom's taxonomy, 1956) This includes specific facts, procedural patterns, and concepts that serve in the development of intellectual abilities and skills.

The Affective Domain

(Emotion-based)

Skill in the affective domain describes the way people react emotionally and their ability to feel other living things' pain or joy. Affective objectives and growth in attitudes, emotions, and feelings.

There are five levels in the affective

domain moving through the lowest order processes to the highest.

Receiving– the lowest level, the student passively pays attention to. Without this level, no learning can occur.

Receiving is about the student's memory and recognition as well.

Responding– The students actively participate in the learning process not only attend to a stimulus, but also react in some way.

Valuing

The students attach a value to an object, phenomenon, or piece of information. The students associate a value or some values to the knowledge they acquired.

Organizing

The students can put together different values, information, and ideas, and can accommodate them within their schema. They can compare, relate and elaborate on what has been learned.

Characterizing

The students at this level try to build abstract knowledge.

The Psychomotor Domain

(Action based)

Skills in the psychomotor domain describe the ability to physically manipulate a tool or instrument like a hand or a hammer. Psychomotor objectives usually focus on change and or development in behaviour and or skills.[13]

The psychomotor domain refers to the use of motor skills, coordination, and physical movements. Measurement of learning may be gauged in terms of the following :

1. Speed

2. Strength

3. Edurance

4. Coordination.

4.03. Music Training can Significantly Improve our Motor and Reasoning Skill

We generally assume that learning a musical instrument can be beneficial to kids. But it's useful in more ways than we can expect. One study showed that children who had training in a musical instrument for years or more can perform better than those who did learn an instrument in auditory discrimination abilities and fine motor skills.

How the Brain Works in the Cognitive Domain

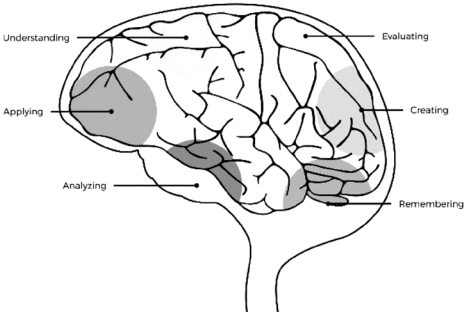

4.04. Our Brain Functions to Creativity

Nearly all of the signals from the brain to the body and vice versa cross over on their way to and from the brain. The right cerebral hemisphere of the brain primarily controls the left side of the body and the left hemisphere primarily controls the left side of the body. When one side of the brain is damaged, the opposite side of the body is affected. For example, a stroke in the right hemisphere of the brain can leave the left arm and leg paralyzed. The cerebrum (both sides of the brain) is split into two halves (hemisphere) by a deep fissure. Despite the split, the two cerebral hemispheres communicate with each other through a thick tract of nerve fibers that lie on the base of this fissure.[14]

Although the two hemispheres seem to be mirror images of each other, they are different. For instance, the ability to form words seems to lie primarily in the left hemisphere while the right hemisphere seems to control many abstract reasoning skills. When people see a picture of the brain, it is usually the cerebrum that they notice. The cerebrum sits at the topmost part of the brain and is the source of intellectual activities. It holds your memories, allows you to plan, enable you to imagine, and think. It allows you to recognize friends, read books, and play games. All the parts of the brain work together, but each part has its own special properties. The brain can be divided into three basic units. The forebrain, the midbrain, and the hindbrain.[15]

The hindbrain includes the upper part of the spinal cord, the brain stem, and a wrinkled ball of tissues called the cerebellum. The hindbrain controls the body's vital functions such as respiration and heart rate. The cerebellum coordinates movements and is involved in learned rote movements. When you play the piano or hit a tennis ball, you are activating the cerebellum.[16]

The uppermost part of the brainstem is the midbrain which controls some reflex actions and is the part of the circuit involved in the control of eye movements and other voluntary movements. The forebrain is the largest and most highly developed part of the human brain. When people see and enjoy a picture or art, the cerebrum of the brain usually works. The cerebrum sits at the topmost part of the brain and is the source of intellectual activities. It holds your memories, allows you to plan, enable you to imagine and think. These are the major parts of the brain in creating art. It allows you to recognize friends, read books, and play games.

Conclusion

Every person has an instinct for music. Since ancient times, it has been known that the child in the womb adopts the

impression of its surroundings and behaviour of its mother and also starts learning things. The Hindu scriptures prescribe a particular daily practice for the pregnant woman.[17]

Nowadays, the psychology of music is a very important subject to study and research. Music has a very positive effect on our minds, body, emotions, and society. The cancer patient with different muscular sprain has been treated by the use of music therapy, not in India but also in other countries of our world. Just as a doctor observes the changes in the physical condition of his patient under the influence of a particular drug, the psychologist observes the changes which the mind presents under different conditions. The process of observing our own mental conditions is called introspection. We shall through introspection and interpretation examine the changes which the mind undergoes under the influence of musical notes. Listening to specific kinds of music at specific times of the day helps maintain good health and a good mind. Music is an art and science as well. So, a person must listen to music, at least one meaningful and melodious song in a day to build fine mental status and good health.

Reference

1. Rao, H.P. Krishna (2008) : *The Psychology of Music*, Low Price Publications, Delhi, p. 5-7
2. Rammohan, *V.Gowri (2010) : Devashruti,* Kafla Intercontinental Publication, Chandigarh, p. 25
3. Sarma, Monorama (2009) : *Music Therapy,* APH. Publication, Delhi.p. 27
4. Vema, Amit (2018) : *Sangeet Galaxy*, Journal , vol-7, issue-1, p. 17-33
5. ibid. p. 17-33
6. ibid. p. 17-33
7. Borthakur, Dilip Ranjan (2015) : Anunaad, *Music Magazine*, S. Borthakur Publication, Silpukhri, Guwahati, ISSN. p. 20
8. ibid, p. 17
9. Rammohan, V. Gowri (2010) : *Devashruti*, Kafka Intercontinental Publication, Chandigarh p. 54
10. Tiwari, Kiran (2008) : *Sangeet avam Manuvigyan*, Kanishka Publication p. 45
11. Rao, H.P.Krishna(2008) : *The Psychology of Music*, Low price Publications, p. 15-19
12. ibid. p. 20-24
13. Tagore, Rabindranath (2004) : *Raga and Rasa, Gitanjali, Ruckert,* p.52
14. Vishwanathan, Priya : *The Raga Ragini System of Indian Music*, Consonance and dissonance, Wikipedia
15. Mohana, Malini(2013) : *Music and how it impacts your brain,* emotions, article, weblink.
16. Phadnis, Ashma(2017) : *Music and life sciences psychological importance of music*, journal-issue -1, Vidyavarta, Harshwardhan publication, Dept. of Music, Nasik, p. 9-11
17. Lath, Mukund (2006) : *Aspects of Indian Music, An inquiry into the raga*, edited by Sumati Mutatkar, p. 113

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-2, December 2020
pp. 142-148

The Collision of Human Emotions and Money-Logic in *The Merchant of Venice*

Oindrila Ghosh PhD

Oindrila Ghosh PhD
Associate Professor
and
Head, Department of English
Diamond Harbour
Women's University, India
e-mail: Oindrila_24@yahoo.com

Abstract

William Shakespeare's ***The Merchant of Venice*** *has been a popular choice as text in schools and colleges for decades not often highlighted as a play that revolves around the enmity between the Christian Merchant Antonio and the Jewish money-lender Shylock. In all such simplistic readings, this forms the apparent context of the play, while the interrelations between money and human emotions remain the deeper, less-noticed, and less-discussed sub-text. The mercantile world of Venice, with the Jewish money lenders and the Christian merchants borrowing money for trade, are in fact, present to hint at an amoral, commercial value-system which operates in the play– the economics of human relations, where money and emotions, coalesce or collide at every step. This essay specifically seeks to draw attention to the deep-embedded money-logic that operates within the folds of the apparently simple plot, love, courtship, and enmity in this Shakespearean comedy.*

Keywords

Shakespeare, money, Christian, Shylock, Antonio, commerce

William Shakespeare's *The Merchant of Venice* has been a popular choice as text in schools and colleges for decades now, perhaps because of its simple fairy-tale or romance-motif (Muir 54) or its plot open to moralizing on good and evil. The enmity between Antonio and the cut-throat Jewish money-lender, Shylock, forms the apparent outer core of this play. What perhaps goes unnoticed or often underplayed is the deeply-mercantile world of the play itself, where the interplay of money and human emotions is a constant. The Rialto, or the market place of trade and commerce, the Jewish money lenders, lending money at interest,

the Christian merchants borrowing money for trade, are not present merely to represent the morally correct principles of Christianity against the morally suspect practices of Judaism (as the characters repeatedly accuse each other), nor merely to juxtapose the humane with the inhuman, but also to emphasize that an amoral, commercial value-system operates in the play and that it operates on the economics of human relations, where money and emotions collide at every step. John Molyneux comments thus:

> As regards Shakespeare's understanding of, and hostility to, money, it is necessary to understand that money was then 'an issue' in the way that it has seldom been since. This was because although money as such had been around for millennia, the rule of money, its all-pervasive domination of society, was something new, arriving hand in hand with the development of capitalism and commodification, and therefore a matter of debate (in a way that it was not in later ages which took it for granted.) Luther, and others, made the corruption and especially the buying and selling of indulgences a key feature of their critique of the Church. At the same time, John Calvin, the key 'ideologist' of the Dutch Revolution, wrote an article arguing that usury was NOT a sin. The Catholic Church's condemnation of usury was rooted in its feudal opposition to capitalism and the need to keep bankers, money lenders, and aspirant bourgeois in their place. (n. Pag.)

This highlights the deep-embedded money-logic that operates within the folds of the apparently simple plot of love, courtship, and enmity. Indeed, Venice, the setting of the play, was a great urban centre of trade and commerce, booming as the trade-capital of Europe during the Renaissance. It was controlled, to a large extent, by rich money lenders of Jewish origin like Shylock.

The play posits the two worlds, and incidentally two logics, of money and romance, side by side, only to reveal that the logic of romance constantly draws upon the logic of money, the latter gaining precedence often. In Bassanio's mind, there happens to be no contradiction between the two. Bassanio's affection and friendship for Antonio, the melancholy merchant, is deeply coloured by mercenary needs too. Bassanio exploits Antonio's love for him. Even at the very critical juncture of revealing the secret about the woman in his life, Bassanio does not answer Antonio's question directly but points to his unrepaid and unrepayable debts. It is important to take note that it is for clearing Bassanio's debts and for providing him more money that Antonio finally signs the 'cruel' bond

with Shylock, which almost jeopardizes his life. Also, for Bassanio, the pursuit of the heroine Portia is as much the search for the 'Golden Fleece' of myth as it is a practical fortune-hunting. One cannot overlook the fact that she is a woman who could be the source that will satisfy all his future material wants. Bassanio is in no way ashamed to admit this, that '[i]n Belmont is a lady richly left. . . .' and that he intends that Antonio kindly supply him with further provisions, for him to gamble again with destiny to recover the fortune which he has already wasted:

. . . if you please
To shoot another arrow that self way
Which you did shoot the first, I do not doubt,
. . .or to find both,
Or bring your latter hazard back again . . .
(I, i 147-150)

Thus, the wooing of Portia right from its outset is as much a commercial venture as it is a romantic one. She signifies a source of fortune that would replace Antonio's and which, because of the legal right of the husband over wife's, would belong to Bassanio in a way that Antonio's, despite their friendship, cannot warrant. The way Bassanio is ready to pay off the debt ten times for Antonio's freedom, with Portia's wealth, shows that now, at last, Bassanio's position has changed from that of a penniless prodigal to a wealthy gentleman with money to dispose at his will:

Yes, here I tender it for him in the court,
Yea, twice the sum, - if that will not suffice,
I will be bound to pay it ten times o'er . . .
(IV, i 205-207)

The money that he boasts of willing to spend for Antonio is actually won through his possession of Portia! Thus, again it is love that also financially empowers a man in his society. The accusation of Shylock for his one-dimensional pursuit of money perhaps falls apart.

Portia also feels and accepts that love and money are both necessary for a comfortable life. She not only has the clarity to see why her suitors seek her hand because she is an heiress but in her offerings to her lover Bassanio, she too uses the double language of money and love:

. . . for you,
I would be trebled twenty times myself,
A thousand times more fair, ten thousand
Times more rich . . . (III, ii 152-154)

Though it is an emotional bonding that she feels with Bassanio, it, strangely enough, can be expressed emphatically and best only through the metaphor of money, denoting again the deeply materialistic fiscal culture that the play seems to hint at! And, thus, when Portia says:

Since you are dear bought, I will love you dear
(III, ii 312)

Can we read it merely as an innocuous expression of her deep love for a precious beloved? Or treat it as the reiteration of the fact that to possess Bassanio she has to give all her wealth, including her independence to manage it! Apart from this, there also remains the fact that immediately after their marital alliance, Bassanio will have to dispose off Antonio's debt with Portia's riches. Shakespeare leaves a lot unsaid and yet can alert the readers/audiences to the disturbing or problematic subtext.

The conversations between Bassanio and Shylock reveal two different aspects of monetary transactions, and the value of human emotions once more overlap with the hard metallic din of money. The conversation between Shylock and Bassanio utilizes and conflates the rival discourses and dialectics of money and financial obligations. Bassanio, the aristocratic nobleman, feels that financial agreements are and can be oral, based on a man's word of mouth and sense of his honour. But Shylock, the middle-class tradesman, believes and insists upon such agreements being written and contractual, based on the material reality of the assurance of the ability of the borrower to repay.

The 'bond' thus, is different in meaning for the two and recurs again and again in the play, with its double connotations of contractual agreement versus the tie between human beings showing how the former can often break the latter. Two kinds of systems – both monetary and emotional – are operative in the play. The logic of prodigality is placed as opposed to the logic of hoarding. For Shylock taking interest is not unethical, but it is just a business enterprise, a means to be thrifty, and is a purely amoral pursuit. The logic placed by Shylock is commercially sound when we realize that it is money which is either the bases of the love and marriage of Bassanio and Portia, or at least one of the reasons for the friendship between Bassanio and Antonio, and also of the enmity and pursuit of revenge between Antonio and Shylock. The romance element is thus placed right in the midst of the amoral commercialism of the Venetian social world.

The play also subtly states that the colour of money does not depend upon race, skin colour, religion, and acts as a leveler, cutting across divisions of rank and status. Whatever the text of the play may say, the economics underlying it reveals the symbiotic relationship between Christian merchants and money-lending Jews, who provide the ready money or capital

that fuels the trade and commerce of the city. The play and Shakespeare may have been absurdly accused of anti-semitism (Muir 54), but what the dramatist probably wishes to point out is that the rivalry between the two economic and religious communities is fuelled by the all-pervasive money-power of the Jews; their economic stronghold makes the Christian merchants envious. The play reveals a society that gets more and more mercantile, the progressive logic and the traditional divisions of rank and class are changing. Shylock stands for a certain kind of modernity of outlook, emphasizing that the interdependence among communities, the symbiosis, is coming to be dominated by money-logic. Even Antonio's 'Christian' generosity towards Bassanio is supported or furnished by the 'Jewish' money that he hates so much. Antonio, perhaps unconsciously, also uses his wealth to gain Bassanio's friendship and emotional leverage upon him.

The play presents us with a not-so-simple equation of love or emotions solely vested with the morally 'good' Christian characters and the insatiable thirst for money with the morally 'questionable' profit-making Jews. It is a play that forms and breaks at every point, such as rigid bifurcations, and shows through characterization and the allusions to scriptures how emotions of love and money are both indispensables in human relations and social transactions. Thus the famous scene where the reporting of Shylock's reactions to his daughter Jessica's elopement takes place, a strangely humorous admixture of emotions is observed:

> My daughter! O my ducats! O my daughter!
> Fled with a Christian! O my Christian ducats!
> Justice, the law, my ducats, and my daughter!
> A sealed bag, two sealed bags of ducats!
> And jewels, two tones, two rich and precious stones,
> Stol'n by my daughter! Justice! – find the girl,
> She hath the stones upon her, and the ducats!
> (II, viii 15-22)

Indeed, a confused passion, where the speaker, Shylock is unable to ascertain which of the two is of a greater loss to him – his ducats and stones or his daughter! However, it is perhaps often exaggerated as a scene that highlights and proves Shylock's avarice and his love for money, which overshadows his importance for human bonding. Just because he is a Jew and a minority in the play dominated by the good Samaritan Christian merchants, the onus of the evil is often transferred unfairly to the character of Shylock. Although the play has shown us right from its outset, the love and money are inextricably

woven into the very grain of the text and the society it depicts. Bassanio's friendship with Antonio is fuelled by the former's financial dependence as much as love, as much as is Bassanio's love and the quest for Portia whose fortune would help repay his debts. The Lorenzo-Jessica affair too often read as the triumph of love over birth, with the transvestite lady eloping with her Christian lover. But the romance is not untinged with monetary considerations, as Jessica furnishes herself with her father's money to elope. Here love does not feed on mere romantic fantasy or unrealistic idealism; the father she almost hates to acknowledge is yet worthy when it comes to providing for her with the wealth to sponsor her romantic elopement and settled future! Thus, perhaps because of the fixed binaries of good and evil developed in the play, what goes unnoticed or perhaps underplayed are Shylock's emotions for his wife's ring, gifted by her as a love token, now exchanged for buying a monkey! What hits Shylock with as much force as the loss of his daughter is the loss of her to a Christian, who incidentally would now spend his hard-earned money.

Out upon her! – thou torturest me Tubal, - it was
my turquoise, I had it of Leah when I was a bachelor :
I would not have given it for a wilderness of monkeys.

(III, i 110-112)

Thus, material objects are not only catalysts for love but intrinsically related to and entwined with love, emotions, and memories, and Shylock also is no exception for such, although the conventional reading of the play would encourage us to believe that he is incapable of any emotional attachment devoid of monetary gains.

It has been pointed out that in the play, Venice is the site of material transactions which are not however clearly demarcated from human feelings and relationships:

For the Venetians, money is a medium of exchange representing not the goods and services of academic economists but the passions of love and hate. And by the same token, those passions, in Venice, seek out money as their means of expression. Shylock, breeding his gold and silver, is not the only one who treats money as a living thing. The very essence of their lives is material, and when a Venetian loses the money, he loses everything (Leggat 123).

Thus, the play, well-known as a popular romantic comedy, reveals a rather prosaic, commercial, and fiscal underbelly where emotions – love, friendship, and even

revenge – are conflated with and bartered for money. The reader is caught in the complex interplay of human relationships and money matters. The economics of the Rialto pervades into the human sphere and gets transformed into the complex economics of human relationships.

Works Cited

Shakespeare, William. The Merchant of Venice. London : Arden, 1964. Print.

Leggat, Alexander. Shakespeare's Comedy of Love. London: Barnes and Noble, 1974. Print.

Molyneux, John. 'On Shakespeare, Money and Power' johnmolyneux.blogspot.com/2009/09/on-shakespeare-money-and-p-71k. Accessed 12th September, 2015. Web.

Muir, Kenneth. Shakespeare's Comic Sequence. New York: Rowman and Littlefield, 1980. Print.